NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPS

PAPER V
MODULES 17-20

ELECTIVE POL. SCIENCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৫ তম পুনর্মুদ্রণ : অগাস্ট, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত ।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

EPS : 05 : 17

	রচনা	সম্পাদনা
একক 65-68	অধ্যাপক শ্যামলেশ দাশ	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

EPS : 05 : 18

একক 69-70	অধ্যাপিকা শান্তি মুখার্জী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী
একক 71-72	অধ্যাপক নিতাই চক্রবর্তী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

EPS : 05 : 19

একক 73-76	অধ্যাপক তথাগত চক্রবর্তী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

EPS : 05 : 20

একক 77-80	ড. রাজশ্রী বসু	ড. অরুণাভ ঘোষ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EPS - 05
(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
17

একক 65 ❐ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় 7

একক 66 ❐ ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯১৯) 19

একক 67 ❐ ১৯১৯ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ 26

একক 68 ❐ ভারতের সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ 33

পর্যায়
18

একক 69 ❐ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা, ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ 43

একক 70 ❐ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন বিভাগ 78

একক 71 ❐ ভারতীয় ইউনিয়নের আইন বিভাগ 103

একক 72 ❐ ভারতের বিচার ব্যবস্থা 138

পর্যায়
19

একক 73 ❐ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা : কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক 150
একক 74 ❐ রাজ্যের শাসন বিভাগ 166
একক 75 ❐ রাজ্যের আইনসভা 181
একক 76 ❐ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি 199

পর্যায়
20

একক 77 ❐ ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি 215
একক 78 ❐ ভারতের রাজনৈতিক দল 231
একক 79 ❐ আঞ্চলিকতাবাদ 242
একক 80 ❐ জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (পশ্চিমবঙ্গের ওপর গুরুত্বসহ) 262

একক ৬৫ ☐ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়

গঠন

৬৫.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

৬৫.১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

৬৫.২ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

৬৫.৩ ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

৬৫.৪ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম

৬৫.৫ বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম

৬৫.৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম

৬৫.৭ সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম

৬৫.৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা

৬৫.৯ সারাংশ

৬৫.১০ অনুশীলনী

৬৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৬৫.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবেন। দীর্ঘ দুই শতাব্দী ব্যাপী পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রামের প্রবণতা, চরিত্র, অনুসৃত নীতিগুলি যেমন জানা যাবে তেমনই জানা যাবে এর অগ্রগতি ও পশ্চাদগতির প্রকৃত কারণ। এই প্রসঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বে নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবদান, ঐক্য ও অনৈক্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এই এককে।

সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তি, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা যথার্থ জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন।

৬৫.১ ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই জাতীয়তাবাদ পরোক্ষভাবে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীরই সৃষ্টি। কারণ নিজেদের সাম্রাজ্য ও শোষণ

ব্যবস্থা কায়েম রাখার প্রয়োজনে ইংরেজ শাসককুল দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ, দেশীয় ফৌজ, রেলপথ, আধুনিক শিক্ষা, সংবাদপত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে কালক্রমে তাদেরই শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জন্ম নিয়েছে ও বিকশিত হয়েছে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। এই বুর্জোয়া শ্রেণীই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা হয়ে ওঠে। জাতীয় এই মুক্তি আন্দোলন কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসন নয়, সেই সঙ্গে সামন্ত জমিদার শ্রেণী এবং অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানেরও বিরুদ্ধতা করে। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে থেকে একশ্রেণীর অনুগত কেরানী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৩৫ সালে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করে। লর্ড মেকলে তার প্রস্তাবনায় (Macaulay's Minutes) পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন যে শাসন চালাবার বাস্তব প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়নি। কিন্তু লর্ড মেকলের উদ্দেশ্য ষোল আনা সিদ্ধ হয়নি। কারণ ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসীর কাছে অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদ রূপে দেখা গিয়েছিল। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন তাঁরা পাশ্চাত্য দেশের উদারপন্থী মনীষীদের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতি ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হলেন। এর ফলে তাদের মনে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণাও বাড়লো। এই মানসিকতাই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

সদ্য উন্মেষিত জাতীয়তাবাদের এই চরিত্র ও প্রকৃতি সাধারণভাবে ভারতের গণমানসে ক্রমেই সঞ্চারিত হতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এর সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক মাত্রাও সংযোজিত হতে থাকে যখন উপর তলার মুষ্টিমেয় বিক্ষোভের গণ্ডী পেরিয়ে যায়। সর্বশ্রেণীর সাধারণ মানুষ এক একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে থাকে বিদেশী শাসকের অত্যাচারী, শোষক ও নিপীড়কের চরিত্র। উচ্চ মার্গে অবস্থিত ভদ্রশিক্ষিতের নিষ্ফল আবেদন নিবেদন তাদেরই সৃষ্ট সংগঠনের মধ্যে প্রতিবাদের রব তোলে। বিশিষ্ট মানুষদের মঞ্চের পাশাপাশি সঞ্জাত হতে থাকে গণবিক্ষোভ। শ্রমিক-কৃষক থেকে পেশাদার, শিক্ষক ছাত্র-ব্যবহারজীবী চিকিৎসক ক্রমেই এক বৃহত্তর আন্দোলনের পরিমণ্ডল রচনা করে। জাতীয় আন্দোলনের সংগঠনও হতে থাকে বিস্তৃততর। আদর্শগতভাবেও জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে ও বাইরে আলোড়ন জাগাতে থাকে সমাজসংস্কারের প্রভাব। পাশাপাশি সমাজবাদ তথা সাম্যবাদের অভিমুখে নতুন চেতনাও জন্ম নিতে থাকে শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের চাপে কোণঠাসা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতেও দেখা দেয় অভূতপূর্ব বিদ্রোহী মনোভাব। সুতরাং এক ব্যাপক এবং মিশ্র চরিত্র নিয়ে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ধাপে ধাপে এগোতে থাকে। সংঘর্ষ হতে থাকে তীব্র থেকে তীব্রতর। ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এই উপলব্ধি ঘটে যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শাসন ও শোষণের অস্তিমলগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। তাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

৬৫.২ ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হলেও তার বহুপূর্বেই দেশে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে যে সব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পশ্চিম ভারতের তন্তুবায় ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম, অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকদের সংগ্রাম, বাঁকুড়ার প্রজাবিদ্রোহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রভৃতি। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মানভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ। বারাসতে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলন। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৬) ও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। যদিও ঐ সমস্ত বিদ্রোহ ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিক তবুও এর মূলে প্রচ্ছন্ন এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা পরোক্ষে কাজ করেছিল। এই সমস্ত অভ্যুত্থানের সম্মিলিত ফলশ্রুতি (total effect) ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে যথেষ্ট অবদান জুগিয়েছিল।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেনি। বিকাশের একটি পরিণত পর্বে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপ ধারণ করে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনটি প্রবণতা ছিল। প্রথমটি হল গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে অহিংস গণ সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ, বিচ্ছিন্নভাবে ও সংগঠিতভাবে সশস্ত্র ও সহিংস বৈপ্লবিক সংগ্রাম। ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান থেকে আরম্ভ করে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান পর্যন্ত এই ধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় ছিল। তৃতীয় ধারাটি ছিল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর আন্দোলন। এই তিনটি ধারায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম প্রবাহিত হয়েছিল। বস্তুত নানা দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছিল বলেই এবং সংগ্রাম চলাকালীন প্রতিরোধের নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল বলেই সাম্রাজ্যবাদের বলদর্পিতা ভারতবর্ষের মাটিতে হার মানতে বাধ্য হয়।

৬৫.৩ ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের বিকাশের কয়েকটি পর্যায় চোখে পড়বে। একটি পর্যায়ের সমাপ্তি যেমন ঘটেছে, তার পরেই সূত্রপাত হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। এইভাবে পর্যায়ক্রমে জাতীয়তাবাদ অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আন্দোলনের চরিত্রে ঘটেছে মৌলিক পরিবর্তন। ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ১৯৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই সময় ভারতের

জাতীয়তাবাদের সামাজিক ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত স্বল্প সংখ্যক ভারতবাসীর মনে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। মূলত রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম পথ প্রদর্শক বলা যায়। এই পর্যায়ে ভারতের জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ শাসনের অবস্থান দাবি করেনি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়নি। এই জাতীয়তাবাদের কোনও সর্বভারতীয় ভিত্তিও ছিল না।

ভারতের জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিব্যাপ্তি ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ বিস্ফোরণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসকে একটি সুরক্ষাদায়ক (Safely valve) রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য গোপন থাকে নি। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম স্বয়ং একথা স্বীকার করেন। তখন কংগ্রেসের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভারতের জায়মান বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারিত হত। বস্তুতঃ এই পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং ব্যবসায়ীশ্রেণী। তবে এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। একটি হলো চরমপন্থী প্রবণতা। অন্যটি নরমপন্থী প্রবণতা। কংগ্রেসের এই চরমপন্থী ও নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে বিপুল বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য নরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। কিন্তু চরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার বিপিন পাল ও পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ চরমপন্থার প্রবক্তা ছিলেন। প্রথম দিকে তীব্র বিক্ষোভের জন্ম দিয়েও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নরমপন্থীদের প্রধান মুখপাত্র। ভারতের জাতীয়তাবাদের এই ক্রমবিকাশকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার জন্য ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের অপচেষ্টা করেন। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থা ও চরমপন্থার মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধের ফলে সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হয়। পাশাপাশি মুসলিম সমাজে স্বাতন্ত্র্য বোধের প্রতীক মুসলিম লীগের (১৯০৬ সালে) প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদ বিকাশের তৃতীয় যুগ। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারাদেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ করে। শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন ছিল স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্যের বর্জন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব একদিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

অন্যদিকে কংগ্রেসের বাইরে উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদী, সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই পর্বে অ্যানি বেশান্তের 'হোমরুল' আন্দোলনও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই বিদেশিনী কংগ্রেসের মধ্য থেকেই স্বরাজের ভাবধারা উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেন। এই আন্দোলনে তিলকও ছিলেন সহযোদ্ধা।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়ের (১৯২০-১৯৩৪) পরিব্যাপ্তি। এই পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। এই পর্বে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মূলতঃ অহিংস ও শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালিত হলেও এই আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় প্রতিফলিত হলো। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই পর্যায়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে একদিকে যেমন গণভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল। অন্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী রাজনৈতিক ভাবধারার সম্প্রসারণ বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পঞ্চম পর্যায়ের বিস্তৃতি। এই পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। নেতৃত্বের একটি অংশ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোসালিস্ট দল (C.S.P.) নামে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধ শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীরা দেশের সামনে একটি বিকল্প নেতৃত্ব (alternative leadership) প্রদানের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টা প্রতিহত হয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই পরিবর্তন বিরোধীদের যোগসাজসে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ষষ্ঠ বা শেষ পর্যায়ের সূচনা হয় ১৯৪০ সালে এবং সমাপ্তি হয় ১৯৪৭ সালে। এই পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কংগ্রেস-নির্দিষ্ট অবিমিশ্র অহিংস পথে চলেনি। এই পর্যায়ের বৃহত্তম গণ আন্দোলন হলো আগস্ট বিপ্লব বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান ও 'দিল্লী চলো' শ্লোগান। বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহও ঐ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৬৫.৪ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেনি। বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপ ধারণ করে। ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হলেও তার বহুপূর্বেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গণবিদ্রোহ হয়েছিল সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো পশ্চিমবঙ্গে

তন্তুবায় ও মালঙ্গীদের সংগ্রাম, অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকদের সংগ্রাম, বাঁকুড়ার প্রজাবিদ্রোহ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রভৃতি। ১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মানভূমের চোয়াড় বিদ্রোহ। বারাসতে তিতুমীরের নেতৃত্বে কৃষকবিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৫৭-৭০), নীল বিদ্রোহ (১৯৬০-৬১), আজ্জমের কৃষক বিদ্রোহ (৯৬১-৬৪), মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৭), মাদ্রাজের রুম্পা বিদ্রোহ (১৮৭৮-৭৯), উড়িষ্যার গোন্দ বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪), মালাবারের খোনলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬), ছোটনাগপুরের কোল বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৯০০) এবং বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ঐ সমস্ত কৃষক বা উপজাতিদের সংগ্রাম ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং আঞ্চলিক স্বার্থকেন্দ্রিক। নেতৃত্বহীন এবং বৈপ্লবিক আদর্শ ও লক্ষ্যহীন ছিল বলেই ঐ বিদ্রোহগুলি সংগ্রামের স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। তাছাড়া বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সচেতনতা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহও ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে ত্রস্ত ও বিব্রত করলেও বিপ্লবীরা প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে কোনও বিপ্লবী শ্রেণীর নেতৃত্বে এদেশের কৃষক সমাজ পরিচালিত হবার সুযোগ পায়নি। তাই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়িত্ব তাঁদের নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল। ফলে ঐতিহাসিক নিয়মেই সেই সব বিদ্রোহ অসংগঠিত ও আদর্শহীন হয়ে পড়ে এবং কোন গণভিত্তি না থাকার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত গণবিদ্রোহের, বিশেষত ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে পরে অনুষ্ঠিত কৃষক বিদ্রোহগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহচর জমিদার মহাজন গোষ্ঠীর অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে যে আপসহীন সংগ্রামের মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিক রচনায় এবং পরাধীন ভারতের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করায় ঐ সমস্ত বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐ সব আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতবর্ষের উদীয়মান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দিয়েছিল। নীলবিদ্রোহ বা ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। নীলবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। ভারতবন্ধু পাদ্রী জেমস্ লঙ্ সাহেব এর ইংরেজী অনুবাদ করে শাসক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ ও সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলচাষীদের সপক্ষে কলম ধরে সমকালে দণ্ডিত ও উত্তরকালে বরণীয় হন। বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই ছিল প্রথম বিপ্লব।

৬৫.৫ বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয়তাবাদী, গণআন্দোলনের মূল নেতৃত্ব চলে যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হাতে। অবশ্য একথা সত্য যে কংগ্রেসের একক নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি এবং ভারতের স্বাধীনতাও কংগ্রেসের একক প্রচেষ্টায় আসেনি। এ বিষয়ে অবশ্য পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা বা রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। কংগ্রেস সভাপতি ডঃ পট্টভি. বি. সীতারামাইয়া তাঁর বিখ্যাত বই The History of the Indian National Congress-এ এই বলে মন্তব্য করেছেন যে কংগ্রেসের ইতিহাসই প্রকৃত পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে কেবলমাত্র গান্ধীজীর অহিংসার পথ ধরেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে। এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে মাইকেল এডওয়ার্ডস্ তাঁর বিখ্যাত বই The last years of British India তে মন্তব্য করেন যে কংগ্রেস কখনও একটি বিপ্লবী সংগঠন ছিল না। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের সমাবেশ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে পরিপূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে যেতে কংগ্রেস সত্যই কতটা প্রস্তুত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য ও দেশ বিভাগের জন্য তাই অনেকে কংগ্রেস নেতৃত্বকেই দায়ী করেন। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটলী পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিল যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর ভূমিকা ছিল যৎসামান্যই (minimal)।

প্রকৃত রাজনৈতিক গবেষকরা এই দুই ধরনের মতের মধ্যেই অতিরঞ্জনের ত্রুটি দেখেছেন। কারণ ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অহিংস সংগ্রামের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষকরাও আন্দোলন করেছে। তাদের সেই আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক ও পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কাজেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনটি ধারায় পরিচালিত হয়েছে বলা যায়। এই তিনটি ধারার যথাযথ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন না করলে বিংশ শতাব্দীর ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ১৯৪০ সালের ২০ শে এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্র হল মিশ্র ও অহিংস (Mixed non-Violence)।

৬৫.৬ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রাম

কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় জাতীয় গণ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে কার্যত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময় থেকে। ১৯২০ সালে গান্ধীজী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন

এবং তখন থেকেই তিনি ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাব সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য—এই দুটি নতুন অস্ত্রের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। ১৯২০ সালের ২রা জুন অনুষ্ঠিত এক সভায় খিলাফৎ কমিটি সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে একটি একটি অসহযোগ কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটি একটি ইস্তাহারে ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী রূপায়ণের কথা ঘোষণা করে। ১লা আগস্ট ভারতব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কার্যত কংগ্রেস কর্তৃক ভারতব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলনের সূচনা হয়। এরপর ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন। অনেক বিতর্ক ও বিতণ্ডার পর ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের পর কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীযুগের (Gandhi Era) সূত্রপাত হয়।

গান্ধীজীর আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ জেগে ওঠে। গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে তারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত করেন।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সর্বত্র অহিংস পথে পরিচালিত হয়নি। তৎসত্ত্বেও গান্ধীজী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক থানা আক্রমণ ও ২১ জন পুলিশ হত্যার ফলে নীতির শুচিতা রক্ষার জন্য গান্ধীজী অকস্মাৎ সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। গান্ধীজীর এই আচরণে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের অধিকাংশ এবং আসমুদ্রহিমাচল ভারতের জনগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়।

এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পায়। সেই সুযোগে সরকার নির্বিচারে দমনপীড়ন শুরু করে এবং ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। ফলে দেশের মধ্যে সর্বত্র পুনরায় তীব্র এক হতাশার সৃষ্টি হয়।

এই সময় স্বরাজ্য দলের অভ্যুত্থান কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং আইন সভায় প্রবেশ করে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থাকে (Dyarchy) অচল করে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দুই গোষ্ঠীর লড়াইকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা 'নো-চেঞ্জার' বনাম 'প্রো-চেঞ্জার' এর দ্বন্দ্ব বা লড়াই বলে আখ্যা দেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী স্বরাজ্যদলের কর্মসূচী গ্রহণ করে এই দ্বন্দ্বের

অবসান ঘটান।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পর্বে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামশক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধী সুভাষ বিরোধের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের অবসান ঘটে। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি নির্বাচনে জয়ী হয়ে কংগ্রেস ভারতের ৮টি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে।

এরপর ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর ডাকে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করলেও সারা দেশের মানুষের মনে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসন্তোষ ঘনীভূত হয়। অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের বিভিন্ন প্রস্তাব দিতে থাকে। সেই সঙ্গে মুসলমান জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের সম্ভাবনা তারা বিনাশ করতে উদ্যত হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সারা দেশ বিভাগ মেনে নিয়েই কংগ্রেস স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়।

৬৫.৭ সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রাম

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলিরও এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ঐ সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল ও গদর পার্টির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস সৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতারিত করতে চেয়েছিলেন। বোমা, পিস্তল ইত্যাদির ব্যয় সংকুলানের জন্য তাঁরা অনেকসময় রাজনৈতিক ডাকাতির পথও বেছে নিতেন। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ভালভাবেই জানতেন যে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করা যাবে না। কিন্তু মানুষের মনে বিপদের সম্মুখীন হবার মতো মনোবল জাগিয়ে তুলবার জন্য তারা এপথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় অত্যাচারী প্লেন অফিসার র‍্যান্ড এবং আয়াস্টিকে হত্যার মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। অবিচল চিত্তে তাঁরা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন। তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান, বালেশ্বর ও বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীনের সশস্ত্র লড়াই, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাসবিহারী বসুর প্রচেষ্টায় সারা ভারতে সশস্ত্র সৈনিকদের বিদ্রোহের সামিল করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রয়াস অব্যাহত গতিতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। ত্রিশের দশকের শুরুতে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দুঃসাহসিক প্রয়াস মুখে এতে আর একমাত্রা যুক্ত করে। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব এই সংকল্পের অটল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুন মাত্রাও অনুপ্রেরণা দান করে। কিন্তু ভারতের বিপ্লবীদের নানাপ্রকার সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য তাঁরা দেশবাসীর সামনে বিকল্প কোন নেতৃত্ব দিতে পারেননি। পরবর্তীকালে ভারতের বিপ্লবী দলগুলি নিজেদের কর্মপদ্ধতির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টিসহ ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে মিলিত হয়। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পাওয়ার পর বাংলার জাতীয় বিপ্লবীদের প্রায় সকলেই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। এর ফলে বি. ভি. গোষ্ঠী, বেনু গোষ্ঠী যোগ দেন সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকে, অনুশীলনী সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লকে, অনুশীলনী সমিতি, চট্টগ্রাম গোষ্ঠী যোগ দেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল

(R.S.P.) ও কমিউনিস্ট দলে এবং যুগান্তর দলের অধিকাংশ সদস্য যোগ দেন কংগ্রেস দলে।

৬৫.৮ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর বামপন্থী বৈপ্লবিক চিন্তা, সমাজ পরিবর্তনের পরিকল্পনা ও তাপাসহীন সংগ্রামের আহ্বান গান্ধীপন্থী নেতাদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। পরপর দু'বার হরিপুরা ও ত্রিপুরা কংগ্রেসে বিপুল সমর্থনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেও, দলের পুরাতন পন্থীরা গান্ধীর ইঙ্গিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস পরিত্যাগে বাধ্য করা হয়। বিকল্প মঞ্চ হিসাবে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব বুঝে সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে গোপনে দেশ ত্যাগ করে সোভিয়েত দেশে পৌছনর চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধা পাওয়ায় প্রথমে জার্মানীতে উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সমর্থন নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সামরিক উদ্যোগ নেওয়ার। হিটলারের সঙ্গে মতৈক্য না হওয়ায় তিনি সাবমেরিন যোগে বিপদসঙ্কুল সাগর পেরিয়ে জাপানে চলে আসেন। জাপান থেকে তিনি সিঙ্গাপুরে আসেন। রাসবিহারী বসুর হাত থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজকে পুনর্গঠিত করে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। ২৩ শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ সরকার গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই জাপান, জার্মানী, ইতালী, ফিলিপাইন, বার্মা, থাইল্যান্ড প্রভৃতি নয়টি রাষ্ট্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রবল পরাক্রমে লড়াই করতে করতে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ সর্বপ্রথম বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে এবং মণিপুরের অন্তর্গত মৈরাং এ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। দুর্ভাগ্যবশত ইতিমধ্যেই মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্থন এবং উত্তরোত্তর প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও পিছু হঠতে হয়। তবু আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান ভারতের অভ্যন্তরে জনমানসে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ হয়। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদী সেনাদের বিচারকে কেন্দ্র করে সারা ভারত গণ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে।

৬৫.৯ সারাংশ

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই এসে যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির পিছনে ব্রিটিশদের পরোক্ষ অবদানকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এদেশে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল তা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীকে ব্রিটিশ শোষণ সম্পর্কে

অতিমাত্রায় সচেতন করে তোলে। এক নতুন গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাদের চিন্তা ও চেতনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলশ্রুতিতে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম পরোক্ষ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে কোম্পানির শাসনাধীন সংঘটিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। তবে প্রকৃত অর্থে এই বিদ্রোহগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলা যায় না। কারণ, বিংশ শতাব্দী থেকেই মূলতঃ ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল দুর্বল।

দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থী-দুটি ভাগ, তাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং আনুষ্ঠানিক বিরোধ, বঙ্গ বিভাগের অপচেষ্টা, মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, হোমরুল আন্দোলন ইত্যাদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়।

১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন।

পঞ্চম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ভারতীয় রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক তথা বামপন্থী ধ্যান ধারণার উদ্ভব।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ষষ্ঠ তথা শেষ পর্যায়ে (১৯৪০-৪৭) ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযান এবং নৌবিদ্রোহ ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিতকে দারুণভাবে নড়িয়ে দিয়েছিল।

এইভাবে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গণআন্দোলনগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিল যে ভারতবর্ষে তাদের রাজনৈতিক একাধিপত্যের দিন শেষ হয়ে আসছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তারা ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছিল।

৬৫.১০ অনুশীলনী

১। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

২। ভারতের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের কৃষক ও গ্রামীণ বিদ্রোহগুলির সংগ্রামী গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

৪। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের ভূমিকার কী গুরুত্ব ছিল?

৬। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা বিশদ করুন।

৬৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Indian Struggle - *Subhas Chandra Bose.*

(২) Social Background of Indian Nationalism - *A. R. Desai.*

(৩) Indian National Movement - *Nemai Sadhan Bose.*

(৪) ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি - *অধ্যাপক নিমাই প্রামাণিক।*

একক ৬৬ ☐ ভারতে সংবিধানিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাস (১৮৫৭-১৯১৯)

গঠন

৬৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
৬৬.১ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা
৬৬.২ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন
৬৬.৩ উইলিয়ম পিটের ভারত শাসন আইন
৬৬.৪ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮
৬৬.৫ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৬১
৬৬.৬ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৮৯২
৬৬.৭ ভারতীয় পরিষদ আইন ১৯০৯
৬৬.৮ সারাংশ
৬৬.৯ অনুশীলনী
৬৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

আটটি পর্যায়ে বিভক্ত এই এককটি পাঠ করলে আমরা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে পারি। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই ইতিহাসের মারফত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে পর্যায়ক্রমে সংস্কারের শান্তিজল ছিটিয়ে ভারতবাসীর অন্তরে প্রজ্বলিত জাতীয় চেতনার অগ্নিকে নির্বাপিত করে তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অনুগত অংশীদার করতে পেরেছিল তার আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা যায়।

৬৬.১ ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থা

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এবং ১৭৬৪ সালে বক্সার যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বণিক পুঁজির অনুপ্রবেশ সুনিশ্চিত হয়। যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করার পর ব্রিটিশ বণিক পুঁজির প্রতিনিধি হিসেবে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে বণিক পুঁজির সঙ্গে শিল্প পুঁজির বিরোধ বাধে। পার্লামেন্টে শিল্প পুঁজির

প্রতিনিধিরা প্রাধান্য অর্জন করায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যথেচ্ছভাবে ভারতকে শাসন ও শোষণ করে। কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল না। কেবলমাত্র মালিকদের সভা (Court of Proprietors) এবং পরিচালকমণ্ডলীর সভা (Court of Directors) দ্বারা কোম্পানির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শিল্পপুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের দাবি উঠতে থাকে। বার্ক, ফক্স, শেরিডন প্রমুখ শিল্প পুঁজির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের প্রবক্তাগণ কোম্পানির শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই গ্রেট ব্রিটেনে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষেত্রে সংস্কারের সূচনা হয়।

৬৬.২ ১৭৭৩ সালের নিয়ন্ত্রণকারী আইন

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন প্রণীত হয়। এই আইন নিয়ন্ত্রণকারী আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) নামে পরিচিত। এই আইন প্রণীত হওয়ায় পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে যুদ্ধের দ্বারা বা বিদেশী রাজন্যবর্গের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি যে সব ভূখণ্ড অধিকার করেছে সেগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। লর্ড নর্থ প্রণীত এই নিয়ন্ত্রণ আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে এই আইনে বাংলা প্রেসিডেন্সির সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট আখ্যা দেওয়া হয়। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্য গভর্নর জেনারেলের পরিষদে (Council) চারজন সদস্যকে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের মতানুযায়ী গভর্নর জেনারেল কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন বলে ঐ আইনে বলা হয়। নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল। এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্লামেন্ট ব্রিটিশরাজ, কোম্পানির পরিচালকসভা ও ভারতীয় প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পরিধি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত না থাকায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মত বিরোধ শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। আইনে বলা হয়েছে যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হবে। কিন্তু এখানেও দেখা গেল যে পরিষদের তিনজন সদস্য একজোট হয়ে গভর্ণরের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং শাসনকার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে।

৬৬.৩ পিটের ভারত শাসন আইন

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাকটের ত্রুটি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে বিচারবিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন (Judicature Act) প্রণীত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ন্ত্রণকারী আইনে সুপ্রিমকোর্টের হাতে যে ক্ষমতা

দেওয়া হয়েছিল এই আইনের ফলে সেগুলি বাতিল হয়। তাছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী আইনের অন্য ত্রুটি বিচ্যুতি দর করার জন্য হুইগ নেতা চার্লস্ জেমস্ ফক্স ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল আনয়ন করেন। কিন্তু লর্ড সভায় বিলটি অগ্রাহ্য হলে লর্ড নর্থ ও ফক্সের কোয়ালিশন সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সময় ইংল্যান্ডের জনমত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পিট নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবার পরেই ১৭৮৪ সালে ফক্সের ভারত শাসন আইনের অনুরূপ একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনটির নাম ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন ১৭৮৪। সাধারণভাবে এটি পিটের ভারত শাসন আইন ১৭৮৪ (Pitt's India Act) নামে বিখ্যাত। পিটের ভারতশাসন আইনকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বিতীয় সুদূর পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ আরোপের দ্বিতীয় সুদূর পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এই আইনের মাধ্যমে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী সমগ্র ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল (British possession in India) বলে ঘোষণা করা হয়।

পিটের ভারতশাসন আইন কার্যত ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানির কার্যাবলীর উপর দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। তাছাড়া এই আইন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সির উপর প্রাধান্য দিয়ে কার্যত ভারতবর্ষের ঐক্য সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল।

৬৬.৪ ভারত শাসন আইন ১৮৫৮

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ইংল্যান্ডের শাসকগোষ্ঠী দমন করতে সক্ষম হলেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ডে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শিল্প পুঁজিপতিরা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের বাজার রূপে দখল করার জন্য আগে থেকেই কোম্পানির উপর একের পর এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন যে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোম্পানির যে কোনও যোগাযোগ নেই এই বিদ্রোহ থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তারা জনসংযোগহীন ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বহীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে ভারতবর্ষের মত বহুজাতি বিশিষ্ট একটি বৃহৎ দেশের শাসন ক্ষমতা রাখার বিরুদ্ধে তীব্রমত পোষণ করেন। তারা ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান দাবি করেন। এর ফলে ১৮৫৮ সালে লর্ড পামারস্টোন ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল পেশ করেন। অনেক বিরোধীতার পরে শেষ পর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইন ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত হয়।

এই আইনের মূলকথা হল ভারতশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে হস্তান্তরিত হল। ব্রিটেনের সম্রাট কোম্পানির স্থল ও নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিকর্তা হলেন। পুরাতন নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হল। ভারতের শাসনভার একজন ভারত সচিব ও তার ভারতশাসন পরিষদের হাতে অর্পণ করা হল। ভারত শাসন ব্যাপারে ভারত সচিবকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে

দায়িত্বশীল করে রাখা হল।

এইভাবে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশরাজের অধীনে আনতে সমর্থ হয়। এর ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির শোষণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁরা ভারতবর্ষে সুশাসন প্রবর্তনের নামে কার্যতঃ ভারতকে ব্রিটেনের শিল্প সমূহের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত করেন।

৬৬.৫ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৬১

১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর মহারানীর ঘোষণায় (Royal Proclamation) উত্তরোত্তর ভারতীয়দের শাসনকার্যে সংযুক্ত করার যে কথা বলা হয়েছিল কয়েকটি ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন পাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সে বিষয়ে কিছুটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঐ বিষয়ে প্রথমেই ১৮৬১ সালে প্রণীত ভারতীয় পরিষদ আইনের (The Indian Council Act) কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ১৮৩৩ সালের সনদে প্রদেশগুলির যে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ১৮৬১ সালে প্রণীত আইনে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ের সপারিষদ গভর্নরদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পুনরায় সেই সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গভর্নর জেনারেলের হাতে নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

তাছাড়া জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য গভর্নর জেনারেলকে 'অর্ডিন্যান্স' জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বেসরকারি

এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়কে যুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়ণের ব্যাপারে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কারণ বড়লাট কিম্বা প্রাদেশিক গভর্নরগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহের উপর আলোচনা করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। তারা ঐসব আইনের প্রস্তাব বাতিল করতে পারতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ঐসব আইনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনকে অন্যতম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

১৮৮৩ সালের আইনে ভারতবর্ষে যে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, বর্তমান আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সীমাবদ্ধভাবে হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ফলে পূর্বনীতির পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয়ত উক্ত আইন প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পার্থক্য নিরূপণ করে ভারতবর্ষের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সূত্রপাত ঘটায়।

৬৬.৬ ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন ১৮৯২

আগেই বলা হয়েছে ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৮৮৩ সালে পার্লামেন্টে যে আইন প্রণীত হয়েছিল তাতে শাসনপরিষদকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অর্পণ করা হয়। ১৮৯২ সালের ভারতীয়

পরিষদ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল যে এই আইনে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলা হয়। স্থির হয় যে পরিষদে ১৬ জন সদস্য থাকবে না তার মধ্যে দশজন হবেন বেসরকারি সদস্য। আবার দশজন সদস্যের মধ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলির বেসরকারি সদস্যগণ কর্তৃক চার জন এবং বণিক সভাগুলির দ্বারা একজন নির্বাচিত হবেন। গভর্নর জেনারেলের নিকট ঐসব প্রতিনিধির নাম সুপারিশ করার পর তিনি তাদের পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনীত করতে পারেন। কেন্দ্রের মত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে এক ধরনের পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়। বণিক ও শিল্পপতিদের সভা ইত্যাদির সুপারিশক্রমে গভর্নররা নিজ নিজ প্রদেশের আইনসভার বেসরকারি সদস্যদের মনোনীত করবেন বলে ১৮৯২ সালের ভারতীয় আইন পরিষদ আইনে বলা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও কার্যত তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। তাছাড়া গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদের মনোমত না হলে কোনও ভারতীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে স্থান পেতে পারেন না।

৬৬.৭ মর্লিমিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সারা দেশে বিশেষ করে 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের ঝড় শুরু হয় তা প্রশমিত করার জন্য ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় পরিষদ আইন প্রণয়ন করেন। তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড মর্লি ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর উদ্যোগে এই আইন প্রণীত হয়েছিল বলে সাধারণভাবে তা 'মর্লি' মিন্টো সংস্কার আইন বা (Morley Minto Reforms Act) নামে সুপরিচিত। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা ষোলজন থেকে বাড়িয়ে ষাট জন করা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইনপরিষদের সদস্য সংখ্যা কুড়ি থেকে বাড়িয়ে পঞ্চাশ করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ত্রিশে দাঁড়ায়।

মর্লিমিন্টো সংস্কার আইনে এ দেশে সর্বপ্রথম নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথাও ঘোষণা করা হয়। সেজন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা (Separate Electorate System) চালু করা হয়। আইন সভাগুলির ক্ষমতাও কিছুটা পরিমাণে বাড়ানো হয়।

১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন পরিষদ আইন বা মর্লিমিন্টো সংস্কার আইন আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও কার্যত একান্ত ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরাই এই সুযোগ লাভ

করতেন। চরমপন্থী ও বিপ্লবীদের সুকৌশলে এই সুযোগ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত রীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তথাকথিত সংস্কার সাধনের নামে এই আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে। লর্ড মিন্টো দ্বিজাতি তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ ও পৃথক ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। এইভাবে মর্লিমিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয় তা কালক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে দেয় এবং পরিণামে ভারতবিভাগের পথ প্রশস্ত করে।

৬৬.৮ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বণিক পুঁজির ওপর শিল্প পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।

এই পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'রেগুলেটিং অ্যাকট' প্রণয়ন করা হয় যেখানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে 'গভর্নর জেনারেল'-এর পদ সৃষ্টি করা হয়, এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু নানা কারণে এই আইন প্রশাসনিক কার্যকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারেনি।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য ১৭৮১ সালে 'বিচার-বিভাগীয় এলাকা সংক্রান্ত আইন' প্রণীত হলেও এই আইনের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। 'পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪)' কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীনে সমস্ত ভূখণ্ডকে সর্বপ্রথম ভারতে ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করে এবং কোম্পানির কার্যাবলীর ওপর ইংল্যান্ড থেকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৮ সালে প্রণীত 'ভারত শাসন আইন'-এ কোম্পানির হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে তুলে দেওয়া হল এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হল একজন ভারতসচিব এবং তার ভারত শাসন পরিষদের হাতে।

১৮৬১ সালে প্রণীত 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এর মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে কয়েকজন ভারতীয়কে সংযুক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভারতীয় সদস্যরা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি। তবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে এই আইনের ভূমিকাকে অস্বীকার

করা যায় না।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ১৮৯২ সালের 'ভারতীয় পরিষদ আইন'-এ। কিন্তু বাস্তবে তাদের হাতে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়নি। ১৯০৯ সালের 'মর্লিমিন্টো সংস্কার আইন' ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সম্প্রদায়-ভিত্তিক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করে এবং পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করে। আপাতদৃষ্টিতে শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের পরিধি বাড়ালেও এই আইনের সুবিধা ভোগ করতেন ব্রিটিশভক্ত নরমপন্থীরা। তাছাড়াও এই আইন দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে সম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল।

৬৬.৯ অনুশীলনী

১। ১৮৫৭ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবস্থা বর্ণনা করুন।

২। উইলিয়ম পিটের ভারতশাসন আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। মহারানীর ঘোষণা পত্রে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর ক্ষোভ প্রশমনের জন্য কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল?

৪। ১৮৬১ ও ১৮৯২ সালের সংস্কার আইনে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অংশগ্রহণের সুযোগ কতটা সম্প্রসারিত হয়েছিল?

৫। ১৯১৯ সালের মর্লিমিন্টো সংস্কারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Introduction to the Constitution of India- *Dr. Durgada Basu,* Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi.

(২) ঐ—অনুবাদ ভারতের সংবিধান পরিচয় — *রমেন্দ্র মজুমদার।*

(৩) ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিচয় — *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মল কান্তি ঘোষ।*

গঠন

৬৭.০ উদ্দেশ্য
৬৭.১ প্রস্তাবনা
৬৭.২ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
৬৭.৩ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
৬৭.৪ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি
৬৭.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন
৬৭.৬ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন
৬৭.৭ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা (১৯৪৭)
৬৭.৮ সারাংশ
৬৭.৯ অনুশীলনী
৬৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে কীভাবে ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কার থেকে, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন এবং স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে সেই সাংবিধানিক ইতিহাসের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন।

ভারতবর্ষে সাংবিধানিক শাসনের যে ঐতিহ্য প্রবর্তিত হয়েছে তার গোড়াপত্তন হয় ঔপনিবেশিক আমলের শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলির মধ্য দিয়ে। বস্তুত বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের বেশ কিছু উপাদানের ওপর ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ছায়া পড়েছে অনেকটাই। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ অধ্যয়নে এই এককটি সহায়ক হবে।

৬৭.১ প্রস্তাবনা

১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে সংযুক্ত করা এবং ভারতের দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই হল ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য। প্রস্তাবিত আইনের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও ব্যর্থতা জনিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতরাষ্ট্র শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যায়। সেই অগ্রগমনের ফলশ্রুতি ১৯৩৫

সালের ভারতশাসন আইন ও ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নির্বাচন, ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীনতার সূচনা, গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন ও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ভারতের গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে।

৬৭.২ ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনের পটভূমি

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ বলে ঘোষিত হলেও দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এতে স্তিমিত হয়নি। সেই সঙ্গে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে থাকে। গান্ধীজী অবশ্য মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ঐ স্মারকলিপিতে (Memorandum) তারা ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে 'অসমাপ্ত' বলে বর্ণনা করেন। কারণ ঐ আইনে ভারতীয়দের কোন ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। তারা সু-সরকার (good government) কিংবা সুদক্ষ প্রশাসন চান না তা নয়। কিন্তু আবেদনকারীরা এমন একটি সরকার চান যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। ঐ একই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে স্বায়ত্তশাসন মূলক রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায়। এই দাবিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের কাছে সংস্কার বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme) পেশ করা হয়। এই সময় লর্ড মন্টেগু ভারতসচিব হন। তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি শাসন সংস্কার মূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

৬৭.৩ ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার বদলে ব্রিটেনের রাজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের জন্য একজন হাইকমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই নতুন আইনে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি কক্ষ হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly) এবং রাজ্য পরিষদ (Council of states)। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ হল তিন বৎসর। কিন্তু রাজ্য পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বৎসর। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাপারে নাগরিক অধিকার

কমিটি (Franchise Committee) পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির সুপারিশ করলেও সরকার উভয় কক্ষের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রবর্তন করে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিই ভোটাধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়। কারণ ভোটদাতাদের যোগ্যতার উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় আইন সভার ক্ষমতা অনেক খর্ব করা হয়। ১৯১৯ সালের আইনে প্রথম ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা কেন্দ্রীয় তালিকা ও প্রাদেশিক তালিকা। প্রাদেশিক আইন সভাগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়।

ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন (Provincial Dyarchy) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা— সংরক্ষিত বিষয় (Reserved Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects)। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালনায় দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকত। সংরক্ষিত বিষয়গুলির দেখাশোনা গভর্নর করতেন। গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে গণ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রধান ও প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হতেন।

৬৭.৪ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার পরেও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস অয়েংগার, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের নেতৃত্বে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য 'স্বাধীনতা সংঘ' (Independence League) গঠন করেন। তাদের চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজির নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পর পর এই সব নানা ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ 'শ্বেতপত্র' (White Paper) নামে এক দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ঐ শ্বেতপত্রের প্রস্তাব বিচার বিবেচনার জন্য একটি যৌথ মনোনয়ন কমিটি (Joint Select Committee) গঠিত হয়। ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিন্‌লিথগো। ঐ কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ঐ বিল ব্রিটিশ রাজার সম্মতি (Royal Consent) লাভের পর আইনে পরিণত হয়। ঐ আইনই ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ (The Government of India Act 1935) নামে পরিচিত।

৬৭.৫ ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব। এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য এই দুভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে এগারোটি করা হয়। ব্রিটিশ ভারত বলে কথিত ঐ ১১টি প্রদেশকে আবশ্যিকভাবে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বলা হয় যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যকে 'যোগদান সম্পর্কিত দলিল-এ (Instrument of Accession) স্বাক্ষর করতে হবে। ঐ দলিলে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার পর ঐ রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

৬৭.৬ ১৯৪৬ সালের গণপরিষদের নির্বাচন

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করেছেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সারা দেশ জুড়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছে। ক্রিপ্‌স্ মিশন ভারতবর্ষে এসেছে। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি করেছে। যুদ্ধান্তে ভারতের রাষ্ট্রিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ভারতবর্ষের রাজনীতি ও সাংবিধানিক বিকাশের ক্ষেত্রে এনেছে সুদূরপ্রসারী গুণগত পরিবর্তন।

ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গণপরিষদের প্রতিষ্ঠাকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেদিন থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন থেকেই ভারতের সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়েছে। ১৯২২ সালে গান্ধীজী এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ভারতবাসীর জন্য সংবিধান রচনার দাবি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই সুস্পষ্টভাবে তোলা হয়। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনে ব্যর্থতার পর ১৯৩৪ সালের মে মাসে কংগ্রেস নরমপন্থীরা (Modcrator) আইন সভায় প্রবেশ করার কর্মসূচী

গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচনার দাবি জানায়। ১৯৩৬ সালের ২৯ শে জুলাই কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে গণপরিষদ গঠনের সপক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপন করে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে গণপরিষদ গঠনের দাবি জোরালো আকার ধারণ করলে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট ভাইস্‌রয় তার বিখ্যাত আগস্ট ঘোষণায় (August Declaration) সর্বপ্রথম স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা একান্তভাবেই ভারতীয়দের নিজস্ব ব্যাপার।

এরপর ক্রিপস্ মিশন প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার পর সর্বশ্রেণীর ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। এর পর ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সাধারণ নির্বাচনের পর সরকার একটি গণপরিষদ আহ্বান করবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। তিনি প্রস্তাবিত সংবিধান রচনার ব্যাপারে ভারতীয় ঐকমত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর ভারতে আগত ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৪৬ সালে সারাভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ১৮৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস একাই ৯২৫টি অর্থাৎ ৫৮% আসন অধিকার করে। এই নির্বাচনের পর ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ভারতের গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২০৩টি আসনে জয়লাভ করে। এছাড়া গণপরিষদে কংগ্রেস ৪ জন মুসলমান ও ১ জন শিখ প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। ফলে গণপরিষদের মোট ২৯২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ২০৮ জন। এইভাবে গণপরিষদ কার্যত কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়।

৬৭.৭ ক্ষমতা হস্তান্তর ও স্বাধীনতা লাভের সূচনা

ক্ষমতার হস্তান্তর ও ডোমিনিয়ন ভারতের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। এই অধিবেশনে ইউনিয়ন সংক্রান্ত কমিটির (Union Powers Committee) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতা বিষয়ক রিপোর্ট, সংখ্যালঘু পরামর্শদাতা কমিটির রিপোর্ট সংবিধান রচনাকারী ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে গণপরিষদের ভবিষ্যৎ করা হয় শেষোক্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে গণপরিষদ সংবিধান রচনা এবং আইন প্রণয়ন উভয় কার্যই করবে।

বিভিন্ন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে ২৯শে আগস্ট ১৯৪৭ এ একটি মুসবিদা কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হয়। ডঃ বি. আর আম্বেদকর ঐ কমিটির সভাপতি হন। এ কমিটির আড়াই বৎসরের প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

৬৭.৮ সারাংশ

ভারতবর্ষে শাসনব্যবস্থার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আইন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেছিল, যেমন — ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশের রাজস্ব তহবিল থেকে প্রদান, গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে একজন হাইকমিশনার নিয়োগ, কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রশাসনিক বিষয়গুলিকে দুটি তালিকায় বিভক্তিকরণ ইত্যাদি।

কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন, গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীদের আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার 'শ্বেতপত্র' দলিলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসনব্যবস্থা এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন যেটির বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব পড়ে একটি 'যৌথ মনোনয়ন কমিটি'-এর ওপর। এই কমিটির রিপোর্টের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইনে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

গণপরিষদের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট তৎকালীন ভাইসরয় তাঁর বিখ্যাত 'আগস্ট ঘোষণা'য় ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান রচনার বিষয়টিকে সমর্থন জানান। এরপর ক্রিপস্ মিশন সুপারিশ, ওয়াভেল পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গণপরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট গণপরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন কমিটি রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনার ওপর ভিত্তি করে ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় একটি কমিটির ওপর যার আড়াই বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম, লিখিত, গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি হয়।

৬৭.৯ অনুশীলনী

১। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের রাজনৈতিক পটভূমি কী ছিল?

২। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

৩। কী পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

৪। ১৯৪৬ সালে ভারতে গণপরিষদ নির্বাচনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ও স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্বের উপর এক সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৬৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Social Background of Indian Nationalism - *A. R. Desai.*

(২) Introduction to the Constitution of India - *Dr. Durgadas Basu.*

একক ৬৮ ☐ ভারতে সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদ (Constituent Assembly)

গঠন

৬৮.০ উদ্দেশ্য

৬৮.১ প্রস্তাবনার ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য

৬৮.২ গণপরিষদে গণচরিত্রের অভাব

৬৮.৩ সংবিধানের উপর কোন গণভোট দেওয়া হয়নি

৬৮.৪ গণপরিষদের কাজে পদ্ধতিগত ত্রুটি

৬৮.৫ কংগ্রেসের একক প্রাধান্য

৬৮.৬ সামাজিক বিপ্লবের অঙ্গীকারের স্বরূপ

৬৮.৭ সারাংশ

৬৮.৮ অনুশীলনী

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় সংবিধান রচনার আনুপূর্বিক ইতিহাস ছাত্রছাত্রীদের সামনে উন্মোচিত হবে।

ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা (Polity), তার উৎস, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতি, তার ঘোষিত আদর্শ, আদর্শের স্বরূপ, যথার্থ সত্যতা এবং প্রায়োগিক সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সুশৃঙ্খল, সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই ধারণা ভারতবর্ষে তাঁদের গণতান্ত্রিক নাগরিকতার (Democratic Citizenship) এক অনুকূল অনুষঙ্গ হবে।

৬৮.১ প্রস্তাবনার ইতিবৃত্ত ও বৈশিষ্ট্য

ডঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে গঠিত মুসাবিদা কমিটিকে (Drafting Committee) কতকগুলি বিষয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অনুসরণ করার জন্য গণপরিষদ নির্দেশ দেয়। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এই কমিটি ভারতীয় গণপরিষদের (Constituent Assembly) সামনে ভাবী সংবিধানের এক খসড়া পেশ করে। সুদীর্ঘ আলোচনার পরে বেশ কয়েকটি ধারা সংশোধিত হবার পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে

নভেম্বর ঐ সংবিধান গণ পরিষদে গৃহীত হয়। এরপরে গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঐ খসড়া সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারি গণপরিষদের সর্বশেষ অধিবেশন বসে। ঐ অধিবেশনে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকরী হয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিটি দেশের সংবিধানের একটি নিজস্ব দর্শন থাকে। একটি সংবিধানের দর্শন বলতে সাধারণত সেই সব আদর্শ (ideals) বা নীতিসমূহ (policy) কে বোঝায় যেগুলির উপর ভিত্তি করে সংবিধান দাঁড়িয়ে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble)-র স্বরূপ বুঝতে হলে গণপরিষদে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব (Objective Resolution) এর দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে নেহরু উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি সংশোধিত আকারে তা গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি সংশোধিত আকারে তা গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র (an Independent Sovereign Republic) বলে ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে জনগণকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের (all power and authority) উৎস বলে বর্ণনা করা হয়। তাছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, মর্যাদা, সুযোগ সুবিধা ও আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন ও জননৈতিকতার (Public Morality) অধীনে সব নাগরিককে চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম উপাসনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার প্রদানের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। সেই সঙ্গে অনুন্নত ও শোষিত সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা অবলম্বন, জাতীয় ভূখণ্ডের সংহতি, (integrity of the territory of the Republic), বিশ্বশান্তি ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন (promotion of world peace and welfare of mankind) ইত্যাদি বিষয়ের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নেহরুর উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবের আদর্শকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) বিশ্বস্তভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, ঐ প্রস্তাবনার মধ্যেই ভারতীয় সংবিধানের প্রধান আদর্শ ও নীতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৮.২ গণপরিষদে গণচরিত্রের অভাব

আমাদের দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সমালোচকরা ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদের গণচরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন এবং এর গণ চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ভারতের গণপরিষদ প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়নি। গণপরিষদকে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের মাত্র ১৩% ভোটদাতা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে ঐ আইনসভার প্রতিনিধিরাই ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেছিলেন। এই

নিঃসন্দেহে কংগ্রেস কর্তৃক তাদের বহুঘোষিত নীতির পরিপন্থী ছিল। ফলে গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ স্থগিত রেখে নতুন করে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আরেকটি নতুন গণপরিষদ গঠনের দাবি গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেই অনেকে উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রস্তাবিত ও পুনর্গঠিত গণপরিষদই মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) কর্তৃক রচিত খসড়া সংবিধানকে সংশোধন সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে বলে আলোচ্য সদস্যরা দাবি করেছিলেন। কারণ তারা মনে করেছিলেন যে এই গণপরিষদ কখনই দেশের সমস্ত জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কিন্তু উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। এই গণপরিষদ কর্তৃক রাচত সংবিধানের উপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য কোন গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই এই সংবিধানকে কোনমতেই জনগণের সংবিধান বলা যায় না বলে ভারতীয় সংবিধানের সমালোচকরা মনে করেন।

এই মতের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রস্তাবনার অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাতে গণ-সার্বভৌমিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। "আমরা ভারতের জনগণ... ১৯৪৯ সালের ছাব্বিশে নভেম্বর আমাদের গণপরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" এর অর্থ ভারতের জনগণই সংবিধানের রচয়িতা এবং চরম সার্বভৌম ক্ষমতার আধার যেহেতু ভারতের জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ গণপরিষদে সমবেত হয়ে দেশের সর্বোচ্চ মৌলিক আইন হিসেবে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে জনগণই দেশের সংবিধানের মূল রচয়িতা। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে গণপরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রী হরিবিষ্ণু কামার্থ বলেছিলেন, গণপরিষদের সদস্যবৃন্দ ব্যক্তি বিশেষ নন। তাঁরা হলেন ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। গণপরিষদে তাঁরা সমস্ত ভারতবাসীর নামে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষে সংবিধান রচনার কাজ করেছেন। সুতরাং আইনগত দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জনগণকেই চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। গণপরিষদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানের উৎস জনগণ এর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতা জনগণেরই হস্তে ন্যস্ত রয়েছে। যেহেতু ভারতের সংবিধান জনগণ কর্তৃক রচিত ও গৃহীত হয়েছে সেই হেতু একে মান্য করা ভারতীয় মাত্রেরই নৈতিক কর্তব্য বলে অনেকে মনে করেন।

কিন্তু সমালোচকরা বলেছেন যে ভারতবর্ষের সংবিধানে জনগণকে সংবিধানের উৎস বলে বর্ণনা করা হলেও কার্যত ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় জনগণের তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে সমগ্র ভারতীয় জনগণের শতকরা ১৩ ভাগ লোকের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত ভারতীয় গণপরিষদের কার্যত কোন গণভিত্তিই ছিল না। কাজেই বলা যায় যে গণপরিষদের সদস্যরা জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হননি এবং তাদের নির্বাচনে স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান ভারতীয় পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে

গিয়ে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কে. সি. হোয়ার (K. C. Wheare) বলেন, গণপরিষদে ভারতীয় জনগণ সংবিধান রচনা করেছিলেন বলা হয়, কিন্তু ভারতীয় জনগণের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিদের নিয়েই গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল।

৬৮.৩ সংবিধানের উপর কোন গণভোট নেওয়া হয়নি

সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে কোন গণভোট না নেওয়ার জন্য ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে সমালোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের সংবিধান রচিত হবার পর সেই সংবিধানকে গণভোট দেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে সেরকম কিছু করা হয়নি। ফলে রচিত সংবিধানের প্রতি জনগণের কতটা সমর্থন আচে তা যাচাই করবার সুযোগ হয়নি। সংবিধানকে গণভোটে পেশ না করেই 'ভারতীয় জনগণ সংবিধান রচনা করেছেন' এমন মত পোষণ করা অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এমনকি সংবিধান বিশেষজ্ঞ Dr. K. V. Rao তাঁর Parliamentary Democracy in India তে মন্তব্য করেছেন যে এক অর্থে কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের উপর সংবিধানকে চাপিয়ে দিয়েছে।

১৯৪৯ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের উৎস হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত ও গৃহীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ (India Independence Act 1947)। এই আইন বলেই গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধান রচনা করার সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু ব্রিটিশ আইনের দ্বারা গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানকে কোনক্রমেই ভারতীয় জনগণের সংবিধান বলে গণ্য করা যায় না। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'From Raj to Swaraj' এ মন্তব্য করেছেন যে ব্রিটিশ আইনের দ্বারা যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে তা কখনই ভারতীয় জনগণের সৃষ্ট বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না।

তাছাড়া ভারতীয় গণপরিষদে কেবল প্রাদেশিক আইন সভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ছিলেন না, সেই সঙ্গে দেশীয় রাজবর্গের প্রতিনিধি এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যরাও ছিলেন। সুতরাং গণপরিষদের সদস্যদের একটি অংশ রক্ষণশীল সামন্ততন্ত্রের এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র হিসেবে থাকায় গণপরিষদ গণচরিত্রলাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে সমালোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেই জন্য সংবিধানের খসড়ার উপর প্রত্যক্ষভাবে জনমত যাচাই করার চিন্তা তাদের মনে আসেনি। এর ফলে ভারতের সংবিধান সরকারিভাবে গৃহীত হবার ঘোষণার আগে তার উপর জনমত যাচাই করার কোন ব্যবস্থা হয়নি। একমাত্র প্রত্যক্ষ গণভোটের দ্বারাই এ কাজ করা সম্ভব হত। সোভিয়েত রাশিয়াতে এ কাজ করা হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের ১৯ বছর পরে ১৯৩৬ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সংবিধান প্রথম চালু হয়। এর আগে দুই দশক ধরে সংবিধানের খসড়া তৈরি হয়। খসড়া সংবিধানটিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা সারাংশ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতিলাভ করেছিল।

ভারতীয় সংবিধানের গণচরিত্র সম্বন্ধে এই সমালোচনার বিরুদ্ধে তিনটি যুক্তি দেখানো হয়।

প্রথমত, তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবেশে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাহায্যে গণপরিষদ গঠন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে বাদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণপরিষদ তৈরি করা খুব কঠিন কাজ ছিল।

দ্বিতীয়ত, গণপরিষদ সদস্যদের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করার ব্যবস্থা করলেও গণপরিষদের গঠন প্রকৃতি অপরিবর্তিতই থাকত বলে মনে করা হয়। কারণ ঐ সময় কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের ভাবমূর্তি জনমনে দৃঢ় ছিল না। জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত না হলেও গণপরিষদে পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারূপেই জনমনে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ভারতের ংসবিধান প্রবর্তিত হবার পর ১৯৫২ সালে 'প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নতুন কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় সেই আইনসভা গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধানকেই অপরিবর্তিথভাবে গ্রহণ করেছে।

চতুর্থত, ভারতের সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল। ভারতের পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের মতই সহজ পদ্ধতিতে সংবিধানের অধিকাংশ ধারাই প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারা যায়। এতাবৎকাল প্রায় নব্বইটি সংশোধন ছাড়াও অন্তত দু'বার বিদ্যমান সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের উপলক্ষ্য দেখা দিয়েছে। একবার ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ৪২তম সংশোধনকালে। দ্বিতীয়বার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের উদ্যোগে। ১৯৯৯ সাল থেকে একটি সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন কাজ করে চলেছে। উভয়ক্ষেত্রেই সংসদের অনুমোদনকেই সংবিধান পরিবর্তনের বৈধতা জ্ঞাপক বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং দীর্ঘ পাঁচ দশকের ওপর একটানা প্রয়োগ এবং নিয়মিত সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভারতের সংবিধান নিশ্চিতভাবেই গণসমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছে বলা যায়। সর্বোপরি এই সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি (basic features) যাতে কোনো শাসকদল সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিকৃত বা বিনষ্ট না করতে পারে, দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ও সেই মর্মে আদেশ জারি রেখেছেন।

৬৮.৪ গণপরিষদের কাজে পদ্ধতিগত ত্রুটি

গণপরিষদে কংগ্রেস দলের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় প্রকৃতিগতভাবেও গণপরিষদ কংগ্রেস পরিষদে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাকিস্তানে স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠিত হওয়ায় ভারতীয় গণপরিষদে কংগ্রেসের শক্তি ও প্রাধান্য আরও বেড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে জন অস্টিন বলেছেন প্রধানত একদলীয়. দেশে গণপরিষদ হল একটি একদলীয় সংস্থা (One Party body)। গণপরিষদই ছিল কংগ্রেস আর কংগ্রেসেই ছিল ভারতবর্ষ (The Assembly was the Congress and the Congress was India)। বাহ্যত, গণপরিষদ, কংগ্রেস এবং সরকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও কার্যক্ষেত্রে সবাই ছিল এক। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে

আবার নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আজাদের সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব গণপরিষদের গঠন ও সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এই ভূমিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন অস্টিন (John Austin) কংগ্রেস গোষ্ঠী-প্রাধান্য (Congress Oligarchy) বলে অভিহিত করেছেন। এহেন গণপরিষদের কার্যপদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভারতীয় গণপরিষদের কাজে এই কারণে নানা পদ্ধতিগত ত্রুটি ঘটেছিল।

গণপরিষদ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি নানা কারণে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। প্রথমত, গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত মুসাবিদা অর্থাৎ খসড়া প্রণয়ন কমিটি (Drafting Committee) নিজেকে সিলেক্ট কমিটি এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি বলেই মনে করত। এ বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞ K. V. Rao তার বিখ্যাত পুস্তক Parliamentary Democracy of India-A critical commentary তে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন এই বলে যে একটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে ছাত্রদের চিন্তা করার এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকলেও শেষ কথাটি বলার চূড়ান্ত ক্ষমতা যেমন শিক্ষকমশায়ের থাকে, তেমনি সংবিধানর বিভিন্ন দিক নিয়ে গণপরিষদের সদস্যরা আলোচনা করতে পারলেও মুসাবিদা কমিটির সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।

দ্বিতীয়ত, মুসাবিদা কমিটির সভাপতি ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের উপরওয়ালা সুলভ (bossist) মনোভাব অনেক সদস্যকেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে আলোচনা করার ফলে সদস্যরা প্রায়শই বিরক্তি প্রকাশ করতেন। অনেক সময় আবার সংবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয়পাঠ (Second or Third Reading) এর সময় তার পরিবর্তন সাধন করা হত। এই সমস্ত বিধিবহির্ভূত ঘটনা গণপরিষদের সদস্যসের বিক্ষুব্ধ করে তুলত। যখনই এই ধরনের ঘটনা ঘটত তখনই আত্মপক্ষ সমর্থন করে Drafting Committee র সভাপতি Dr. B. R. Ambedkar Constituent Assembly সভায় দক্ষ আইনজীবীর মতন দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। যার জন্য গণপরিষদের একজন সদস্য মুসাবিদা কমিটিকে really a debating committee বলে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ত, তত্ত্বগতভাবে গণপরিষদ এবং তার মুসাবিদা কমিটি ভারতীয় সংবিধান রচনার প্রধান কার্যক্ষেত্র হলেও প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই ছিল এর মূল স্রষ্টা। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কিং কমিটি বা অন্য কোন স্থানে আলোচনা করে সংবিধান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন Drafting Committee সেই অনুসারে কাজ করত মাত্র। এর ফলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নির্দেশই সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ামক ছিল।

৬৮.৫ সামাজিক বিপ্লবের অঙ্গীকারের প্রকৃত স্বরূপ

মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষমতার হস্তান্তর (transfer of power) মাত্র। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে পরিত্যক্ত উপনিবেশে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (M. N. Roy) কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিক (Communist International) এর সভায় তাঁর বিখ্যাত উপনিবেশ বিমোচনের যে তত্ত্ব (Theory of

Decolonisation) হাজির করেন তাতে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে আগামী দিনে বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করে চলে যাবে। বিনিময়ে যাদের হাতে তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে তাদের সম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট উপনিবেশগুলিতে বাদ মহৎ যুদ্ধের পরে স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদীরা যা দিয়েছিল তা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্ষমতার হস্তান্তর, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ক্ষমতার হস্তান্তর (Transfer of power) প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উপনিবেশ বিমোচন তত্ত্বের (Theory of De colonisation) এর বাস্তব মাত্র।

ভারতের গণপরিষদের গঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেসময় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দই সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। জওহরলালের মতো কিছু উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতারা গণপরিষদে স্থান লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের রক্ষণশীল পুঁজিবাদের সঙ্গেই আপোস করতে হয়েছিল। তাছাড়া গণপরিষদে দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি থাকায় তাঁরা সব সময়েই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। এর ফলে কার্যত গণপরিষদ বুর্জোয়া জমিদার শাসিত শাসনব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিল তাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের জন্য কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি। সংবিধানের মধ্যে যেমন কাজের অধিকার লিপিবদ্ধ হয়নি তেমনি সমাজের মধ্যেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন গণপরিষদ-সদস্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে ভারতের সংবিধান পুঁজিপতিদের কাছে মহাসনদ হলেও দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ঐ সংবিধানে করা হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে জাতীয় এবং সামাজিক বিপ্লব (National and Social Revolutions) সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। Granville Austin তাঁর বিখ্যাত বই "The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation" এ মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয় গণপরিষদ (Indian Constituent Assembly) এর প্রধান কাজ ছিল এমন একটি সংবিধান তৈরি করা, যে সংবিধান সামাজিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরণ করবে। গণপরিষদের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন যে গণপরিষদের প্রধান কাজ হবে একটি নতুন সংবিধানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা, ভারতের ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া, বস্ত্রহীন ভারতবাসীর পরিধানের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিটি ভারতবাসীকে তার নৈপুণ্য অনুযায়ী আত্মবিকাশের জন্য সর্বাধিক সুযোগ দান করা। গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন যে জনগণের দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো (to end poverty and squalor), বৈষম্য ও শোষণের বিলোপ সাধন এবং সুন্দর জীবনযাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই গণপরিষদের লক্ষ্য। ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণও 'ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন' সাধনের জন্য 'একটি সামাজিক অর্থনৈতিক' বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন,

গণপরিষদের কাজ হবে জাতি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা।

কিন্তু গণপরিষদ কর্তৃক ঘোষিত সামাজিক বিপ্লবের অঙ্গীকার ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে রূপায়িত হয়নি। স্বাধীনতার ৫০ বৎসর পরেও গণপরিষদের ঘোষিত লক্ষ্য থেকে ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা বহুদূরে অবস্থান করছে। ভারতের ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাহীন কোন রাজনৈতিক শক্তিই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা (requisite political will) পোষণ করেনি।

৬৮.৬ ভারতীয় সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি

মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান হল একটি লিখিত দলিল। রাজনীতি তাকে ব্যবহারিক রূপ দেয়। বলাবাহুল্য, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সম্পর্কই হল রাজনীতির মূলকথা। সুতরাং ভারতের সংবিধান তার রাজনীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতরাষ্ট্র ও তার শাসকশ্রেণীর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়তা করে। আবার উপরিকাঠামোর এই বিচার বিশ্লেষণ ভারতরাষ্ট্র ও তার সংবিধানের অর্থনৈতিক ভিত্তি (economics foundations) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে আমাদের সাহায্য করে। কারণ প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে তার উপরিকাঠামো।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে যেভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শ্রেণী চরিত্রের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে, ভারতের সংবিধানে সেরূপ কিছু বলা হয়নি। তবে সংবিধানের বিভিন্ন অংশ এবং ভারতীয় রাজনীতির কষ্টিপাথরে বিচার বিশ্লেষণের মারফত আমারা ভারতের সংবিধান তথা সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক জনসমর্থন লাভের আশায় কংগ্রেস দেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বৈদেশিক শাসনের অবসানের পর তাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচবে এবং তাদের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করে নতুন ভারত গড়ে তোলা হবে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরে কংগ্রেস দল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের বিকাশ সাধনে অগ্রসর হয়।

সংবিধান ছাড়াও স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস পরিচালিত ভারত সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলী ও ঘোষিত নীতির মধ্যে ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রকৃতি অনুমান করা যায়। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৮ সালে গৃহীত কংগ্রেস সরকারের দুইটি নীতি নির্ধারক প্রস্তাবে (Policy Resolutions) একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে (Mixed Economy) নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হল। এবার কংগ্রেস সরকার মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে একই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাকে পাশাপাশি চলার সুযোগ করে দেয়।

ভারতীয় সংবিধানে কেবল রাজনৈতিক লোকতন্ত্র নয়, সমাজতান্ত্রিক লোকতন্ত্রেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ডঃ আম্বেদকর সংবিধান সভায় তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেছিলেন যে রাজনৈতিক লোকতন্ত্রের ভিত্তি মূলে যদি সামাজিক লোকতন্ত্র না থাকে তা হলে তা স্থায়ী হতে পারে না। সামাজিক লোকতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে এটা এমন এক জীবনধারা যা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সভ্য জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য কতগুলি ন্যূনতম অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারা যাবে ততদিন পর্যন্ত কোন অর্থেই লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে কতকগুলি অধিকার প্রত্যাভূত করা অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না সামাজিক কাঠামো থেকে সমস্ত রকম অসমান্য তা দূর করা যায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশে তাকে সমান প্রতিষ্ঠার ও সুযোগের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ভারতের সংবিধানে এই উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র কর্তৃক কেবল ধর্ম, বংশ, জাতি, লিঙ্গ কিংবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে এক নাগরিককে আরেক নাগরিক থেকে কোনভাবে পার্থক্য করাকে অবৈধ ঘোষণা করে। নাগরিকদের মধ্যে সাম্য সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও রাজনৈতিক সাম্য আনার জন্য সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সব উদ্দেশ্য বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে অবশ্যই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের সম্প্রসারণ দরকার। সেইজন্য সংবিধানের একটি বিশেষ অধ্যায়ে (Part IV) নির্দেশমূলক নীতির উল্লেখকালে যে লক্ষ্য সামনে রাখা হয়েছে তা হল কল্যাণ রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আজাদী অধিবেশনে গৃহীত এক সংকল্পমূলক প্রস্তাবে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে।

৬৮.৭ সারাংশ

প্রত্যেক দেশের সংবিধানের একটি নিজস্ব দর্শন আছে। একটি সংবিধানের দর্শন বা আদর্শ বলতে সেইসব আদর্শ (ideals) বা নীতি সমূহকে (policies) বোঝায় যেগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সংবিধান তৈরি হয়।

গণপরিষদে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উত্থাপিত 'উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাব' (Objetive Resolution) এর দিকে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ১৯৪৬'সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণপরিষদে নেহরু উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ শে জানুয়ারি তা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। 'উদ্দেশ্য সমূহ সংক্রান্ত প্রস্তাবে' ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র (an Independent Sovereign Republic) বলে বর্ণনা করা হয়। প্রস্তাবে জনগণকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের (Source of all power and authority) উৎস বলে বর্ণনা করা হয়। নেহরু উত্থাপিত উদ্দেশ্য সমূহ প্রস্তাবের (Objective

Resolution) আদর্শকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Premble) বিশ্বস্তভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবনার মধ্যেই ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান আদর্শ ও নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে।

৬৮.৮ অনুশীলনী

১। ভারতীয় গণপরিষদের কোন গণচরিত্র ছিল না বলে অভিযোগকারীদের যে অভিযোগ তা কতটা যুক্তিসংগত?

২। কী কারণে ভারতের সংবিধানের উপর গণভোট নেওয়া হয়নি সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। গণপরিষদের কাজের পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভারতীয় গণপরিষদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একক দলীয় প্রাধান্য ঘটার কারণ কী?

৫। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতে সামাজিক বিপ্লবের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে অঙ্গীকার কতটা রক্ষিত হয়েছে?

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(১) ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি — *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামানিক।*

(২) Recent Trends in Indian Nationalism — *A. R. Desai.*

(৩) Introduction to the Constitution of India — *Dr. Durgadas Basu.*

(৪) Parliamentary Democracy in India — *K. V. Rao.*

(৫) From Raj to Swaraj — *Dr. D. N. Sen*

(৬) The Indian Constitution : Corner stone of a Nation — *Granville Austin*

একক ৬৯ ☐ প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য, নির্দেশমূলক নীতিসমূহ

গঠন

৬৯.০ উদ্দেশ্য

৬৯.১ প্রস্তাবনা বা ভূমিকা

৬৯.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা অর্থ ও গুরুত্ব

৬৯.৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বর্তমান রূপ

৬৯.৪ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উৎস

৬৯.৪.১ ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি

৬৯.৫ প্রস্তাবনায় ঘোষিত মূল নীতিসমূহ

৬৯.৬ মূল্যায়ন

৬৯.৭ মৌলিক অধিকারের ধারণা

৬৯.৭.১ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার—সাম্যের অধিকার

৬৯.৭.২ স্বাধীনতার অধিকার

৬৯.৭.৩ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

৬৯.৭.৪ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

৬৯.৭.৫ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

৬৯.৭.৬ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

৬৯.৮ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

৬৯.৯ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

৬৯.১০ সারাংশ

৬৯.১১ অনুশীলনী

৬৯.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৬৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককের মধ্যে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমে আছে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবনাটি পড়লে আমরা ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য ও আদর্শগুলি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করবো। মৌলিক অধিকারের অধ্যায়টি থেকে আমরা ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং এই

অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবো। একই সঙ্গে ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের কি কি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে সেটিও জানা যায়। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি হলো রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশ। শাসন পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই নির্দেশগুলি মেনে চলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়টি থেকে আমরা জানতে পারবো দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের কী ধরনের ভূমিকা থাকা প্রত্যাশিত। এই নীতিগুলির গুরুত্ব ও বাস্তবে এই নীতিগুলি কতদূর কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে সে সম্পর্কেও আমরা একটি ধারণা লাভ করবো।

৬৯.১ প্রস্তাবনা বা ভূমিকা

আলোনার সুবিধার জন্য একটিকে তিনটি অংশ ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার শেষে একটি অনুশীলনী আছে। এই অনুশীলনীতে অধ্যায়টির ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর কি হবে সে সম্পর্কেও উত্তর-সংকেত দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলির মধ্যে কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন আছে যেগুলির উত্তর খুব ছোট হবে। আবার কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলির উত্তর প্রবন্ধ আকারের হবে। এই দুধরনের প্রশ্নেরই উত্তর-সংকেত দেওয়া হয়েছে।

৬৯.২ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব

কোনো দেশের শাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের সমষ্টিকে সাধারণভাবে দেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়। প্রায় সকল দেশেই দেখা যায় যে লিখিত সংবিধানের মূল অংশের আগে একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৭৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানের আগে সর্বপ্রথম একটি প্রস্তাবনা যোগ করা হয়েছিল।

প্রস্তাবনা আসলে সংবিধানের মূল অংশকে উপলব্ধি করার চাবিকাঠি। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কোনো লেখক তাঁর মূল বইটি শুরু করার আগে একটি ভূমিকা লেখেন। এই ভূমিকাটি পড়লে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি আভাস পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি প্রস্তাবনাও হল সংবিধানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ। প্রস্তাবনা আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধান কেবলমাত্র একটি নিছক আইনগত দলিল নয়। প্রত্যেক সংবিধানই কতকগুলি আদর্শ বা নীতির ভিত্তিতে রচিত হয়। প্রখ্যাত সংবিধানবিদ ডাঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে প্রত্যেক সংবিধানেরই একটি নিজস্ব দর্শন আছে। প্রস্তাবনার মাধ্যমে সংবিধানের দর্শন প্রতিফলিত হয়। প্রস্তাবনার গুরুত্ব হলো এই যে সংবিধান

রচয়িতারা যে সমস্ত আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে সংবিধানটি রচনা করেছেন প্রস্তাবনা সেগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে। তবে প্রস্তাবনার আইনগত মূল্য বিশেষ নেই। প্রস্তাবনা মূল সংবিধানের অংশ নয়। মূল সংবিধানের ভাষা ও বক্তব্য যদি স্পষ্ট হয় তবে প্রস্তাবনা তার অর্থের কোনো রকম পরিবর্তন করতে পারে না। প্রস্তাবনার সঙ্গে মূল সংবিধানের কার্যকরী অংশের কোনো বিরোধ দেখা দিলে আদালত সংবিধানের কার্যকরী অংশকেই প্রাধান্য দেয়। তবে মূল সংবিধানের ভাষা বা বক্তব্যগত অস্পষ্টতা থাকলে সেই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য প্রস্তাবনার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৬৯.৩ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার বর্তমান রূপ

এবার আমরা ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধান রচনার সময় মূল প্রস্তাবনাটি যেরকম ছিল, পরবর্তীকালে তার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন করা হয়েছে। এই সংশোধনের ফলে মূল প্রস্তাবনাটির সঙ্গে তিনটি নতুন শব্দ যোগ করা হয়েছে। এই শব্দগুলি হলো 'Socialist' বা 'সমাজতান্ত্রিক' 'Secular' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'integrity' বা 'সংহতি'। ভারতের সংবিধানের বর্তমান প্রস্তাবনাটি হল এইরকম।

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সংকল্প গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিকের জন্য

সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ন্যায়বিচার:

চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা;

মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

৬৯.৪ ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার উৎস

প্রস্তাবনার শুরুতে 'আমরা ভারতের জনগণ' শব্দগুলির মাধ্যমে সংবিধানের উৎসটি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার এই শব্দগুলিকে প্রস্তাবনার সবচেয়ে বৈপ্লবিক শব্দগুচ্ছ বলে অভিহিত করেছেন। এস্.এল্. সিক্রি বলেন যে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে 'আমরা ভারতের জনগণ' বক্তব্যটির অর্থ হল এই যে ভারতের বর্তমান সংবিধান ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এই আইনগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা রচিত হয়েছিল এবং ভারতবাসীর ওপর আরোপ করা হয়েছিল। ভারতের নতুন সংবিধান ভারতেই গৃহীত

হয় এবং এই সংবিধান ভারতবাসীকেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে মনে করে। ডাঃ দুর্গাদাস বসুকে অনুসরণ করে বলা যায় যে 'জনগণ' শব্দটির দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে ভারতীয় সংবিধান কয়েকটি রাজ্যের অধিবাসীদের দ্বারা রচিত হয়নি। 'জনগণ' শব্দটির দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমস্ত ভারতবাসীকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কোনো একটি বা কয়েকটি রাজ্য এই সংবিধান ভঙ্গ করতে পারে না বা ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই সংবিধানকে মেনে চলার দায়িত্ব প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে।

'আমরা ভারতের জনগণ' এই বক্তব্যের সমালোচনা করে অনেকে বলেছেন যে ভারতের সংবিধানের উৎস ভারতের জনগণ — এই ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ সংবিধান রচনা করেছে গণপরিষদ। এই গণপরিষদ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। আবার জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্যে সংবিধানকে গণভোটেও পেশ করা হয় নি। অনেকে মনে করেন যে তখনকার পরিস্থিতিতে গণপরিষদ গঠনের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। সংবিধানকে গণভোটে পেশ করাও ছিল যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আরোও বলা হয় যে সংবিধান প্রবর্তনের পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিতে সকল দল ও জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণ এই সংবিধানকে গ্রহণ করেছে।

৬৯.৪.১ ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতি

(ক) প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা হল সেই ক্ষমতা যার জোরে রাষ্ট্র আইন তৈরি ও প্রয়োগ করতে পারে। এই ক্ষমতার জোরেই রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক আছে — আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থ হল এই যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আইন মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্রের ওপর কোন বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুটি দিক থেকেই ভারত হল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কারণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর কোনো বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই।

ভারত কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর সদস্য। কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্ হল বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। ব্রিটিশ রাজা বা রানী হলেন এই কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর প্রতীকী প্রধান। ১৯৮৯ সালের ২৭ শে এপ্রিল লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীদের একটি সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে ভারত একটি সার্বভৌম, স্বাধীন, প্রজাতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্ এর পূর্ণ সদস্য থাকবে। অনেকে মনে করেন যে কমনওয়েলথ অফ্ নেশনস্-এর সদস্য হওয়ায় ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের সংবিধানে এই ঘোষণার কোন উল্লেখ নেই। এই ঘোষণার ফলে ভারতের নাগরিকরা ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে কোনো রকম আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য নয়। কমনওয়েলথ-এর সম্মেলনগুলিতে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্ত মেনে নেবার বাধ্যবাধকতাও ভারতের নেই। ভারত স্বেচ্ছায় এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় এই সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারে। সুতরাং কমনওয়েলথ-এর সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

(খ) ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংশোধনের দ্বারা প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র হল ধনতন্ত্রের বিপরীত সমাজব্যবস্থা। এখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তির হাতে থাকে না। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের ওপর সামাজিক মালিকানা বজায় থাকে। এখানে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বণ্টনব্যবস্থার ওপরেও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী ভারতকে পরিপূর্ণ অর্থে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা সংবিধানের লক্ষ্য নয়। এখানে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণগুলির রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় নি। আবার বেসরকারি সম্পত্তিরও সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা হয় নি। ভারতে সকল সম্পত্তি ও শিল্পের পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের পরিবর্তে 'মিশ্র অর্থনীতি' গৃহীত হয়েছে। এখানে অর্থনীতিতে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পাশাপাশি অবস্থান করে। ভারতে গৃহীত সমাজতন্ত্রের আদর্শ হল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করাই এর লক্ষ্য।

(গ) ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবনায় 'Secular' বা 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভারতের জাতীয় জীবনের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় যুক্ত হওয়ার ফলে এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূল কথা হল এই যে ভারত রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করে না। রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা পোষণ করবে না। এখানে সকল মানুষ নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করতে পারবে। রাষ্ট্র সকল ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন আচরণ করবে এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনরকম বিভেদমূলক আচরণ করবে না। ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করেন। প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতায় আদর্শ ঘোষণা করে এই বহু ধর্মের দেশের জনগণের মধ্যে একতাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঘ) প্রস্তাবনায় ভারতকে 'গণতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। ভারতে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনকাজ পরিচালনা করে না। এখানে গণতন্ত্র হল পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। এখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। জনগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। ভারতে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যে রাজ্যপাল হলেন শাসকপ্রধান। তাঁদের নামে শাসন পরিচালিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা

করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদ। এই মন্ত্রী পরিষদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী থাকে।

(ঙ) প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সাধারণতন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে বা অন্য কোনো ভাবে রাজপদের অস্তিত্ব থাকে না। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়। ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানীর কোনো স্থান নেই। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখানে স্ত্রী-পুরুষ, বংশ, ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকই প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার সকলেরই আছে।

৬৯.৫ প্রস্তাবনায় ঘোষিত মূলনীতিসমূহ

প্রস্তাবনায় সংবিধানের চারটি মূল নীতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই নীতিগুলি হল ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই সমাজে বাস করি। একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে আমাদের ব্যক্তি-স্বার্থ অবশ্যই থাকবে। তবে ব্যক্তি-স্বার্থের পাশাপাশি সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। ন্যায় হল সেই নীতি যা ব্যক্তি-স্বার্থ ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রস্তাবনায় ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটি সার্বিক প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের প্রতি সামাজিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদাহরণ হিসাবে অস্পৃশ্যতার বিলোপ, অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা বলা যায়। প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সমাজতন্ত্র' বলে ঘোষণা করার মধ্যে আর্থিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি।

প্রস্তাবনায় সকল নাগরিককে চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা দেবার কথা বলা হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে যাতে নাগরিকের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। স্পষ্টতই স্বাধীনতার অর্থ এখানে নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়। ব্যক্তির আচরণের ওপর কোনো বাধানিষেধ থাকবে না এই নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় নি। স্বাধীনতা শব্দটিকে এখানে সদর্থক বা ইতিবাচক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাধীনতা বলতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশকে বোঝানো হয়েছে।

প্রস্তাবনায় সাম্যের নীতির মাধ্যমে সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমান ব্যক্তি-মর্যাদা ও সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। সাম্যের নীতিকে রূপায়িত করার জন্য সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় সাম্যের অধিকারের

উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে আইনের সমতা, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। আবার বংশ, বর্ণ, জন্মস্থান, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদকরণ নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রস্তাবনায় ঘোষিত অন্যতম একটি নীতি হলো ভ্রাতৃত্ব। সংবিধান প্রণেতারা একথা যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা দরকার। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের ফলে প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্যের সঙ্গে 'সংহতি' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। ভারত বহু ভাষাভাষী এবং বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রস্তাবনা এক শক্তিশালী জাতিগঠনের আদর্শ গ্রহণ করেছে।

৬৯.৬ মূল্যায়ন

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনার মূল্যায়নে বলা যায় যে প্রথমত, প্রস্তাবনায় সংবিধানের উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রণেতারা কী ধরনের রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন প্রস্তাবনায় সেটি ব্যক্ত হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রস্তাবনায় সংবিধানের আদর্শ ও মূলনীতিগুলি ঘোষিত হয়েছে। এই আদর্শ ও নীতিগুলি যে আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্য, প্রস্তাবনা আমাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দিক থেকে প্রস্তাবনার নৈতিক মূল্য আছে। প্রস্তাবনা সমগ্র জাতি ও জাতির প্রতিনিধিদের কাছে একটি পথনির্দেশক। তবে প্রস্তাবনায় আদর্শ ও নীতিগুলির ঘোষনাই যথেষ্ট নয়। এই আদর্শ ও নীতিগুলিকে বাস্তবে কতটা রূপায়িত করা হয়েছে সেটি হলো মূল বিচার্য বিষয়। প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি নীতিগুলির ঘোষণা সত্ত্বেও বাস্তবে এই নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রস্তাবনায় ঘোষিত আদর্শগুলিকে সার্থক করে তোলার জন্য উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার।

৬৯.৭ মৌলিক অধিকারের ধারণা

সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধার দরকার হয়। সাধারণভাবে এই সুযোগ সুবিধাগুলিকেই আমরা অধিকার বলে থাকি। এই অধিকারগুলির মধ্যে কতকগুলি অধিকার আবার মানুষের সুস্থ জীবন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। মানুষের জীবনের পক্ষে এই একান্ত অপরিহার্য অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত হয়। যে সমস্ত দেশে লিখিত সংবিধান থাকে সেই সমস্ত দেশে এই লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ থাকে। এই মৌলিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।

৬৯.৭.১ ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার - সাম্যের অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য কতকগুলি অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই

অধিকারগুলির মধ্যে প্রথম অধিকারটি হলো সাম্যের অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় এই অধিকারটির উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার সাম্যের ধারণা একটি ব্যাপক ধারণা। মানুষের জীবনের সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই ধারণা পরিব্যাপ্ত। কিন্তু আমাদের সংবিধান রচয়িতারা একথা বুঝেছিলেন যে সদ্যস্বাধীন ভারতের নাগরিকদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল একটি সুদূর পরিকল্পনা যেটির তাৎক্ষণিক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সেই কারণে তাঁরা সাম্যের অধিকারের ক্ষেত্রে রাজনীতিক ও আইনানুগ সমতার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৪ নম্বর ধারা - সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না। ধারাটিতে দুটি নীতির উল্লেখ রয়েছে, যথা (১) আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং (২) আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষণ। বিচারপতি কে. সুব্বারাও এই দুটি নীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ১৯৬০ সালে উত্তর প্রদেশ বনাম দেওমন মামলায় রায় দেবার সময় তিনি বলেন যে এই নীতি দুটির মধ্যে প্রথম নীতিটি হল নেতিবাচক এবং দ্বিতীয় নীতিটি হল ইতিবাচক। প্রথম নীতিটি এই অর্থে নেতিবাচক যে এর দ্বারা বিশেষ সুযোগ সুবিধার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় নীতিটি এই অর্থে ইতিবাচক যে এটি আইনের সমান আচরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ধারণাটির ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা গ্রেট-ব্রিটেনের প্রথাগত আইন এবং ডাইসির আইনের অনুশাসনের দ্বারা প্রভাবিত হন। ডাইসির ধারণা অনুসারে আইনের দৃষ্টিতে সমতার অর্থ হল এই যে কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের ঊর্ধ্বে নন। দেশের সাধারণ আইন সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকল ব্যক্তিই সমানভাবে সাধারণ আদলতের এক্তিয়ারভুক্ত হবেন। রাষ্ট্রের কাছে কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

ভারতে আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতির কিছু ব্যতিক্রম আছে। প্রথম ব্যতিক্রমটি হলো রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের ক্ষেত্রে। তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল হবেন না। তাঁরা যতদিন তাঁদের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মামলা আনা যাবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা আনতে হলে লিখিতভাবে দু'মাসের নোটিশ দিতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রমটি হলো সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। তাঁরা পদাধিকারবলে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, সাধারণ নাগরিকরা সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম অনুসারে বিদেশী শাসক ও রাষ্ট্রদূত এই নিয়মের প্রয়োগ থেকে অব্যাহতি পান।

চতুর্থত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সাধারণ আদালতের পরিবর্তে শাসন বিভাগীয় বিশেষ আদালতের অস্তিত্ব দেখা যায়।

'আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত' হবার নীতিটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন থেকে গৃহীত হয়েছে। আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষণের অধিকার বলতে বোঝায় যে যে সমস্ত ব্যক্তি একই অবস্থা বা একই পরিস্থিতিতে অবস্থিত তাদের সকলের প্রতি আইন একই রকম আচরণ করবে। তবে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন করা যায়। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন আয়ের তারতম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে আয়কর আদায় করতে পারে। শ্রেণী বিভাজনের দুটি শর্ত আছে। প্রথমত, শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি সুস্পষ্ট ও সমাজবোধ্য হবে। দ্বিতীয়ত, আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সেটির যথোপযুক্ত সম্পর্ক থাকা চাই।

শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সময়ের ব্যবধান, ব্যবসা, বৃত্তি বা উপজীবিকা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে শ্রেণী বিভাজন করা যেতে পারে। তবে শ্রেণীবিভাজন যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। শ্রেণীবিভাজনের নীতিটি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কিনা আদালত সেটি বিচার করতে পারে।

১৫ নম্বর ধারা - সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারায় কয়েকটি বিশেষ কারণের ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (১) ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এ ছাড়া সংবিধানের ১৫ (২) ধারা বলেছে যে এই কারণগুলির ভিত্তিতে দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল বা জনসাধারণের জন্য নির্ধারিত কোনো আমোদপ্রমোদের স্থানে কোনো নাগরিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা যাবে না। আবার যে সমস্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ বা জনসমাগমের স্থান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত বা জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

তবে ১৫ (৩) এবং ১৫ (৪) ধারায় কিছু ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাদের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম হতে পারে সে কথা সংবিধানে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৫ (৩) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। ১৫(৪) ধারায় উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলি হলো সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিসমূহ। এদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

১৬ নম্বর ধারায় - সরকারি চাকরির অধীনে নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৬(১) ধারায় রাষ্ট্রের অধীনে নিয়োগ এবং চাকরিতে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা বলা হয়েছে। ১৬(২)

ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, বর্ণ, বংশ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা বাসস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের কোনো নিয়োগ বা চাকরির ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কেবলমাত্র এই কারণগুলির জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমতার অধিকারেরও কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে। প্রথমত, কোনো অঙ্গরাজ্য বা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের অধীনে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট আইন করে ঐ রাজ্যে বসবাসের শর্ত আরোপ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরি বা পদ সংরক্ষিত রাখা যায়। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে প্রশাসনিক নৈপুণ্যের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, যে সমস্ত চাকরি বা পদ কোনো বিশেষ ধর্মের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সেই সমস্ত চাকরি বা পদ সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

১৭ নম্বর ধারায় - সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। বহু দিন থেকেই ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্গের মানুষেরা অস্পৃশ্যতার অভিশাপের শিকার হয়ে ছিল। এই অবমাননাকর প্রথাটির বিলোপ সাধন করে সংবিধান সমাজের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের জীবনে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। সংবিধানে বলো হয়েছে যে অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের ওপর কোনরকম অযোগ্যতা বা অক্ষমতা সংক্রান্ত অপরাধ আইন পাশ করেছে। ১৯৭৬ সালে সংশোধনের পর আইনটি বর্তমানে Protection of Civil Rights Act নামে পরিচিত।

১৮ নম্বর ধারায় - ভারতের নাগরিকদের মধ্যে সমান সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারাটির কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮ নম্বর ধারায় কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র সামরিক বা বিদ্যাবিষয়ক গুণের পরিচায়ক নয় এখন কোনো খেতাব বা উপাধি কোনো নাগরিককে দিতে পারবে না। ১৮(২) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো খেতাব গ্রহণ করতে পারবে না। সংবিধানের ১৮(৪) ধারা অনুযায়ী ভারত সরকারের অধীনে লাভজনক অধিষ্ঠিত আছেন এমন কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো উপঢৌকন বা বেতন বা কোন পদ গ্রহণ করবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ গুণের স্বীকৃতি হিসাবে ভারতে নাগরিকদের 'ভারতরত্ন', 'পদ্মভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ১৯৫৪ সাল থেকেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষণতায় আসার পর এই ব্যবস্থা বাতিল হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) সরকার ক্ষমতায় ফিরে এলে এই ব্যবস্থাটি পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

সংবিধান খেতাব প্রদানের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনায় বলা হয় যে এই ব্যবস্থা সাম্যের নীতি বিরোধী। এর ফলে এক বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত কিছু নাগরিকের সৃষ্টি হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে এই

সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে বিশিষ্ট নাগরিকদের বিশেষ গুণাবলীকেই স্বীকৃতি জানানো হয়। তাছাড়া এই খেতাপ নামের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না। এর ফলে নাগরিক কোনো বিশেষ সামাজিক সুবিধাসুযোগ ভোগ করেন না। সুতরাং বা উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা সাম্যের নীতির পবিপন্থী নয় বলেহ অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

সাম্যের অধিকারের মূল্যায়ন ঃ

ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত সাম্যের অধিকারটি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, এই অধিকারটি হল মূলত আইনগত এবং রাজনীতিক অধিকার। আর্থনীতিক সাম্যের কথা এই অধিকারটির মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু অর্থনীতিক সাম্য ছাড়া সাম্যের অধিকার মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, অনেকে মনে করেন যে অঙ্গরাজ্যের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে বসবাসগত যোগ্যতার শর্ত সাম্যের নীতির বিরোধী।

তৃতীয়ত, সংবিধানে বলা হয়েছে যে যুক্তিসঙ্গত কারণে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে শ্রেণীবিভাজন করতে পারে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, এই শ্রেণী-বিভাজনের যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

চতুর্থত, অনগ্রসর শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে যে বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেটি কোনো সরকার রাজনীতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে কেবল মাত্র সাংবিধানিক ঘোষণার মাধ্যমে সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর জন্য আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও দরকার।

৬৯.৭.২ স্বাধীনতার অধিকার

ভারতীয় সংবিধান যে সমস্ত আদর্শ রূপায়ণের সংকল্প গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাধীনতার আদর্শ। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভারত হল গণতান্ত্রিক দেশ। স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। স্বাধীনতা কাকে বলে সেটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক ল্যাস্কি। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায় যে স্বাধীনতা বলতে সেই পরিবেশকে রক্ষা কবা বোঝায় যেখানে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ থাকে।

১৯ নং ধারাভুক্ত ছয়টি অধিকার ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ১৯-২২ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। এই ধারাগুলির মধ্যে ১৯

নম্বর ধারাটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মূল সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় সাতটি অধিকারের উল্লেখ ছিল। এই অধিকার হল, (১) ভারতের নাগরিকদের বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকার থাকবে। (২) তারা শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হতে পারবে। (৩) ভারতের নাগরিকরা সমিতি বা সংঘ গঠন করতে পারবে। (৪) তারা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে। (৫) ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনো অংশে তারা বসবাস করতে পারবে। (৬) তাদের সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করার অধিকার থাকবে। (৭) ভারতের নাগরিকরা যে কোনো বৃত্তি অবলম্বন করতে পারবে অথবা তারা যে কোনো উপজীবিকা, ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে পারবে। ১৯৭৮ সালে ভারতের সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের পরে সম্পত্তি, অর্জন, দখল ও হস্তান্তর করার অধিকারটিকে আর মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয় না। সুতরাং এখন ১৯ নম্বর ধারায় সাতটির জায়গায় ছটি অধিকার আছে।

অধিকারগুলির গুরুত্ব

১৯ নম্বর ধারায় যে অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সেগুলির বিশেষ মূল্য আছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি হল স্বাধীন জনমত। চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার না থাকলে সমাজে সুস্থ ও সবল জনমত গড়ে উঠতে পারে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতের সংবিধানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয় নি। গণপরিষদে ডঃ আম্বেদকর বলেছিলেন যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের সমবেত হবার অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। সমবেত হবার অধিকার থাকলেই মানুষের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সহজ হয়। এই ভাব বিনিময়ই জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সংঘ ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকারটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের পক্ষে একক ও বিচ্ছিন্নভাবে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সমিতি বা ইউনিয়নের মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে মতামত জ্ঞাপন করা ও অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয়। ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে। ১৯৫০ সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় বিচারপতি বিজন কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে এই অধিকারটির মাধ্যমে সারা ভারতের একতা ও অভিন্নতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯ নম্বর ধারায় ভারতের নাগরিকদের নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা যে-কোনো উপজীবিকা বা ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে পারে। ভারতীয় সমাজে বহু প্রাচীন কাল থেকেই বর্ণ বা জাত ব্যবস্থার প্রভাব দেখা যায়। বর্ণ বা জাতের ভিত্তিতে পেশাগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত হত। এইভাবে নির্ধারিত পেশাকেই মেনে নিতে ব্যক্তি বাধ্য থাকত। স্বাধীন ভারতের সংবিধান বৃত্তি, উপজীবিকা বা বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের সুযোগ করে দিয়েছে। অধ্যাপক পাইলি বলেছেন যে ভারতে একটি গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এটি হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা ঃ

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৯ নম্বর ধারায় যে অধিকারগুলির উল্লেখ আছে সেগুলি অবাধ নয়। অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সংবিধান রচয়িতারা ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। সেই কারণে সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারার ২-৬ উপধারায় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাধীনতার ওপর যে সমস্ত বাধানিষেধ আরোপ করছে সেগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা সেটি দেখার দায়িত্ব আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকারের ওপর কতকগুলি কারণে বাধানিষেধ আরোধ করা হয়েছে। প্রথমত, এই অধিকারটিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ না হয়। দ্বিতীয়ত, এই অধিকার প্রয়োগের ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃতীয়ত, এই অধিকার প্রয়োগ করে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের কোনোরকম অমর্যাদা করা যাবে না। চতুর্থত, জনশৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হয় এমনভাবে অধিকারটি প্রয়োগ করা যাবে না। পঞ্চমত, শ্লীলতা ও সদাচার অক্ষুণ্ণ রেখে অধিকারটি প্রয়োগ করতে হবে। ষষ্ঠত, বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকারের দ্বারা বিচারালয়ের অবমাননা করা যাবে না। সপ্তমত, এই অধিকার প্রয়োগের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে কোনো অপরাধমূলক কাজ করতে প্ররোচিত করা যাবে না।

সমবেত হবার অধিকারের ওপর বাধানিষেধগুলি হল এই যে সমাবেশ শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে। আবার ভারতের সার্বভৌমিকতা, সংহতি ও শৃংখলা রক্ষার জন্যেও সমবেত হবার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনের ফলে এই শেষোক্ত বাধানিষেধগুলি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। রাষ্ট্র জনশৃংখলা ও সদাচার এবং ভারতের সার্বভৌমিকতা ও অখণ্ডতার স্বার্থে সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ভারতের সর্বত্র চলাফেরা ও বসবাসের অধিকারকে জনস্বার্থ, তপশিলি উপজাতিদের স্বার্থ এবং জনশৃংখলা রক্ষার স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৃত্তি বা উপজীবিকা গ্রহণ এবং ব্যবসাবাণিজ্য চালানোর অধিকারের ওপর জনস্বার্থে বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। যেমন, কোনো বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনের জন্য কি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা দরকার সেটি রাষ্ট্র স্থির করে দিতে পারে। জনস্বার্থে সেটি করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। আবার জনস্বার্থে কোনো বিশেষ শিল্প বা বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার নাগরিককে না দিয়ে রাষ্ট্র সোজাসুজিভাবে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। আবার এই ধরনের কোনো শিল্প বা বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থার হাতেও অর্পণ করা যায়।

২০, ২১ এবং ২২ নং ধারায় বিশ্লেষণ ঃ

সংবিধানের ২০ নম্বর ধারায় অপরাধীর দণ্ডবিধানের ব্যাপারে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা

হয়েছে। ২০(১) ধারা অনুযায়ী কোনো কাজ প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য অপরাধজনক বলে বিবেচিত না হলে সেই কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যাবে না আবার যে সময়কার অপরাধ সেই সময়ের প্রচলিত আইনে যে শাস্তি দেওয়া যেত তার থেকে বেশি শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া যাবে না। ২০(২) ধারা অনুযায়ী একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না। ২০(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারাটিতে বলা হয়েছে সে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতি (Procedure established by law) বলতে সেই পদ্ধতিকে বোঝায় যেটি আইনসভা বিধিসম্মতভাবে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে। যে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে সেই আইনটি বৈধ আইনসভার দ্বারা সংবিধান-সম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা সেটি বিচার করার অধিকার আদালতকে দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের আদালত কেবল এইটুকুই বিচার করতে পারে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কিনা। ন্যায়নীতির দিক থেকে আইনটি ভালো কি মন্দ আদালত সেটি বিচার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের ক্ষমতা অনেক বেশি। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী আইনটি বিধিসম্মতভাবে প্রণীত হয়েছে কিনা কেবলমাত্র সেইটি বিচার করে না। আইনটির ন্যায্যতাও (due process of law) আদালত বিচার করে।

২২ নম্বর ধারায় কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পর অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। আরোও বলা হয়েছে আটক ব্যক্তি তাঁর পছন্দমত আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে পারবেন। নিজের পছন্দ অনুযায়ী আইন ব্যবসায়ীর দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আটক ব্যক্তিকে দিতে হবে। ২২(২) ধারায় বলা হয়েছে যে আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া তাকে এই সময়ের বেশি আটক রাখা যাবে না। ২২(৩) ধারায় এই অধিকারের ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কোনো শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী বা নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণমূলক অধিকারের ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধ করতে পারে এই আশঙ্কার ভিত্তিতে যখন তাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয় তখন সেই আটককে নিবর্তনমূলক আটক বলে। নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৫০ সালে। প্রথমে এক বছরের জন্য আইনটিকে গ্রহণ করা হলেও ক্রমশ এর মেয়াদ বাড়িয়ে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আইনটিকে বজায় রাখা হয়। এর পর ১৯৭১ সালে প্রণীত হয় আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন বা 'মিসা'। ১৯৭৪ সালে পাশ হয় বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাই চালান নিবারণ আইন। এই আইনটি

'কোফেপোসা' নামে পরিচিত। ১৯৭৮ সালে জনতা ক্ষমতায় আসার পর 'মিসা' প্রত্যাহার করা হলেও 'কোফেপোসা' এখনও বজায় আছে। ১৯৮০ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসার পর'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' বা 'NSA' পাশ করা হয়। ১৯৮১ সালে প্রণীত হয় 'ESMA' বা 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন।' এই আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিকে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকারের মূল্যায়ন ঃ

ভারতীয় সংবিধানের স্বাধীনতার অধিকারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই অধিকারটি অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। ১৯ নম্বর ধারায় যে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বহু রকমের বাধানিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধগুলির যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কেবলমাত্র বাধানিষেধের পদ্ধতিগত দিকটিই বিচার করতে পারে। ন্যায়নীতির দিক থেকে বিধিনিষেধগুলি কতদূর বৈধ আদালত সেটি বিচার করতে পারে না। রাজনীতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেও কোনো দলীয় সরকার এই সাংবিধানিক বিধিনিষেধমূলক ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা যায় না।

তৃতীয়ত, স্বাধীনতার অধিকারকে সার্থক করে তোলার জন্য নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই অধিকার থাকা দরকার। ভারতের ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার অধিকারের সার্থক প্রয়োগ আশা করা যায় না।

১.৭.৩ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ঃ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রস্তাবনায় নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এইরকম সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের আদর্শকে রূপায়ণের সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে।

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারা ঃ

সংবিধানের ২৩ ধারায় মানুষ বেচাকেনা, বেগার খাটানো এবং বলপূর্বক পরিশ্রম করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। বলা হয়েছে যে এই নির্দেশ লঙঘন করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। ২৩(২) ধারায় বলা হয়েছে যে সার্বজনীন স্বার্থে রাষ্ট্র নাগরিকদের দিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারে। তবে

সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা শ্রেণীর ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

২৩ নম্বর ধারায় বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে আমাদের সংবিধানে 'মানুষ বেচাকেনা' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা যে কেবলমাত্র ক্রীতদাসত্ব নিষিদ্ধ হয়েছে তা নয়। নীতিবিরুদ্ধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নারী, শিশু বা পশু লোকদের কাজে লাগানোও নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পার্লামেন্ট Suppression of Traffic in Women and Girls Act পাস করেছে।

সংবিধানের ২৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে চোদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের কারখানা, খনিজ বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, এই উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট কতকগুলি আইন পাস করেছে।

মূল্যায়ন ঃ

এহ অধিকারটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে সমাজের বুক থেকে শোষণ দূর করতে হলে সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে শোষণের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনাকে বাস্তবে সার্থকভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়।

৬৯.৭.৪ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

পৃথিবীর সকল ধর্মই বিশ্বমানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ ঘোষণা করেছে। তবুও দেখা যায় যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম বিভিন্ন সময়ে মানুষে-মানুষে সংঘর্ষের একটি অন্যতম কারণ হয়ে আছে।

ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। এই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। এটি আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানপ্রণেতারা সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সংবিধানে এমন কোনো ব্যবস্থা সংযোজন করেন নি যার দরুন ভারতকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে ধর্মীয় বিবেচনা জড়িত থাকে না। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে রাষ্ট্র কোনো প্রশাসনিক বা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে না। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে

কোনো বিভেদমূলক আচরণ করে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে চলে। ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে একথা বোঝায় না যে আমরা জনগণের অনুভূতির কথা বিবেচনা করি না। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় যে পার্লামেন্ট বা সংসদ কোনো একটি বিশেষ ধর্মকে অপর সকল সম্প্রদায়ের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের মূল কথা এই যে ধর্ম হল মানুষের ব্যক্তিগত বিবেক এবং বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণ ও পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির সংযোজন ঃ

গণপরিষদে সংবিধান প্রণেতাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূল সংবিধানের কোনো অংশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির উল্লেখ করা হয় নি। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের ফলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে।

সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভারতের সংবিধানে স্বীকৃতি মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৫-২৮ নম্বর ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে।

২৫ নম্বর ধারায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। এই ধারায় ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোনো আচার-অনুষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পালনীয় নীতির অঙ্গ কিনা আদালত সেটি বিচার করতে পারবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ২৫ নম্বর ধারা নাগরিককে ধর্ম প্রচারের অধিকার দিলেও বলপ্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করার অধিকারকে স্বীকার করা হয় নি।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর সংবিধানে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধের কারণগুলি হল জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্য। আবার অন্যান্য মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যেও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত কোনো অর্থনৈতিক, বৈত্তিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা লোকায়ত কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের কাছে উন্মুক্ত রাখার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে।

ভারতীয় সংবিধান কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করে নি। সংবিধানে

বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কতকগুলি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারায় এই অধিকারগুলির উল্লেখ আছে। এই ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও পোষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ধর্মীয় বিষয়ে নিজ কার্যাদি পরিচালনার অধিকার থাকবে। এই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করার ও তার মালিক হবার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে তারা আইন অনুযায়ী এই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। তবে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির এই অধিকারের ওপর রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, সদাচার ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধানের ২৮ নম্বর ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বাধানিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত সেখানে কোনোরকম ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না। এই ধারাটিতে আরও বলা হয়েছে যে সরকারের দ্বারা স্বীকৃত বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত আরও বলা হয়েছে যে সরকারের দ্বারা স্বীকৃত বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষার্থীদের সম্মতি নিতে হবে। শিক্ষার্থী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তবে তার অভিভাবকের সম্মতি নিতে হবে।

মূল্যায়ন ঃ

সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে সংবিধানবিদ ডঃ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন যে ভারতের সাধারণ মানুষের গোটা জীবনে ধর্মের কী ভূমিকা সে সম্বন্ধে যাদের কোনোরকম ধারণা আছে তাদের কাছে এই অধিকারের ঘোষণা বিস্ময়কর ও প্রগতিশীল বলে মনে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্যই ঘোষিত হয়নি। বিদেশীসহ সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এই অধিকারটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র যাতে কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সংবিধানে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত, সংবিধানের ১৫(১) ধারায় কেবলমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভেদমূলক আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৫(২) ধারা অনুযায়ী সর্বসাধারণের ব্যবহার্য এবং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত স্থানগুলিতে প্রবেশের ব্যাপারে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবে না। ১৬(২) ধারা অনুযায়ী ধর্মের ভিত্তিতে কোনো নাগরিক সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হয়েছে। ২৯(২) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে ধর্মের ভিত্তিতে বিভেদকরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ৩২৫ ধারা অনুযায়ী ভোটাধিকারের ক্ষেত্রেও ধর্মের ভিত্তিতে

বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য সংবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র এই সম্প্রদায়ের ওপর তার নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোনো সংস্কৃতি আরোপ করবে না। সংবিধানের ৩০ ধারা অনুসারে এই ধর্ম সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে রাষ্ট্র এদের প্রতি কোনোরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি যে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অধ্যাপক জোহারি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ উদারনীতিক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। ভারতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু সংবিধান সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি সমানভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি একটি নিয়ন্ত্রিত ধারণা। জনশৃংখলা, সদাচার এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা হলো একটি গতিশীল ধারণা। বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্মীয় রীতি লঙঘন করেও আইনপ্রণয়ন করতে পারে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের বাস্তবায়ন কেবলমাত্র আইনগত এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে না। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও দেখা যায় যে সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সমন্বয়ের আদর্শই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা। এর ওপরেই সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারভোগ নির্ভর করে। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ভারতের সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। আবার ইদানীংকালে খ্রিস্টান মিশনারীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনাও ভারতের সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী মনোভাব অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে বিপর্যস্ত করে। এই কারণে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। সর্বোপরি ধর্মকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টার ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু কোনও গোষ্ঠীর মধ্যেই যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে সরকার বা রাষ্ট্র কারও পক্ষে শোষণমূলক মনোভাব নিয়ে চলেছে। বিশ্বমানবতাবোধ সকল ধর্মের মূল কথা—একমাত্র এই উপলব্ধিই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সার্থক করে তুলতে পারে। মানুষের মনের এই উদারতা ও ব্যাপ্তির

জন্যে সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানুষ তৈরির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

৬৯.৭.৫ সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার ঃ

ভারতবর্ষ এক বৈচিত্রপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৯ ও ৩০ নং ধারায় বিশ্লেষণ ঃ

সংবিধানের ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের ভূখণ্ডে বসবাসকারী নাগরিকদের যে কোনো অংশ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে। ২৯(২) ধারা অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, বংশ, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে।

৩০(১) ধারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দিয়েছে। ৩০(২) ধারা অনুসারে সরকারি আর্থিক সাহায্যে দানের ব্যাপারে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানে ৩০(১) (ক) অনুচ্ছেদটি যুক্ত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র যদি কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তাহলে অধিগ্রহণের আইনে এমন ব্যবস্থা থাকবে যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়।

মূল্যায়ন ঃ

ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। বিভিন্ন ভাষাগত ও ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষার মাধ্যমেই ভারতের সাংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও কৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই সংবিধানপ্রণেতারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারকে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই অধিকারটির স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। গণতন্ত্র বলতে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠকেই বোঝায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব পোষণ করে। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত বিকাশের অধিকারি মর্যাদা সহকারে স্বীকৃত হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাতীয় সংহতির পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

৬৯.৭.৬ শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

কোনো দেশের সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করলেই সেগুলি সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অধিকারগুলি প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। অধ্যাপক পাইলি যথার্থই বলেছেন যে অধিকার বলবৎ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান বলতে কী বোঝায়?

ভারতের সংবিধান প্রণেতারা এ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সংবিধানে কেবল মৌলিক অধিকারগুলিকেই লিপিবদ্ধ করেন নি। এই মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্যও তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অধিকারটি হল ভারতীয় নাগরিকদের একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র যদি বে-আইনিভাবে নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তবে নাগরিক কি কি প্রতিকার পেতে পারে এই অধিকারটিতে তার উল্লেখ বলা হয়।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২-৩৪ নম্বর ধারায় শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। ৩২ নম্বর ধারার চারটি অনুচ্ছেদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩২ নং ধারার বিশ্লেষণ ঃ

৩২(১) ধারায় বলা হয়েছে যে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে প্রতিকারের জন্য সে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবে।

৩২(২) ধারা নাগরিকের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। সুপ্রিম কোর্ট এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। সংবিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট যে লেখ-গুলি জারি করতে পারে সেগুলি হলো বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা এবং উৎপ্রেষণ।

আদালতের হাতে ন্যস্ত নির্দেশ বা লেখ সমূহের ব্যাখ্যা ঃ

বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ জারির মাধ্যমে আদালত বে-আইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেবার জন্য আটককারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারে।

'পরমাদেশ' জারি করার মাধ্যমে আদালত কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে তার আইনানুগ কর্তব্যপালনের নির্দেশ দিতে পারে।

'প্রতিষেধ' হলো একটি লেখ যেটি উর্ধ্বতন আদালত কোনো নিম্নতন আদালতের ওপর জারি করতে পারে। এই লেখ জারি করার উদ্দেশ্য হলো নিম্নতর আদালতকে নিজ সীমার মধ্যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া।

'অধিকার পৃচ্ছা' লেখটি সেই ব্যক্তির ওপর জারি করা হয় যিনি কোনো সরকারি পদে আইন সঙ্গত ভাবে নিযুক্ত না হয়েও সেই পদটি দাবি করেন। তিনি কোন্ অধিকারে পদটি দাবি করছেন এবং তাঁর দাবি বৈধ কিনা সেটি নির্ণয় করার জন্যই এই লেখটি জারি করা হয়।

'উৎপ্রেষণ' লেখটি কোনো নিম্ন আদালত, বিচারকার্যে নিযুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান এবং কোনো পৌর প্রতিষ্ঠানের ওপর জারি করা যায়। কোনো নিম্ন আদালত বা বিচারকার্যের ক্ষমতা যুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান নিজ ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই লেখ জারি করে সেই ক্ষমতা বহির্ভূত সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় এবং নিম্নতন আদালত থেকে কোনো মামলা উর্ধ্বতন আদালতে তুলে নেওয়া যায়।

৩২ নম্বর ধারার - তৃতীয় অনুচ্ছেদটিতে পার্লামেন্টকে একটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেটি হল এই যে পার্লামেন্ট আইন তৈরি করে সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্য যে কোনো আদালতকে নিজ এলাকার মধ্যে এই নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারি করার ক্ষমতা দিতে পারে।

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে এই অধিকারটি অকার্যকর থাকবে সেটি ৩২ নম্বর ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২ নম্বর ধারা সম্পর্কে অধ্যাপক পাইলি মন্তব্য করেছেন যে ৩২ নম্বর ধারার প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদ আমাদের মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রকৃত অধিকারে পরিণত করেছে। ৩২ নম্বর ধারার গুরুত্ব সম্পর্কে ডঃ আম্বেদকরের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি এই ধারাটিকে সংবিধানের আত্মরক্ষা এবং হৃদয় স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।

সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টগুলিরও এই সকল লেখ জারি করার অধিকার আছে কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যেই নয়, অন্যান্য উদ্দেশ্যেও হাইকোর্টগুলি এই সকল লেখ জারি করার ক্ষমতার অধিকারী। তবে হাইকোর্টের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার মত ব্যাপক নয়। সুপ্রিম কোর্টের লেখ জারি করার ক্ষমতা সমগ্র ভারত ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। অপরদিকে হাইকোর্টের এই ক্ষমতা তার এক্তিয়ারের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৩৩ নং ধারা ঃ

সংবিধানেব ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনীর সদস্যরা শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের

অধিকার কতখানি ভোগ করতে পারবেন সেটি পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেবে ১৯৮৫ সালের ৫০ তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে ৩৩ নম্বর ধারার এই বিধান সরকারি সম্পত্তির রক্ষিবাহিনীর সদস্য, গোয়েন্দা বিভাগ ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩৪ নং ধারা ঃ

৩৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে যখন কোনো অঞ্চলে সামরিক আইন বলবৎ থাকে তখন কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোনো কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যদি সেই অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো অবৈধ কাজ করে তবে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে সেই কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে। এই আইন দন্ডনিষ্কৃতি আইন বলে পরিচিত।

অধিকারটির সীমাবদ্ধতা ঃ

স্বাভাবিক অবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি কার্যকর হলেও জরুরী অবস্থায় এই অধিকারটির ওপর সংবিধানে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ৩৫৮ ধারা অনুযায়ী আপৎকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করে অথবা শাসনবিভাগ আইন জারী করে ১৯ নম্বর ধারায় নাগরিকদের অধিকারগুলি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে পারে। ৩৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে জরুরী অবস্থায় ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকারটি স্থগিত রাখতে পারেন। অর্থাৎ সেই সময়ে নাগরিক মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আদালতে আবেদন করতে পারেন না। জরুরী অবস্থার সময়েও কোনো আদেশ জারি করে ২০ এবং ২১ নম্বর ধারায় উল্লিখিত জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা যাবে না।

মূল্যায়ন ঃ

সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার নাগরিকদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটির উপর নাগরিকদের অন্যান্য অধিকারগুলি ভোগের নিশ্চয়তা নির্ভর করে। কিন্তু এই অধিকারটির ওপর বিভিন্ন রকম বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে বাস্তবে এই অধিকারটির গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

প্রথমত, জরুরী অবস্থার সময়ে এই অধিকারটি বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ে একদিকে যেমন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, অপরদিকে তেমনই মৌলিক অধিকার রক্ষা করলে আদালতের ক্ষমতাও সীমিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ভারতে কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়ে নয়, শান্তির সময়েও বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখ স্থগিত রাখা হয়। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে যুদ্ধের সময়ে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ লেখকে স্থগিত রাখা গেলেও স্বাভাবিক অবস্থায় সেটি করা যায় না।

তবে সংবিধান রচনাকালীন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকারটির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীনতার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ভারতে এমন অনেক বিভেদকামী শক্তি কাজ করে চলেছে যেগুলি দেশের শান্তি, ঐক্য ও সংহতির পক্ষে অন্তরায়। এই বিভেদকামী শক্তিগুলির মোকাবিলা করার জন্য শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটির উপর বিধিনিষেধ আরোপের যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থরক্ষার মধ্যে সাংবিধান প্রণেতারা দ্বিতীয়টির ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির কতকগুলি হলো মূলতঃ আইনসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক নির্দেশ। ৪৪ ধারা অনুযায়ী সমগ্র ভারতে একই দেওয়ানি বিধি বলবৎ করার জন্যে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। ৫০ ধারায় সরকারি কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের কথা বলা হয়েছে। ৪০ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠন এবং স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলিকে উপযুক্ত ক্ষমতা অর্পণের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সংবিধানের ৪৫ ধারায় সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে বালকবালিকাদের চোদ্দ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। ৪৬ ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের জন্যে বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের আর্থিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত স্বার্থের উন্নতির জন্যে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে। সংবিধানের ৪৯ ধারা অনুযায়ী চারুকলা ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্মারকস্থান ও বস্তুসমূহ সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য।

এই নীতিগুলি ছাড়াও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে কতকগুলি প্রগতিশীল নীতি রচিত হয়েছে। সংবিধানের ৪৭ ধারায় ঔষধ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মদ্ বা মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৪৮ নম্বর ধারায় আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি ও পশুপালনের ব্যবস্থার এবং গবাদি পশুহত্যা নিবারণের নির্দেশ রয়েছে। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে ৪৮ (ক) ধারাটি যুক্ত হয়েছে। এই ধারাটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ৫১ ধারাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক আইন ও সন্ধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে।

সমালোচনা ঃ

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে এই নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। সেই কারণে অনেক সমালোচক এই নীতিগুলিকে সংবিধান প্রণেতাদের 'সাধু ইচ্ছা' বলে বর্ণনা করেছেন। সমালোচকদের অনেকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই নীতিগুলি রূপায়ণের বাস্তব

সময়সীমা না থাকায় নীতিগুলি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এই নীতিগুলিকে সংবিধানে ঘোষণা করা হলেও এগুলি কার্যকর করার জন্যে কোনো ব্যবস্থার কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি। নির্দেশমূলক নীতির সমালোচনায় আরও বলা হয় যে নীতিগুলো সংখ্যায় অনেক বেশি এবং অনেকগুলি নীতিই অস্পষ্ট এবং পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট।

নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ের পরিপূরক বলা যেতে পারে। আমরা জানি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যে মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলির মাধ্যমে নাগরিক জীবনে পূর্ণ অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সামাজিক এবং আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে ভারতে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিশ্রুতি বলে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই হলো নির্দেশমূলক নীতিগুলির লক্ষ্য। সেই দিক থেকে বিচার করলে নীতিগুলির গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায়।

তৃতীয়ত, স্যার বি.এন.রাও বলেন যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নৈতিক নির্দেশ হিসাবে নির্দেশমূলক নীতিগুলির শিক্ষাগত মূল্য আছে। এই নীতিগুলি শাসকগোষ্ঠীকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির আদর্শগত মূল্যও অপরিসীম। জাতির জীবনে অনুসরণযোগ্য আদর্শ তুলে ধরার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় কতকগুলি উচ্চ আদর্শের ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

পঞ্চমত, নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও এই নীতিগুলির রাজনীতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। এই নীতিগুলি দেশ শাসনের ব্যাপারে অপরিহার্য বলে ঘোষিত হয়েছে। ডঃ আম্বেদকরের মতে, কোনো সরকার এই নীতিগুলিকে অবহেলা করলে তাকে নির্বাচনের সময় অবশ্যই নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সেই কারণে ডঃ দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন যে এই নীতিগুলির পিছনে যে শাস্তি নিহিত আছে সেটি রাজনীতিক।

ষষ্ঠত, নির্দেশমূলক নীতি রূপায়ণে সরকার উদাসীন হলে বিরোধী দল সেদিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই পরিস্থিতিতে জনমত সরকারের প্রতিকূলে যাবে। ডঃ দুর্গাদাস বসু বলেছেন যে এই নীতিগুলি বিরোধী পক্ষের হাতে এক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে।

সপ্তমত, নির্দেশমূলক নীতিগুলির সাংবিধানিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে। সংবিধানের ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রের কর্তব্য হলো রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখা। নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংবিধানের অঙ্গ। সংবিধানের ৩৭ ধারা অনুযায়ী আইনপ্রণয়নে এই নীতিগুলি প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী এই নীতিগুলি রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্র যে-কোনো রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে। রাজ্য সরকার এই নির্দেশ পালনে অস্বীকার করলে সংবিধানের ৩৬৫ ধারা অনুসারে কেন্দ্র সেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

অষ্টমত, অধ্যাপক পাইলির (M. V. Pylee) মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতের জনসাধারণের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই নীতিগুলি রূপায়ণের মাধ্যমেই ভারত একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে জমিদারী অধিগ্রহণ, গ্রামপঞ্চায়েত এবং সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, বেকার ভাতার ব্যবস্থা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার প্রচলন, শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। নির্দেশমূলক নীতিসমূহের রূপায়ণের ব্যাপারে সরকারের বলিষ্ঠ মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে এই নীতিগুলি রূপায়ণের জন্যে একাধিকবার সংবিধানকে সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তদশ, পঁচিশতম এবং ৪২তম সংবিধান সংশোধনে দেখা যায় যে নির্দেশমূলক নীতি রূপায়ণের উদ্দেশ্যই এই সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

নবমত, নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও আদালতেও এই নীতিগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২), কেরালা শিক্ষা বিল (১৯৫৮) প্রভৃতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যায়।

দশমত, আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলেও এই নীতিগুলির বিশেষ তাৎপর্য আছে। নীতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় যে উনিশ শতকের প্রচলিত 'পুলিশী রাষ্ট্রে'র ধারণা অনুযায়ী ভারতের সংবিধাপ্রণেতারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন নি। ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে তাঁরা রাষ্ট্রের কতকগুলি ইতিবাচক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে সেই ইতিবাচক কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই নির্দেশগুলি পালনের মধ্যে দিয়েই ভারত একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। সুতরাং

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির বিশেষ সাংবিধানিক গুরুত্ব আছে।

নির্দেশমূলক নীতিগুলির রূপায়ণ ঃ

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংযোজিত নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। এই নীতিগুলিকে কার্যকর করা সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তবে নির্দেশমূলক নীতিগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো জনকল্যাণ সাধন করা। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি এই নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সংবিধানের ৩৮ ও ৩৯ ধারার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশমূলক নীতির লক্ষ্য হলো সমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং জনস্বার্থে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ। এই উদ্দেশ্যে যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে প্রথমেই জমিদারী অধিগ্রহণের কথা উল্লেখ করা যায়। আবার ভূমি সংস্কার সাধন এবং কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ, রাজন্যভাতার বিলোপ প্রভৃতি হলো এ বিষয়ে কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 'বিশদফা কর্মসূচী' এবং তারপরে 'জওহর রোজগার প্রকল্প', 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী' প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহের অন্যতম লক্ষ্য হলো আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

সংবিধানের ৪০, ৪৪ এবং ৫০ ধারায় শাসনকাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কে কতকগুলি নীতির উল্লেখ রয়েছে। ৪০ ধারায় নির্দেশ অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতিটিকে কার্যকর করার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ৪৪ ধারা অনুসারে সমগ্র ভারতে একই ধরনের দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৫৫ সালের হিন্দু-বিবাহ আইন এবং ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। ৫০ ধারার নির্দেশ অনুসারে সকল রাজ্যে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪১ অনুসারে জনগণকে বেকার ও বার্ধক্যভাতা দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক-কল্যাণ সাধনের জন্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সরকারি বীমা পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যায়। মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনেক শিল্পে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর সামগ্রিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে ফাক্টরি আইন, বোনাস আইন, সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের জন্যেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবিধানের ৪৩ ধারা অনুসারে রাষ্ট্র গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। এই উদ্দেশ্যে

যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বভারতীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড, সর্বভারতীয় হস্তচালিত তাঁত বোর্ড, ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড প্রভৃতি সংস্থা স্থাপনের কথা উল্লেখ করা যায়।

৪৫ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী বহু রাজ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখযোগ্য। এখানে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ৪৬ ধারা অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ বিশেষত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের আর্থনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক স্বার্থের উন্নতির জন্যে শিক্ষাগত অনুদান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ, চাকরিতে সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৪৮ ধারার নির্দেশ অনুসারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য ও পশুপালনের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যুরো, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপিত হয়েচে। ৪৭ ধারা অনুযায়ী অনেক রাজ্যে মদের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে ৪৯ ধারায় চারুকলা ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্মারক স্থান ও বস্তু সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারেও বিভিন্ন রাজ্যের উদ্যোগী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় সংবিধানের ৫১ ধারার নির্দেশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী রক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে ভারত যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

৬৯.১০ সারাংশ

প্রস্তাবনা হল সংবিধানের ভূমিকা। প্রস্তাবনাটি পড়ে আমরা মূল সংবিধানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে একটি আভাস পাই। তবে প্রস্তাবনার আইনগত মূল্য নেই। প্রস্তাবনা সংবিধানকে বুঝতে সাহায্য করলেও মূল সংবিধানের সুস্পষ্ট অর্থের কোনো পরিবর্তন করতে পারে না। আদালত সংবিধানের কার্যকরী অংশকেই প্রাধান্য দেয়। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'আমরা ভারতের জনগণ' শব্দগুলির মধ্যে সংবিধানের উৎসটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'সংহতি' শব্দগুলি সংযোজিত হয়েছে। প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারত একটি সার্বভৌম দেশ। কারণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই ভারত স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূল নীতি ভারতে গৃহীত না হলেও ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ভারতে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। ভারত রাষ্ট্র কোনো বিশেষ

ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতের নাগরিকরা প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। ভারতে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ভারত একটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতে সর্বোচ্চ পদাধিকারী রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। ভারতে রাজা বা রানীর অস্তিত্ব নেই। সকল নাগরিকেরই নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হবার অধিকার আছে। প্রস্তাবনায় ভারতরাষ্ট্রের চারটি মূল নীতি বা আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। প্রস্তাবনায় ঘোষিত আদর্শ সমূহের সার্থক রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত আর্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার।

অধিকার হলো মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপযোগী কিছু সুযোগসুবিধা। মানুষের জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য অধিকারগুলি হল মৌলিক অধিকার। ভারতের সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় সাম্যের অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ভারতের ভূখণ্ডের ভেতরে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সমতা বা আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না। ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ ইত্যাদির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এই ধারার ব্যতিক্রম হল নারী, শিশু, সামাজিক ও আর্থনীতিক দিক থেকে অনুন্নত শ্রেণী এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিসমূহ। এদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। ১৬ নম্বর ধারায় সরকারি চাকরির অধীনে নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তবে এই অধিকারের ব্যতিক্রম এই যে পার্লামেন্ট কোনো রাজ্যের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে ঐ রাজ্যে বসবাসগত যোগ্যতা আরোপ করতে পারে। তাছাড়া অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আবার কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি বা পদকে সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা যায়। সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতা আচরণ নিষিদ্ধ হয়েছে। ১৮ নম্বর ধারায় কৃত্রিম বিভেদমূলক উপাধি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত সাম্যের অধিকার হল মূলত একটি রাজনীতিক ও আইনগত অধিকার। আর্থনীতিক সাম্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নি। তাছাড়া যথার্থ সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন।

ভারতীয় সংবিধান স্বাধীনতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সংবিধানের ১৯-২২ ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। মূল সংবিধানে ১৯ নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতটি অধিকার। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের পর সাতটির জায়গায় ছ'টি অধিকার আছে। এই অধিকারগুলি হল বাক্য ও মতপ্রকাশের অধিকার, শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকার, সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার, ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, ভারতের ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে বসবাসের অধিকার এবং যে-কোনো বৃত্তি অবলম্বনের অধিকার। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অধিকারগুলির বিশেষ মূল্য আছে। তবে ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপের কথা বলা হয়েছে। বাধা নিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা আদালত

সেটি বিচার করতে পারে। ২০ নম্বর ধারায় অপরাধীর দণ্ডবিধানের ব্যাপারে কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২২ ধারায় গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। আদালত স্বাধীনতার অধিকারের ওপর বাধানিষেধের পদ্ধতিগত দিকটি বিচার করতে পারলেও ন্যায়নীতির দিক থেকে বিধিনিষেধগুলি কতদূর বৈধ সেটি বিচার করতে পারে না। ভারতের ধনবৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় স্বাধীনতার আধিকারের সার্থক প্রয়োগ আশা করা যায় না।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক রূপায়ণ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজের বুক থেকে শোষণের অবসান দরকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ২৩ ধারায় মানুষ বেচাকেনা, বেগার খাটানো এবং বলপূর্বক পরিশ্রম করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। ২৪ ধারা অনুযায়ী চোদ্দ বছরের কম বয়সী শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের জন্য সমাজে আর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতাবোধ ধর্মের মূল নীতি হলেও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বিভেদের ঘটনা বিরল নয়। ভারতেও স্বাধীনতার প্রাক্কালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই ভারতকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি প্রস্তাবনায় স্থান পেয়েছে। সংবিধানের ২৫-২৮ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ আছে। ২৫ ধারায় ব্যক্তিকে বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবাধ নয়। ২৬ ধারায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও কতকগুলি অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো বিশেষ ধর্মের প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোনো ব্যক্তিকে করপ্রদানে বাধ্য করা যাবে না। ২৮ নম্বর ধারায় সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যকরণ নিষিদ্ধ করেও সংবিধানের অন্যান্য কয়েকটি ধারায় কতকগুলি ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সার্থক করে তোলার জন্যে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে ওঠা দরকার।

ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির

অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সংবিধানের ২৯ এবং ৩০ ধারায় অধিকারটির উল্লেখ আছে। ২৯ ধারায় ভারতের নাগরিকদের যে কোনো অংশকে নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩০ ধারায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চরিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি সংযোজিত হয়েছে। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে মৌলিক আধারগুলি বলবৎ করার জন্যে নাগরিক সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে। মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রমুখ আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারী করতে পারে। ২২৬ ধারায় হাইকোর্টগুলিকেও এই লেখ জারী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি স্থগিত থাকে। তবে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে জরুরী অবস্থাতেও ২০ এবং ২১ ধারার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা যায় না। সংবিধানের ৩৩ ধারায় বলা হয়েছে যে জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনীর সদস্যরা এই অধিকার কতটা ভোগ করবেন সেটি পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করবে। ৩৪ ধারায় দণ্ডনিষ্কৃতি আইনের কথা বলা হয়েছে। ৩৫৮ এবং ১৫৯ ধারায় অধিকারটির সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

মূল ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ ছিল না। ৪২তম সংবিধান সংশোধনে মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্তব্যগুলির মধ্যে সংবিধানকে মান্য করা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা করা, জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারিত করা, প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন, জাতীয় সম্পত্তির সংরক্ষণ প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। তবে এই কর্তব্যগুলি সংবিধানে নির্দেশমূলক নীতির অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং কর্তব্যগুলি পালন করা সম্পর্কে নাগরিকদের কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা নেই।

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৬-৫১ ধারায় রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশ মূলক নীতিসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে দেশ শাসন এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নীতগুলি মেনে চলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে নীতিগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তবে এই নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এগুলি উপেক্ষিত হয়েছে কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এজন্য ক্ষমতাসীন সরকার সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু নীতিগুলি মূল্যহীন নয়। রাজনীতিক, আর্থনীতিক, আইনগত, সাংবিধানিক এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে নীতিগুলির প্রভূত গুরুত্ব। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলি কার্যকর করার মাধ্যমেই ভারত একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন

রাজ্যসরকার নীতিগুলি রূপায়ণের ব্যাপারে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জমিদারী অধিগ্রহণ, ভূমিসংস্কার সাধন, কৃষিজমির ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ, ব্যাঙ্ক ও বীমা জাতীয়করণ, রাজন্যভাতার বিলোপ প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন, একই ধরনের দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের উদ্যোগী ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যায়। শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। কুটির শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৪ বছর পর্যন্ত বালক বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষাদান, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারেও যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৬৯.১১ অনুশীলনী

প্রস্তাবনা ঃ

রচনাত্মক উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। প্রস্তাবনা কাকে বলে? প্রস্তাবনার গুরুত্ব কি? ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে কি ধরনের রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে?

২। প্রস্তাবনার অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। প্রস্তাবনায় বর্ণিত ভারত রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলি বর্ণনা কর।

৩। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

সাম্যের অধিকার

৪। (ক) ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কি পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে?

(খ) প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের উৎস কী?

(গ) প্রস্তাবনা অনুযায়ী ভারত কি ধরনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র?

(ঘ) ভারতকে কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যায়?

(ঙ) ভারতকে কি সাধারণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়?

(চ) প্রস্তাবনায় ঘোষিত ভারত রাষ্ট্রের মূল নীতিগুলি কী কী?

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত সাম্যের অধিকারটির সমালোচনা মূলক বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

২। (ক) ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় সাম্যের অধিকারের উল্লেখ আছে?

(খ) ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

(গ) ১৬ নম্বর ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সমতার অধিকারের ব্যতিক্রমগুলি কী কী?

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপাধি প্রদান স্বীকৃতি হয়েছে?

স্বাধীনতার অধিকার

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

২। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত স্বাধীনতার অধিকারটি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় উল্লিখিত অধিকারগুলি কী কী?

২। কবে এবং কোন্ সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়?

<u>শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার</u> ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উপর একটি টীকা লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উল্লেখ আছে?

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

২। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে?

৩। কোন্ সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা এবং কবে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি প্রস্তাবনায় সংযোজিত হয়েছে?

৪। কোন্ কোন্ কারণে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারেরর ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে?

<u>শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার</u> ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারের উল্লেখ আছে?

২। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত ৩০(১) (ক) ধারায় কী বলা হয়েছে?

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকারটি ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্যে সুপ্রিম কোর্ট কি কি ধরনের নির্দেশনামা জারি করতে পারে?

কর্তব্য ঃ

(১) ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

<u>নির্দেশ মূলক নীতি</u> ঃ

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণনা কর।

২। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা

কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের মধ্যে যে কোনো চারটি নীতির উল্লেখ কর।

৬৯.১২ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Johari, J.C — Indian Govt and Politics, Vishal Publications. Delhi-Jalandhar.

(২) Kashyap, Subhas — Our Constitution, National Book Trust India, New Delhi.

(৩) Austin, Granville — The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation, Oxford University Press, London.

(৪) দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী।

(৫) নিমাই প্রামাণিক — ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।

একক ৭০ ❐ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগ

গঠন

৭০.০ উদ্দেশ্য

৭০.১ প্রস্তাবনা

৭০.২ ভারতের রাষ্ট্রপতি

৭০.২.১ ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

৭০.২.২ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি

৭০.২.৩ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

৭০.২.৪ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

৭০.২.৫ রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

৭০.৩ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

৭০.৪ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

৭০.৪.১ বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

৭০.৫ সারাংশ

৭০.৬ অনুশীলনী

৭০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭০.০ উদ্দেশ্য

একক ২ হলো ভারতের শাসন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা। স্বাধীন ভারতে কী ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে সে সম্পর্কে সংবিধান রচনার সময়ে গণপরিষদে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তাঁর নামে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। তাঁকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করতে হয়। শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত। এই এককটিতে রাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এককটিতে বিশদ আলোচনা আছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া এই এককটি পড়লে আমরা উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণালাভ করতে

পারবে। এককটিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার গঠন, কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। সর্বোপরি ভারতের প্রকৃত শাসকপ্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কেও এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৭০.১ প্রস্তাবনা

এই এককের উদ্দেশ্য হল আপনাকে ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এককটি পাঠ করলে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন।

- ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি, কার্যকাল, পদচ্যুতি, ক্ষমতা ও পদমর্যাদা এবং জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।
- ভারতের উপরাষ্ট্রপতির আলোচনা।
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা।

৭০.২ ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন।

৭০.২.১ ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবেন। ভারতের সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্টপতিও নির্বাচিত হন। তবে তিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতীয় সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ ধারায় এ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে প্রার্থী হতে হলে কতকগুলি যোগ্যতার দরকার। প্রথমত, প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁকে কমপক্ষে ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। তৃতীয়ত, তাঁকে লোকসভার সদস্য হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। চতুর্থত, তিনি কেন্দ্রীয় বা কোনো রাজ্য আইনসভার সদস্য হবেন না। পঞ্চমত, তিনি রাষ্ট্রের অধীনে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের জন্যে একটি বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সকল সদস্য এবং অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচিতমণ্ডলী

গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথমত, অঙ্গ রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হারে হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, ইউনিয়ন এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো প্রার্থীকে মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি পেতে হবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের জন্যে যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করা হয় সেটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিটি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্যে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

প্রথমত, প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সদস্যের ভোটসংখ্যা একটি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের মূল্য বিভিন্ন ধরনের হয়। এই মূল্য নির্ধারণের জন্যে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সেটি হল এই যে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায় সেটিই হবে সেই রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। মনে রাখতে হবে যে ১০০০ দিয়ে ভাগ করার সময়ে ভাগশেষ যদি ৫০০ বা তার বেশি হয় তবে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ। সেটি নির্ধারণের জন্যে সকল রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ভোটের মোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষ ভাজক সংখ্যার সমান বা তার বেশি হলে ভাগফলের সঙ্গে এক (১) যোগ করতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। ব্যালটপত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীর নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতারা সর্বাধিক পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে ১ সংখ্যাটি লিখবেন। এইভাবে পছন্দ অনুসারে তাঁরা বিভিন্ন প্রার্থীর নামের পাশে ২,৩,৪,৫ প্রভৃতি সংখ্যা বসাবেন। ভোটদাতাদের পক্ষে সবগুলি পছন্দ জানাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রথম পছন্দের ভোট না জানালে ব্যালটপত্র বাতিল হয়ে যাবে।

চতুর্থ পর্যায়টি হলো ভোট গণনা এবং কোটা নির্ধারণের পর্যায়। কোটা নির্ধারণের জন্যে সকল নির্বাচনপ্রার্থীর প্রথম পছন্দের বৈধ ভোটসংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলের সঙ্গে ১ যোগ করতে হয়। প্রথম গণনায় কোনো প্রার্থী এই কোটা অথবা তদূর্ধ্ব ভোট পেলে তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে।

কোটা-সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট কোনো প্রার্থী নাও পেতে পারেন। তখন যে প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যা সব থেকে কম তাঁকে বাদ দিতে হবে। এবার তাঁর ব্যালট পত্রের দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলিকে অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তরিত করতে হবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী নির্বাচিত না হন

ততক্ষণ পর্যন্ত ভোট হস্তান্তর চলতে থাকে।

সমালোচকদের মতে, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি অতিমাত্রায় জটিল। দ্বিতীয়ত, বলা হয় যে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার তুলনায় দলীয় রাজনীতিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন ছাড়া কোনো প্রার্থীর পক্ষে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হন। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের মতানুসারে কোনো রাজ্য বিধান সভা বাতিল থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

৭০.২.২ রাষ্ট্রপতির কার্যকাল ও পদচ্যুতি

ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছরের কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নতুন রাষ্ট্রপতি যতদিন কার্যভার গ্রহণ না করেন ততদিন পর্যন্ত পূর্বতন রাষ্ট্রপতি নিজ পদে বহাল থাকেন। কোনো রাষ্ট্রপতি পুনরায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম হল, কোনো ব্যক্তি মোট দুবার রাষ্ট্রপতির পদের জন্যে প্রার্থী হতে পারেন। ভারতের সংবিধানে এ সম্পর্কে বাঁধাধরা কোনো নিয়মের উল্লেখ নেই।

রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন। আবার পার্লামেন্ট সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে। পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে পারে। অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। যে কক্ষে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় সেই কক্ষে যতজন সদস্য থাকেন তাঁদের অন্তত এক চতুর্থাংশ সদস্য এই নোটিশটিতে স্বাক্ষর করবেন। এর পরে রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাবটি নিয়ে কক্ষটিতে আলাপ-আলোচনা চলে। প্রস্তাবটিতে যদি কক্ষের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মতি দেন তবে প্রস্তাবটিকে পার্লামেন্টের অপর কক্ষে পাঠানো হয়। অপর কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে। এই কক্ষের সদস্যদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে সমর্থন করেন তবে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন। রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতিটি ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির পদ্ধতির সমালোচনায় বলা হয় যে এই পদচ্যুতির ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের অংশগ্রহণের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টে যে সমস্ত সদস্য মনোনীত হন তাঁরা রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এঁদের কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি পদচ্যুত হবেন। কিন্তু সংবিধান লঙ্ঘন বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সংবিধানে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি।

৭০.২.৩ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

ভারতে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের শীর্ষে আছেন রাষ্ট্রপতি। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তবে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকপ্রধান। তাঁর নামে শাসন বিভাগীয় কার্যাদি সম্পাদিত হলেও বাস্তবে তিনি শাসন পরিচালনা করেন না। কার্যক্ষেত্রে শাসন পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ। এই মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর সংবিধানিক ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করেন।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগ করা যায়, যথা (ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (খ) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (ঘ) বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা এবং (ঙ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা।

(ক) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা - ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ধারায় কেন্দ্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সংসদ যে সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং যে সমস্ত বিষয়ে ভারত সরকার চুক্তি সম্পন্ন করার ক্ষমতা ভোগ করে সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের এক্তিয়ার প্রসারিত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে সেই সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন বা করতে পারেন।

সংবিধানের ৫৩(১) ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রের শাসন বিভাগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে সংবিধান অনুযায়ী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

সংবিধান অনুসারে ভারত সরকারে শাসন পরিচালনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। এ সম্পর্কে কোনো সংবাদ বা তথ্য রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলে তাঁকে সেটি জানাতে হয়। কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মন্ত্রী-পরিষদের বিবেচনার জন্য পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল তাঁরা নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা। তিনি প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন। এটর্নি জেনারেল, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কৃত্যক কমিশনের সদস্যগণ, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ, নির্বাচন কমিশনার, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল প্রমুখ উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা আছে। এগুলির মধ্যে নির্বাচন কমিশন, অর্থ কমিশন, আন্তঃরাজ্য কমিশন প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতার পাশাপাশি সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের অপসারণের ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি মন্ত্রী-পরিষদের যে কোনো সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। ভারতের এটর্নি জেনারেল এবং রাজ্যপালদের পদচ্যুতির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতির নির্দেশ অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের পদচ্যুত করতে পারেন। আবার সংসদের প্রস্তাব অনুসারে তিনি প্রধান ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি এবং নির্বাচন কমিশনার ও ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষককে অপসারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তাঁর সামরিক ক্ষমতা। তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ভারতের স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানদের তিনি নিয়োগ করেন। তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান। যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপন তিনিই করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর নেই। সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে কার্য পরিচালনা করতে হয়।

রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হল তাঁর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ক্ষমতা। ভারত সরকারের কূটনীতিক কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। তিনি ভারতীয় কূটনীতিক প্রতিনিধিদের বিদেশে প্রেরণ করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতদের পরিচয়পত্র তিনিই গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির নামে আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদিত হয়। তবে সেগুলি কার্যকর করার জন্য সংসদের অনুমোদন (ratification) প্রয়োজন হয়।

শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির কিছু তত্ত্বাবধায়ক ক্ষমতা আছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চলগুলির শাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি বা তাঁর মনোনীত কোনো শাসকের হাতে ন্যস্ত। তিনি তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে পারেন। অঙ্গরাজ্য সমূহের শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে।

(খ) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রীতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রপতির আইন-বিষয়ক ক্ষমতার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হলো সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত ক্ষমতা। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। তিনি সংসদের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি লোকসভার অধিবেশন ভেঙে দিতে পারেন।

সংসদ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হল ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণের ক্ষমতা। তিনি সংসদের যে কোনো কক্ষে বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি বর্ণনা

করেন। তিনি সংসদে আলোচ্য কোন সম্পর্কে বাণী প্রেরণ করতে পারেন। কোনো বিষয়ে সংসদের উভয় কক্ষের মতানৈক্যের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আইনসভায় সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা আছে। তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ১২ জন ব্যক্তিকে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মনোনীত করতে পারেন। আবার সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয়দের প্রতিনিধি উপযুক্ত সংখ্যক হয় নি বলে মনে হলে তিনি ঐ সম্প্রদায় থেকে দুজন সদস্য লোকসভায় মনোনয়ন করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল বিলে সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিলকে আইনে পরিণত করতে হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিলে তিনি সম্মতি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটিকে সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু সংসদ যদি পুনরায় বিলটি অনুমোদন করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন। অর্থবিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠানো যায় না। আবার সংবিধান সংশোধনী বিলে সম্মতি দেওয়া রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক।

রাজ্যের আইনসভার বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা আছে। অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় গৃহীত কোনো বিলকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। তিনি বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য রাজ্য আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। সেখানে বিলটি পুনরায় গৃহবীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে অস্বীকার করলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন অথবা রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয়। আবার অর্থবিল এবং রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো বিল রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন ছাড়া সংসদে পেশ করা যায় না।

সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অর্ডিনান্স বা অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা দিয়েছে। সংসদের অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রের আইন সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে অর্ডিনান্স বা জরুরি আইন জারি করতে পারেন। এই অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন পার্লমেন্টের আইনের মতই কার্যকর হয়। পার্লামেন্ট পুনরায় অধিবেশনে বসার তারিখ থেকে ছ'সপ্তাহ পর্যন্ত এই অর্ডিনান্স কার্যকর থাকে। পার্লামেন্ট অনুমোদন না করলে এই অর্ডিনান্স বাতিল হয়ে যায়। আবার রাষ্ট্রপতি নিজেও এটি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

কয়েকটি রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির বিশেষ কিছু ক্ষমতা আছে। গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এবং কমিশনের কিছু প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে সংসদে উপস্থাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, অর্থ কমিশন, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, তপশিলি জাতি ও উপজাতির জন্য নিযুক্ত বিশেষ কর্মচারীর প্রতিবেদন প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য।

(গ) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য সরকারের আয়-ব্যয়ের বিবরণী বা বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মারফত সংসদে ছাড়া কর বা ঋণসংক্রান্ত প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করা যায় না। সংবিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন গঠন করবেন। এই কমিশনের কাজ হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতির বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর ক্ষমা-প্রদর্শনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখা, হ্রাস করা বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

(ঙ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যথা (১) জরুরী বা আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা, (২) অঙ্গরাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা এবং (৩) আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা।

৭০.২.৪ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সংবিধানবিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো দেশে কী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ওপর সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের পদমর্যাদা অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি অনুসারে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা সংসদের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রী-পরিষদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। রাষ্ট্রপতি, রাজা বা রানীর নামে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হলেও তিনি বা তাঁরা কার্যক্ষেত্রে দেশের শাসন পরিচালনা করেন না। গণপরিষদে ডঃ আম্বেদকর মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শব্দটি ব্যবহৃত হলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা মার্কিন রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার অনুরূপ নয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর পদমর্যাদার সঙ্গে তুলনীয়। তিনি রাজত্ব করবেন, কিন্তু দেশ শাসন করবেন না। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, আল্লাদী কৃষ্ণ-স্বামী আয়ার, জওহরলাল নেহরু প্রমুখেরাও একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব শাসকে পরিণত করাই ছিল সংবিধান-প্রণেতাদের লক্ষ্য। কিন্তু মূল সংবিধানে তাঁদের এই মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় নি। স্বভাবতই রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা একটি বিতর্কিত বিষয়ে

পরিণত হয়েছিল। তাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী সংবিধানবিদদের মতে, রাষ্ট্রপতি কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান নন, তিনি শাসকপ্রধান।

প্রথমত, সংবিধানের ৫৩(১) ধারা কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ সংবিধান শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত করেছে, মন্ত্রীপরিষদের হাতে নয়। দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রী-পরিষদ থাকবে। কিন্তু মন্ত্রী-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক কিনা মূল সংবিধানে সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। আবার ৭৪(২) ধারা অনুসারে মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিনা এবং দিয়ে থাকলে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আদালত অনুসন্ধান করতে পারে না। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির স্বাধীনভাবে কাজ করবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

তৃতীয়ত, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর পদমর্যাদার সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। ইংল্যান্ডের রাজপদ হলো বংশানুক্রমিক। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কার্যকাল শেষ হবার আগেই তাঁকে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির দ্বারা অপসারণ করা যায়। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। ভারতে কিন্তু মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি নিজেই নিয়মকানুন নির্ধারণ করতে পারেন। ইংল্যান্ডে কোনো বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর ছাড়া রাজা বা রানীর কোনো কাজ আইনসম্মত বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতির কোনো কাজ আইনসম্মত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য কোনো মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর অপরিহার্য নয়।

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতিকে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলা চলে না। কারণ সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে কোনো মন্ত্রী বা মন্ত্রী-পরিষদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি কিছু জানতে চাইলে তাঁকে সেটি জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য।

পঞ্চমত, জরুরী আইন বা অর্ডিনান্স জারী করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী-পরিবদকে পরামর্শ করবেন সংবিধানে এমন কোনো নির্দেশ নেই।

ষষ্ঠত, সংসদ রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করতে পারলেও রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন মুলতুবি রাখা, লোকসভা ভেঙে দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে ইমপিচমেন্ট এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারেন।

অপরদিকে বাস্তববাদী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য সংবিধানের বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুনের সঙ্গে প্রচলিত রীতি-নীতিকে যুক্ত করে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার রীতি অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি হলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলো মন্ত্রীপরিষদ।

সংবিধানের ৭৪(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্য সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য (to aid and advise) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রী-পরিষদই লোকসভার কাছে দায়ী। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে সংবিধান শাসন পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার হাতেই ন্যস্ত করেছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। অপরদিকে রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। সুতরাং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির দিক থেকে বিচার করলে মন্ত্রী-পরিষদই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

তৃতীয়ত, লোকসভার আস্থাভাজন কোনো মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবেন। এই পদত্যাগকারী মন্ত্রীসভার প্রতি লোকসভার সমর্থন থাকায় রাষ্ট্রপতি যদি নতুন কোনো মন্ত্রীসভা গঠন করেন তবে সেটি লোকসভার আস্থাভাজন হতে পারবে না। অবশ্য রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে নিয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু এই নির্বাচনে পদত্যাগকারী মন্ত্রীসভা যদি পুনরায় জয়যুক্ত হয় তবে এ কথাই প্রমানিত হবে যে জনমত পদত্যাগকারী মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেছে। আবার এই মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এসে সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করতে উদ্যোগী হতে পারে।

চতুর্থত, সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা দেওয়া হলেও এই ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্রপতি কখনই একনায়কে পরিণত হতে পারেন না। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে মন্ত্রীসভার প্রস্তাবের লিখিত অনুলিপি ছাড়া রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন না।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি দেশের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেও তাঁর সামরিক ক্ষমতা সংসদের আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ষষ্ঠত, প্রশাসনিক নীতি ও কার্য পরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রী-পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। এর থেকে বোঝা যায় যে মন্ত্রী-পরিষদই হল প্রশাসনিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের বিচার বিভাগও রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। রামজাওয়া কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা (১৯৫৫), *শামসের সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা* (১৯৭৪) প্রভৃতিতে সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত প্রদান করেছে যে রাষ্ট্রপতি হলেন আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক শাসক। শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে যে বিতর্কের অবকাশ ছিল সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংশোধনের মাধ্যমে সেটির অবসান ঘটেছে। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য। ৪৪তম সংবিধান সংশোধনে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্যে ফেরত পাঠাতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রীসভা যদি আবার সেই একই পরামর্শ দ্বিতীয়বার প্রেরণ করে তবে রাষ্ট্রপতি সেই পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।

তবে ভারতের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিছক নামসর্বস্ব শাসক নন। জাতির প্রতীক হিসাবে তিনি মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দিতে পারেন, উৎসাহিত করতে পারেন এবং সতর্ক করে দিতে পারেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তাঁর বিশেষ কোনো ভূমিকা না থাকলেও বিশেষ কোনো রাজনীতিক পরিস্থিতিতে তাঁর পদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে কোনো রাজনীতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন করতে পারেন। আবার সেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা যদি কালক্রমে সংসদের আস্থা হারায় তখন বিকল্প মন্ত্রীসভা গঠন হবে অথবা নতুন সংসদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এ বিষয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকেই নিতে হয়। তাঁর সাংবিধানিক বিচার ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এই সবক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রশাসনিক সংকটের মুহূর্তে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদের সাংবিধানিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতের রাষ্ট্রপতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি মত প্রকৃত শাসক নয়। কিন্তু তিনি ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মত একেবারে ক্ষমতাহীন অলংকারিক শাসকপ্রধান নন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার অধিকার তাঁর আছে। তাঁকে ভারতের সংবিধানরক্ষার শপথ গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং দেশের শাসনকার্য যাতে সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় সেটি দেখা তাঁর দায়িত্ব।

৭০.২.৫ রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

দেশের অস্বাভাবিক বা সংকটজনক পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংবিধান রচয়িতারা ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে ৩৫২ থেকে ৩৬০ ধারার মধ্যে রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা আছে। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন, যথা (ক) আপৎকালীন জরুরী অবস্থা, (খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং (গ) আর্থিক জরুরী অবস্থা।

(ক) জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৫২ ধারায় জাতীয় অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারত বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে বা বিঘ্নিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' শব্দগুলির বদলে 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

সুতরাং বর্তমানে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিলে বা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকলে রাষ্ট্রপতি সারা ভারত বা ভারতের যে-কোনো অংশে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারেন। ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিবেচনা বা সন্তুষ্টির ওপর কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার লিখিত অনুলিপি ছাড়া রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন না।

জাতীয় জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের প্রত্যেক কক্ষের সদস্যদের অর্ধেক এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের দ্বারা এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে। এইভাবে অনুমোদিত হলে জরুরী অবস্থার ঘোষণা ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকে। সংসদের উভয়কক্ষে জরুরী অবস্থার ঘোষণা যদি আবার অনুমোদিত হয় তবে এই ঘোষণা আরও ছ'মাস বলবৎ থাকতে পারে। তবে জরুরী অবস্থার ঘোষণা শেষ অবধি কতদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে সে সম্পর্কে সংবিধানে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। সংবিধানের ৩৫২(২) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণার দ্বারা জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে পারেন। আবার লোকসভা যদি জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব পাশ করে তবে রাষ্ট্রপতিকে সেই প্রস্তাব অনুযায়ী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করতে হয়।

জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগগ শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিলে রাজ্য সেই নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে জরুরী অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টে থাকবে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ববণ্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

চতুর্থত, লোকসভার মেয়াদের উপরেও জরুরী অবস্থার প্রভাব লক্ষণীয়। জরুরী অবস্থায় লোকসভার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। আবার পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্যের বিধানসভার কার্যকালও একবছর পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

পঞ্চমত, জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকা কালে সংবিধানের ৩৫৮ এবং ৩৫৯ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি বিশেষ ঘোষণাবলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত রাখতে পারেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা বলে নাগরিকের আদালতে আবেদন করার অধিকারও অকার্যকর থাকে। সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে সংবিধানের ২০ ও ২১ ধারায় সংরক্ষিত নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা যাবে না। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষিত

হলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে অকার্যকর রাখা যাবে না।

(খ) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৫৬ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের কাছ থেকে অথবা অন্য কোনো সূত্রে রাষ্ট্রপতি যদি জানতে পারেন যে সেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে না তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ১৯৭৮ সালের সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বা সন্তুষ্টিই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে না। এ বিষয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের দুটি কক্ষে পৃথক ভাবে অনুমোদিত হতে হবে। দুইমাসের মধ্যে এই অনুমোদন হওয়া দরকার। নতুবা দুইমাস পরে এই ঘোষণা অকার্যকর হয়ে যাবে। পার্লামেন্টের অনুমোদন পেলে এই ঘোষণা প্রথমে ছ'মাস এবং পার্লামেন্ট অনুমোদন করলে এটি আরও ছ'মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে দেশে যদি জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকে অথবা যদি নির্বাচন কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করে যে রাজ্যের পরিস্থিতি নির্বাচনের অনুকূল নয় তবে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা এক বছরের বেশি বলবৎ থাকতে পারে। মূল সংবিধান অনুসারে এই ধরনের ঘোষণা বলবৎ থাকার সর্বাধিক সময় সীমা হলো তিন বছর। তবে ১৯৯১ সালে সংবিধানের ৫৮তম সংশোধনী আইনে পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ পাঁচ বছর করা হয়।

কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষিত হলে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করতে পারেন। আবার তিনি রাজ্যপাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন।

আবার কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হলে পার্লামেন্ট সেই রাজ্যের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে অথবা আইন করে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি আবার সেই আইন অনুযায়ী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত করতে পারেন।

রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বা স্থগিত রাখার জন্যে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করতে পারেন। তবে এই ঘোষণা দ্বারা রাজ্যের হাইকোর্ট বা মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতার কোনোরকম পরিবর্তন করা যায় না।

(গ) আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা ঃ সংবিধানের ৩৬০ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার ফলে ভারত বা তার কোনো অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হতে পারে তা হলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। সংবিধানের ৩৮তম সংশোধনী আইনে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়।

আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে দুমাসের মধ্যে অনুমোদিত না হলে ঘোষণাটি অকার্যকর হয়ে যাবে। পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হলে ঘোষণাটি অনির্দিষ্টকাল বলবৎ থাকতে পারে।

আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন ভাবে বলবৎ হয়।

আর্থিক জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকলে আর্থিক সমীচীনতার নীতি সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

সে সকল অর্থবিল রাজ্য আইনসভায় গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্যে সংরক্ষিত বাখার ব্যাপারে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

এই সময় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতির বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়।

মূল্যায়ন

ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাংবিধানিক ব্যবস্থা বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

প্রথমত, জাতীয় জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। এই ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখার সময়সীমা সম্পর্কে সংবিধানে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

চতুর্থত, মন্ত্রীসভার নির্দেশ অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষণার বর্তমান ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধির পথকে পরোক্ষভাবে প্রশস্ত করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

অনুরূপভাবে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার ঘোষণাও নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

প্রথমত, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যে শাসন এবং আইনবিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে এই ধরনের ব্যবস্থা অঙ্গারাজ্যগুলির স্বার্থের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, সংবিধান রচয়িতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজ্যের প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূর করার শেষ প্রতিকার হিসেবে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা দরকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে একাধিকবার রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেছে। সমালোচকদের মতে, রাজ্যে

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক।

অনুরূপভাবে বলা যায় যে আর্থিক অবস্থার ঘোষণা রাজ্যগুলির আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হতে পারে।

তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সাংবিধানিক ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় যে এই ব্যবস্থার বাস্তব উপযোগিতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের কার্যকারিতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এই অভিযোগও সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ রাষ্ট্রপতি এককভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্যে ক্যাবিনেটের লিখিত পরামর্শের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া জরুরী অবস্থা বেশি দল বলবৎ থাকে না। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কেও বলা যায় যে সমগ্র দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রশাসনিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে। রাজ্যগুলি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে স্বভাবতই কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আবার দেশে আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করার জন্যে আর্থিক জরুরী অবস্থার ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

৭০.৩ ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

ভারতীয় সংবিধানের ৬৩ নম্বর ধারায় উপরাষ্ট্রপতির পদের উল্লেখ আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতির মত উপরাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে।

উপরাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা ঃ

উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে। প্রথমত, তিনি ভারতীয় নাগরিক হবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর বয়স কমপক্ষে ৩৫ বছর হতে হবে। তৃতীয়ত, তিনি রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন। চতুর্থত, প্রার্থী হওয়ার সময় তিনি কোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।

কার্যকালের মেয়াদ এবং পদচ্যুতির পদ্ধতি ঃ

উপরাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন। আবার নির্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার আগেও পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পদচ্যুত হতে পারেন। রাজ্যসভার অধিকাংশ

সদস্য যদি উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সেই প্রস্তাব যদি লোকসভার দ্বারা সমর্থিত হয় তবে উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি হতে পারে। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। সাধারণত সংবিধানলঙ্ঘনের অভিযোগেই উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি হতে পারে। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে হলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয়।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ঃ

উপরাষ্ট্রপতিরর কোনো বিশেষ উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা নেই। তবে কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তাছাড়া উপরাষ্ট্রপতি হলেন পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। মর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতির একটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাগত বিচারে রাষ্ট্রপতির পরেই হল উপরাষ্ট্রপতির স্থান।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বা নামসর্বস্ব শাসক। প্রকৃত শাসন পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

৭০.৪ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

গঠন ঃ সংবিধানের ৭৪ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সাহায্য ও পরামর্শ (aid and advice) দেবার জন্যে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। লোকসভার অন্যান্য সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের যে কোনো একটি কক্ষের সদস্য হবেন। তবে পার্লামেন্টের সদস্য না হলেও কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা যায়। তবে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ছ'মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের কোনো কক্ষের সদস্য নিযুক্ত হতে না পারলে সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

দায়িত্বশীলতা ঃ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভা যদি কোনো একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তবে সেটি সমগ্র মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসাবে গণ্য হবে। এই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

সাধারণত মন্ত্রীসভায় (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং (৩) উপ-মন্ত্রী এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রীরা থাকেন। ক্যাবিনেটমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য। সরকারি নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মত রাষ্ট্রমন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সদস্য নয়। তাঁরা কোনো ক্যাবিনেট মন্ত্রীর অধীনেও থাকতে পারেন অথবা স্বাধীনভাবে কোনো দপ্তরেরর দায়িত্বভার পালন করতে পারেন। উপমন্ত্রীরা বিভাগীয় মন্ত্রীদের দপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করেন।

ক্যাবিনেট ঃ বর্তমানে যে কোনো দেশের সরকারের পক্ষে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আশু

সমাধান জরুরী বলে বিবেচিত হয়। সাধারণত মন্ত্রীসভায় অনেক মন্ত্রী থাকেন। তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়না। এই কারণে মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠন করেন। এই ক্ষুদ্র সংস্থাটিকেই ক্যাবিনেট বলা হয়। ক্যাবিনেটের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্যে ক্যাবিনেটের একটি কর্মদপ্তর থাকে।

ভারত সরকারের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে।

প্রথমত, প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটি অন্যতম দায়িত্ব। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব সংসদের হাতেই থাকা উচিত। তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতে সংসদই হল প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের কেন্দ্র। কিন্তু বাস্তবে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার করায়ত্ত হয়েছে। সাধারণত সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীসভা যে নীতি গ্রহণ করে সংসদে সেটি সহজেই অনুমোদিত হয়। আবার সরকারি নীতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ক্যাবিনেটই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। স্বরাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি প্রভৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভা আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আইনপ্রণয়নের মূল ক্ষমতা তত্ত্বগতভাবে সংসদের হাতেই ন্যস্ত। কিন্তু সংসদের সদস্যসংখ্যা অনেক। সীমিত সময়ের মধ্যে সংসদের বহুসংখ্যক সদস্যদের পক্ষে প্রতিটি বিলের খুঁটিনাটি বিচার করা সম্ভব হয় না। বিলের মূল নীতি ও কাঠামোটি পার্লামেন্ট স্থির করে দেয়। বিলের বিস্তারিত নিয়মনীতি নির্ধারণের দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর ন্যস্ত করা হয়। এই অর্পিত ক্ষমতাই আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার ক্ষমতাকে বিশেষ শক্তিশালী করেছে। এই অর্পিত ক্ষমতার ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা যে সমস্ত বিধিবিধান প্রণয়ন করে সেগুলিকে অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন বলে।

তৃতীয়ত, মন্ত্রীসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল প্রশাসনিক দায়িত্বপালন। ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে মন্ত্রীসভার উপর। মন্ত্রীরাই প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা করেন। এ ব্যাপারে সরকারের স্থায়ী কর্মচারীরা মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মন্ত্রীদের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থত, সরকারের আয়-ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। করধার্য, ব্যয়বরাদ্দ প্রভৃতি বিষয়ে মূলনীতি মন্ত্রীসভাই নির্ধারণ করে। আবার প্রত্যেক আর্থিক বছরের সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের খসড়া হিসাব বা বাজেট প্রস্তুত করার দায়িত্ব থাকে অর্থমন্ত্রীর উপর। অর্থমন্ত্রীর খসড়াবাজেট ক্যাবিনেটের দ্বারা অনুমোদিত হলে সেটি পার্লামেন্টে পেশ করা হয়।

পঞ্চমত, শাসন বিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৭০.৪.১ প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় সংবিধানের ৭৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলী সম্পাদনে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও বাস্তবে তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করেন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন শাসকপ্রধান।

সংবিধানের ৭৫ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন। সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু লোকসভায় যদি কোনো দলের একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে তবে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির স্ব-বিবেচনা প্রয়োগের অবকাশ থাকে।

সংসদের সদস্য নন এমন ব্যক্তিও প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হতে পারেন। তবে নিয়োগের ছ'মাসের মধ্যে তাঁকে সংসদের যে কোনো কক্ষের সদস্য হতে হয়। নতুবা তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস হল দুটি; (১) সাংবিধানিক ধারা এবং (২) শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতির নামে শাসন পরিচালিত হলেও কার্যক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। মন্ত্রীসভার পরামর্শ বলতে বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শকেই বোঝায়। কারণ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীসভার নেতা।

দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। আবার যদি রাষ্ট্রপতি নিজে প্রশাসন এবং আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনো সংবাদ জানতে চান তবে তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর, রাষ্ট্রপতি কোনো মন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমগ্র মন্ত্রীসভার বিবেচনার জন্যে পেশ করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। রাষ্ট্রপতির এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীই হলেন প্রকৃত শাসকপ্রধান।

তৃতীয়, মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীই হলেন মন্ত্রীসভার মূল ভিত্তি। মন্ত্রীসভার গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে

দপ্তর প্রভৃতি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর সমূহ বণ্টিত হয়। কোনো মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থত, মন্ত্রীসভার সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করলেও প্রধানমন্ত্রী সকল দপ্তরের কার্যাবলী তদারক করেন। বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নীতিগত বিরোধের মীমাংসা করা প্রধামন্ত্রীর দায়িত্ব।

পঞ্চমত, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুসারেই লোকসভার অধিবেশনের সময়কাল এবং কর্মসূচী নির্ধারিত হয়ে থাকে। তিনি লোকসভার কার্যপরিচালনাসংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য। সংসদে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের মুখপাত্র। সেই হিসাবে পার্লামেন্টে সরকারি নীতিসমূহ ব্যাখ্যার চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। বিতর্কের সময় কোনো মন্ত্রী প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাঁকে সাহায্য করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন।

ষষ্ঠত, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপরেই দলের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সরকার পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতা এবং দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণে তাঁর সাফল্যের উপরেই দলের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

সপ্তমত, জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জাতির নেতা হিসাবে তাঁর নেতৃত্বের সাফল্যের উপরেই তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাঁকে জনমতের গতি-প্রকৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হয় এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সংকটপূর্ণ সময়ে সমগ্র জাতি প্রধানমন্ত্রীর নিকটেই সমাধানের প্রত্যাশা করে।

৭০.৪.২ বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বেশ কয়েক বছর ভারতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেছেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতার দরুন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কার্যত প্রধানমন্ত্রী-শাসিত শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। ক্যাবিনেটের পরামর্শের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজস্ব আস্থাভাজন ব্যক্তি ও পদস্থ আমলাদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন। সরকারি নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তই প্রাধান্য অর্জন করে। শ্রীমতী গান্ধীর পরে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলেও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে একদলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। ক্রমে সময় ও রাজনীতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জোটবদ্ধ রাজনীতির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে একদলীয় প্রাধান্যের অবসান ঘটে। বহুদলভিত্তিক রাজনীতির প্রতিফলন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও দেখা যায়। এই পাঁচমেশালী মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন না। কারণ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রীসভার শরিক দলগুলির মতামতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। তবে প্রধানমন্ত্রী যদি উপযুক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন তবে তিনি তাঁর মতামতকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং জাতির নেতা হিসাবে শাসনব্যবস্থায় এক শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁর পক্ষে নিজেকে একনায়কে পরিণত করা কঠিন। বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বিভিন্ন দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রথমত, জননায়ক হিসাবে তিনি জনসভাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁকে বিরোধী দল ও গণমাধ্যমগুলির সমালোচনা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। তৃতীয়ত, দলের শক্তিশালী নেতাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করলে দলে ভাঙন ধরার সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থত, মন্ত্রীসভা গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তরবণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁকে আঞ্চলিক, ভাষাগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিনিধিত্বের কথা বিবেচনা করতে হয়। সর্বোপরি, ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী। মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদ তথা সমগ্র জাতির নিকট দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবিরোধী কোনো কাজ করা কঠিন।

৭০.৫ সারাংশ

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এই উদ্দেশ্যে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদস্য এবং রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা এই নির্বাচকমণ্ডলীতে থাকেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব যথাসম্ভব একই হারে হতে হবে। তাছাড়া ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ভোটের সমতা রক্ষা করতে হবে। রাষ্ট্রপতি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এর জন্যে প্রত্যেক রাজ্যের জনসংখ্যাকে সেই রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকে আবার ১০০০ দিয়ে ভাগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটি হলো সেই রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটসংখ্যা নির্ধারণের জন্যে রাজ্যবিধানসভার সদস্যদের মোট ভোট সংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে

ব্যালটপত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নামের তালিকা থাকে। ভোটদাতারা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী প্রার্থীদের নামের পাশে, ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতির সংখ্যা বসাবেন। প্রথম পছন্দ না জানালে ব্যালটপত্র বাতিল হয়। এবার সকল প্রার্থীর প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে 'কোটা' নির্ধারণ করা হয়। কোনো প্রার্থী কোটা-সংখ্যক বা তার বেশি ভোট পেলে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। যদি কোনো প্রার্থীই কোটা সংখ্যক ভোট না পান তবে সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোটের প্রার্থীকে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যালট পত্রের দ্বিতীয় পছন্দের ভোটগুলিকে অন্যান্য প্রার্থীদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং কোনো প্রার্থী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এই হস্তান্তরপর্ব চলতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতিটি খুবই জটিল। এতে দলীয় রাজনীতি বিশেষভাবে কাজ করে। কোনো বিধানসভা বাতিল থাকলেও রাষ্ট্রপতির নির্বাচন স্থগিত থাকে না। সমালোচকরা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের এই ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলি তিনি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করেন।

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলির মধ্যে প্রথমে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা যায়। সংবিধান কেন্দ্রের শাসনবিভাগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। তিনি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে সংবিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করবেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে তাঁর নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল ছাড়াও সরকারের বিশিষ্ট উচ্চপদাধিকারীগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংবিধান কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীকে অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছে। রাষ্ট্রপতির শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর সামরিক ক্ষমতা। তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত হলো তাঁর পররাষ্ট্রসংক্রান্ত ক্ষমতা। ভারত সরকারের কূটনীতিক কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়।

রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে দেখা হয়। তিনি সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি সংসদের যে কোনো কক্ষ বা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। সংসদের উচ্চ কক্ষে ১২ জন সদস্য তিনিই মনোনীত করতে পারেন। লোকসভায় দুজন ইঙ্গ-ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিল আইনে পরিণত হবার জন্যে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়। সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে তিনি অর্ডিন্যান্স বা অস্থায়ী জরুরী আইন জারী করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির অর্থিক ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আয়ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বা বাজেট সংসদে পেশ করা। সংসদে কোনো কর বা কর সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্যে বা অর্থবিল পেশ করার জন্যে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন, যথা, জাতীয় আপৎকালীন, রাজ্যগুলির সংবিধানিক বিপর্যয় এবং আর্থিক সংকটজনিত জরুরী অবস্থা।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা দীর্ঘকাল যাবৎ একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল। তাত্ত্বিক ধারণায় বিশ্বাসী সংবিধানবিদদের মতে, রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত শাসক। সংবিধান কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত করেছে। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্যে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকলেও মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মানতে তিনি বাধ্য কিনা মূল সংবিধানে সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর পদের মত বংশানুক্রমিক নয়। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারত সরকারের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি রাষ্ট্রপতিকে জানানো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। অপরদিকে বাস্তববাদী সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভাই হল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভাই লোকসভার কাছে দায়ী। মন্ত্রীসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভায় পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করবে। নবনিযুক্ত কোনো মন্ত্রীসভা সহজে লোকসভার আস্থা অর্জন করতে পারবে না। আবার নতুন নির্বাচন হলে যদি আগেকার মন্ত্রীসভার সদস্যরা জয়লাভ করে তবে বুঝতে হবে যে জনমত তাঁদেরই সমর্থন করেছে। এই মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এসে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের চেষ্টা করতে পারে। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের অবকাশ ছিল সংবিধানের ৪২তম এবং ৪৪তম সংশোধন পাশের পর তার অবসান ঘটেছে। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে বাধ্য।

তবে রাষ্ট্রপতি নিছক নামসর্বস্ব শাসক নয়। তিনি মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত ও সতর্ক করতে পারেন। লোকসভায় কোনো রাজনীতিক দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে রাষ্ট্রপতি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন করতে পারেন। জাতির প্রতীক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। প্রথমত, ৩৫২ ধারায় রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। এই ঘোষণা পার্লামেন্টের দ্বারা এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া দরকার। জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ত, ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই ঘোষণাটিও

পালামেন্টের দুটি কক্ষে দুইমাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া দরকার। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করতে পারেন অথবা রাজ্যপাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারেন। এই সময় পার্লামেন্ট রাজ্যের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে বা আইন করে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেবার বা স্থগিত রাখার জন্যে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করতে পারেন। ৩৬০ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। পার্লামেন্টের দ্বারা অনুমোদিত হলে ঘোষণাটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বলবৎ থাকতে পারে। আর্থিক জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়। তাছাড়া আর্থিক সমীচীনতার নীতি সম্পর্কে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

জরুরী অবস্থার সমালোচনায় বলা হয় যে এই ঘোষণার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এই ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক এবং রাজ্যগুলির স্বার্থের পরিপন্থী। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী এক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপরাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। তাঁর কয়েকটি যোগ্যতার কথা আবার পাঁচ বছর শেষ হবার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন বা পদচ্যুত হতে পারেন। তাঁর পদচ্যুতির প্রস্তাব রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত এবং লোকসভার দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্যে ১৪ দিনের নোটিশের প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে উপরাষ্ট্রপতি সেই দায়িত্ব পালন করেন। মর্যাদাগত বিচারে রাষ্ট্রপতির পরেই তাঁর স্থান। পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি হলেন রাজ্যসভার সভাপতি।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনের প্রকৃত দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। মন্ত্রীসভার মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি ক্ষুদ্র সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থাটি ক্যাবিনেট নামে পরিচিত। সাধারণ মন্ত্রীসভায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী—এই তিনশ্রেণীর মন্ত্রীরা থাকেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্যাবলীর মধ্যে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা, সরকারি আয়-ব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই সাধারণত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী একাধারে রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা এবং রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। আবার মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে মন্ত্রীসভার

গঠন, মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, কোনো মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁরই। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেকখানি দলীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। একদলীয় মন্ত্রীসভায় তিনি যে ক্ষমতা ভোগ করেন, পাঁচমেশালী দলের মন্ত্রীসভায় তাঁর ততটা ক্ষমতা থাকে না, বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা জনমত, বিরোধীদল ও গণমাধ্যমগুলির সমালোচনা, দলে শক্তিশালী প্রভাব, মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিজেকে একনায়কে পরিণত করা কঠিন। তবে বিচক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় বিশেষ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৭০.৬ অনুশীলনী

(ক) রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

২। ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিশ্লেষণ করুন।

৩। ভারতের সংবিধানে ৩৫২ এবং ৩৫৫ নম্বর ধারায় ঘোষিত জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি ও ফলাফল বর্ণনা করুন।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন? (২.২২ প্রথম অনুচ্ছেদ)

২। ভারতের রাষ্ট্রপতি কতবার নির্বাচিত হতে পারেন? (২.২২ প্রথম অনুচ্ছেদ)

৩। ভারতের রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে পদচ্যুত করা যায়? (২.২২ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

৪। (ক) ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে?

(খ) রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় কতজন সদস্য মনোনীত করতে পারেন?

(গ) রাষ্ট্রপতি কখন অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন?

৫। ভারতের রাষ্ট্রপতি কয় ধরনের জরুরী অবস্থা জারী করতে পারেন?

৬। কোন্ পরিস্থিতিতে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা যায়?

(ক) সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কীভাবে নির্বাচিত হন?

২। ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদে প্রার্থী পদে প্রার্থী হবার জন্যে কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার?

৩। ভারতের উপরাষ্ট্রপতিকে কীভাবে পদচ্যুত করা যায়?

(খ) রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায়?

২। মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য কী? (উত্তর-২.৪ চতুর্থ অনুচ্ছেদ)

(গ) রচনামুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ব্যাখ্যা কর।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন সময় ভারতে শাসনব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়?

১.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Johari, J. C., India Govt and Poliitics

(২) Subhas Kashyap, Our Constitution.

(৩) Austin Granville, The Indian Constitution Cornerstone of a Nation.

(৪) Sikri — Indian Govt and Politics

(৫) দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়।

(৬) নিমাই প্রামাণিক — ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা।

একক ৭১ ☐ ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগ

গঠন

৭১.০ উদ্দেশ্য

৭১.১ প্রস্তাবনা

৭১.২ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় ভূমিকা

৭১.৩ ভারতীয় সংসদের গঠন

৭১.৩.১ রাজ্যসভা

৭১.৩.২ লোকসভা

৭১.৩.৩ লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক

৭১.৪ সংসদ ও শাসনবিভাগ

৭১.৫ সংসদ ও বিচারবিভাগ

৭১.৬ সংসদ ও রাজ্য আইনসভা

৭১.৭ সংসদের কার্যাবলী

৭১.৮ লোকসভার স্পীকার

৭১.৯ আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি

৭১.৯.১ সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি

৭১.৯.২ অর্থবিল পাসের পদ্ধতি

৭১.৯.৩ সংবিধান সংশোধন বিল পাশের পদ্ধতি

৭১.১০ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

৭১.১১ সংসদ ও সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি

৭১.১২ ভারতীয় সংসদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা

৭১.১৩ সংসদের ক্ষমতা হ্রাস

৭১.১৪ সারাংশ

৭১.১৫ প্রশ্নাবলী ও উত্তরমালা

৭১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

৭১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা আয়ত্ত করতে পারবেন ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়। যে বিষয়গুলি এই এককে আলোচিত হয়েছে তা হল—

- সংসদের গঠন ও কার্যাবলী; রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং উভয়ের সম্পর্ক।
- সংসদের সঙ্গে শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও রাজ্য আইনসভার সম্পর্ক।
- সংসদের আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি, কমিটি ব্যবস্থা ও সংসদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা এবং
- সংসদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থান এবং বর্তমানে সংসদের মর্যাদাহ্রাসের কারণসমূহ

৭১.১ প্রস্তাবনা

ভারতীয় ইউনিয়নের আইনবিভাগের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত। ভারতের সংসদ ভারতের জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিসভা এবং ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। সংসদ আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

ভারতীয় সংবিধান দ্বারা তৈরি ভারতের সংসদ রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত।

৭১.২ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ভূমিকা

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সংসদ বা পার্লামেন্ট বলা হয়। ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংসদ এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমরা এই পাঠসংকলনের শুরুতে দেখেছি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবাসীকেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে মনে করা হয়েছে। জনগণের এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে ভারতের সংসদের মাধ্যমে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদই হল চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। সংসদই মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রয়োজন হলে তাকে অপসারণ করে। কারণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমর্থন পাবে ততদিন ক্ষমতায় থাকবে। তাই সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্বশীলতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৭১.৩ ভারতীয় সংসদের গঠন

ভারতের সংসদ একটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature)। উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা আর নিম্নকক্ষ লোকসভা। সংসদ অনুসারে ভারতের সংসদ গঠিত হয় রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা নিয়ে।

ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংসদের একটি অংশ কারণ রাষ্ট্রপতিকে ছাড়া সংসদের আইন প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ হয় না।

৭১.৩.১ রাজ্যসভা

(ক) রাজ্যসভার গঠন ঃ

রাজ্যসভা সংসদের উচ্চকক্ষ। ভারতের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় বলেই এই সভাকে রাজ্যসভা বলা হয়। সংবিধানের ৮০ নং ধারায় রাজ্যসভায় গঠন সম্পর্কে উল্লেখ আছে। অনাধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত হবে। এরমধ্যে চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজসেবায় বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। সংসদের উচ্চকক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থান দেবার জন্যই সংবিধানে এই মনোনয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ২৩৮ জন সদস্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২৪৫। রাজ্যের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। আর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সংসদের আইন নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচিত হন।

রাজ্যসভায় আসন বণ্টনের ভিত্তি হল জনসংখ্যা। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সুইজারল্যান্ডের মত সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয় নি। যার ফলে উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধি সংখ্যা যেখানে শুরু মণিপুর, মিজোরাম, সিকিম বা ত্রিপুরার মত ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা সেখানে মাত্র ১। আবার জনসংখ্যার অত্যল্পতার জন্য জাতীয় রাজধানী দিল্লী আর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পণ্ডিচেরী ছাড়া আর কোনো অঞ্চলের প্রতিনিধি রাজ্যসভায় নেই।

(খ) সদস্যদের যোগ্যতা ঃ

রাজ্যসভায় সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানের ৮৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রাজ্য থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচন প্রার্থীকে সেই রাজ্যের কোন লোকসভা কেন্দ্রের ভোটদাতা হতে হবে।

(গ) রাজ্যসভার মেয়াদ ঃ

রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ, একে ভেঙে দেওয়া যায় না, সদস্যগণ ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও প্রতি ২ বছর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং ঐ সংখ্যক নতুন সদস্য নির্বাচিত হন।

(ঘ) রাজ্যসভার সভাপতি ঃ

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি যিনি সংসদের উভয় সভার দ্বারা নির্বাচিত হন পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাজ্যসভার সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচিত করেন যিনি সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভার কাজ পরিচালনা করেন।

সভাপতি রাজ্যসভার সদস্য নন। এবং নির্ণায়ক ভোট ছাড়া তাঁর কোন ভোটাধিকারও নেই।

(ঙ) রাজ্যসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

প্রথমত, আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভার মতই সমান ক্ষমতা ভোগ করে এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোন বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় না। রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে কোন সাধারণ বিলের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহূত উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে তার নিষ্পত্তি ঘটে। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। রাজসভা শুধু লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত ও অনুমোদিত অর্থবিল ১৪ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেয়। ঐ সময়ের মধ্যে অনুমোদন না দিলেও ধরে নেওয়া হবে রাজ্যসভা অনুমোদন দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মন্ত্রীসভার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণের ব্যাপারে রাজ্যসভার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই। এ ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী লোকসভা—রাজ্যসভা নয়। কারণ, মন্ত্রীসভা কেবল লোকসভার কাছেই দায়িত্বশীল থাকে, রাজ্যসভার কাছে নয়। তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এবং সরকারি কাজকর্মের আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে রাজ্যসভা শাসন বিভাগের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়ত, কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজসভা লোকসভার সঙ্গে সমান ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন, উচ্চ পদাধিকারীদের ইম্‌পিচমেন্ট বা অপসারণ জরুরী অবস্থা ঘোষণার অনুমোদন, বিভিন্ন কমিশন ও পদাধিকারীর প্রতিবেদন বিবেচনা, কোন রাজ্যের নাম, সীমানা পরিবর্তন কিংবা বিধান পরিষদের সৃষ্টি বা বিলোপ, হাইকোর্টের এলাকা বৃদ্ধি, কোন নিয়োগকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র কর্তৃক কমিশনের এক্তিয়ার বহির্ভূত করা ইত্যাদি।

পরিশেষে উল্লেখ করা দরকার যে মুখ্যত দুটি ক্ষেত্রে সংবিধান রাজ্যসভাকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছেন (১) সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা দরকার তাহলে সংসদ সে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(২) সংবিধানের ২১২ নং ধারা অনুসারে রাজ্য সভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এরকম প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে সংসদের আরও সর্বভারতীয় কৃত্যক (All

India Service) সৃষ্টি করা উচিত তাহলে সংসদ আরও সর্ব-ভারতীয় কৃত্যক গঠনের ব্যবস্থা করতে পারে।

(চ) রাজ্যসভার মূল্যায়ন ঃ

রাজ্যসভা সংসদের শুধু যে পুনর্বিবেচনাকারী বা সংশোধনকারী কক্ষ তাই নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গ রাজ্যগুলির স্বার্থসংরক্ষণকারী কক্ষও বটে। রাজ্যসভার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভূমিকাটি সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি অর্থাৎ সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি তা রাজ্যসভার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য আয়তন ও লোকসংখ্যা নির্বিশেষে সিনেটে ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠায়। কিন্তু ভারতে আসন-বণ্টনের ভিত্তি জনসংখ্যা হওয়ায় জনবহুল রাজ্যগুলি সংখ্যাধিক্যের জোরে রাজ্যসভায় বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে। তাছাড়া রাজ্যসভার কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সদস্যরা নিজ নিজ রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ করার পরিবর্তে দলীয় স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। সুতরাং প্রকৃত অর্থে তাঁরা রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সদস্যদের পরোক্ষ নির্বাচন। এই নির্বাচন ব্যবস্থায় বিধানসভার দলীয় অবস্থানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই প্রতিনিধিদের উপর রাজনৈতিক দলগুলিরই নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ থাকে, ব্যাপক অর্থে রাজ্যের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, রাজ্যসভা যদি রাজ্যগুলির সভা হয়ে থাকে তাহলে এর সকল সদস্যই রাজ্যের প্রতিনিধি হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে এর কিছু সদস্য কেন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত হবেন? এই মনোনীত সদস্যরা নিশ্চয়ই রাজ্যের প্রতিনিধি নন, কেন্দ্রের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার এই ১২ জন সদস্য মনোনয়ন করার ব্যবস্থার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে গুণীজনের উপস্থিতিতে আইনসভার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মনোনয়ন কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লাগানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

তৃতীয়ত, সংবিধানপ্রনেতাগণ আশা করেছিলেন যে রাজ্যসভা প্রধান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মর্যাদাপূর্ণ বিতর্কস্থল হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয় নি। যদিও অতীতে অনেক গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি রাজ্যসভার সদস্যপদ অলংকৃত করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা অনেক সময়েই দলীয় রাজনীতি এবং সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল ও অভদ্র আচরণ রাজ্যসভার মান-মর্যাদা খর্ব করেছে।

চতুর্থত, ফরাসী রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী আবেসিয়ে বলেছিলেন, "দ্বিতীয়কক্ষ যদি প্রথমকক্ষের সঙ্গে একমদত হয় তাহলে তা অনাবশ্যক; আর যদি ভিন্নমত পোষণ করে তবে তা ক্ষতিকারক" । খুবই সত্যি কথা। ভারতীয় সংসদের প্রথম ২৭ বছরে উভয় কক্ষে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য থাকায় উভয় কক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল না বললেই চলে। (উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল ১৯৫৩ সালে সরকারি গাণিতিক কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে এবং ১৯৬১ সালে পণপ্রথা বিরোধী বিলের ব্যাপারে উভয় কক্ষের বিরোধ। যার ফলে প্রথম কয়েক বছরের

রাজ্যসভার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে মরিস জোনস্ মন্তব্য করেছিলেন "উচ্চকক্ষের সদস্যদের কিংবা এর কাজের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না"।

কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১৯৭৭ সালে যখন লোকসভার আস্থাভাজন জনতা সরকারের রাজ্যসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না। অনুরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে আরও কয়েকবার। শেষবার ঘটে ১৯৯৮ সালে। বিরোধী দল রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ১৯৭৭ সালে গোয়া, দমন, দিউ ও মিজোরামের আইনসভা এবং দিল্লীর মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের মেয়াদ সম্পর্কিত দুটি বিল রাজ্যসভা অনুমোদন দিতে অস্বীকার করে। ১৯৭৮ সালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন বিল লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরেও রাজ্যসভার বাধাদানের ফলে বিলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সরকার প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯১৯ সালে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জাতির সিদ্ধান্ত লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যসভার অনুমোদন পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে সরকার তা প্রত্যাহার করে নেয় (৮ মার্চ, ১৯৯৯)। এক্ষেত্রেও রাজ্যসভার অসহযোগিতায় লোকসভার সিদ্ধান্ত অকার্যকর হয়ে যায়।

লোকসভা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, সুতরাং জনগণের ইচ্ছা প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু রাজ্যসভা তা হয়। তাছাড়া রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠও বটে। এমতাবস্থায় লোকসভার কোন সিদ্ধান্ত যদি রাজ্যসভার দ্বারা নাকচ হয়ে যায় তাহলে তা নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক হবে, কারণ সেক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছাকেই বাধাদান করা হবে। এটা সংবিধানপ্রণেতাদের অভিপ্রায়ও ছিল না।

এই সমস্ত কারণে অনেকে রাজ্যসভার বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। তবে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রাজ্যসভার প্রকৃত ভূমিকা সংশোধনকারী কক্ষ। রাজ্যসভার নিজেকে ত্রুটি সংশোধনকারী কক্ষ হিসাবেই দেখা উচিত। রাজ্যসভার কাজ হবে লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত বিলের উন্নতিসাধন, সে বিলে বাধা দান নয়। যা দরকার তা হল উভয় সভার সহযোগিতা, কারণ কোন কক্ষই এককভাবে সংসদ হতে পারে না। দুটি কক্ষ নিয়েই সংসদ।

৭১.৩.২ লোকসভা

লোকসভা সংসদের নিম্নকক্ষ, যদিও এই কক্ষেই জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপকতম সমাবেশ। এই কক্ষের সদস্যগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। বর্তমানে অন্তত ১৮ বছর বয়স্ক যে কোন ভারতীয় নাগরিক লোকসভার নির্বাচনে ভোট দিতে পারে।

(ক) গঠন ঃ

লোকসভা গঠিত হয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচিত অনধিক ৫৩০ জন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অনধিক ২০ জন সদস্য নিয়ে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে ২ জন সদস্য মনোনীত করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে ঐ সম্প্রদায় থেকে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য

লোকসভা নির্বাচিত হন নি। সুতরাং সংবিধান অনুসারে লোকসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২ জন হতে পারে। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

(খ) সদস্যপদের যোগ্যতা ঃ

লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে (১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে (২) অন্তত ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে। এবং (৩) সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৫ সালের ৫২ তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে রচিত ১৯৯১ সালের দলত্যাগবিরোধী আইন লোকসভার সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত অযোগ্যতা সম্পর্কিত কিছু নিয়মের উল্লেখ করেছে। এই নিয়ম ভঙ্গ করা হলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়।

(গ) কার্যকালের মেয়াদ ঃ

সাধারণ অবস্থায় লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডাকতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থা জারী হলে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ প্রতিবার ১ বছর করে সংসদ বাড়াতে পারে।

(ঘ) অধিবেশন ঃ

রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান করতে স্থগিত রাখতে কিংবা ভেঙে দিতে পারেন। সংবিধান অনুসারে দুটি অধিবেশনের মধ্যে ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হবে না। রাষ্ট্রপতি লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। কিংবা যে কোন সময় লোকসভায় বাণী পাঠাতে পারেন।

(ঙ) লোকসভার স্পীকার ঃ

লোকসভার সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন। উভয়েই লোকসভার সদস্যগণ দ্বারা নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন।

(চ) লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে লোকসভাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মঞ্চ। যেহেতু তুলনায় রাজ্যসভার ক্ষমতা খুবই সীমিত তাই সংসদের ক্ষমতা বলতে লোকসভার ক্ষমতাই বোঝায়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই কক্ষই সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারি নীতি ও আইন প্রণয়ন, আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণ জাতীয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং লোকসভার এই বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

আইন প্রণয়ন করাই হল লোকসভার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সংসদ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম তা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। সংবিধানের সপ্তম 'তপশিলে বর্ণিত কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের। যদিও যুগ্ম তালিকা সম্পর্কে রাজ্য বিধানসভার আইন প্রণয়নের অধিকারী, রাজ্যের আইনের সঙ্গে কেন্দ্রের আইনের বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রের আইন বলবৎ থাকে। আর রাজ্য তালিকা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য বিধান সভার হলেও কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কেও সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। এই বিশেষ অবস্থাগুলি হল ঃ (ক) জাতীয় স্বার্থে রাজ্যসভা অনুমতি দিলে, (খ) দুই বা ততোধিক রাজ্য নিজেদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের জন্য অনুরোধ করলে; (গ) কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে (ঘ) জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী হলে এবং (ঙ) কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন (৩৫৬ নং ধারা) জারি হলে সেই রাজ্যের ক্ষেত্রে।

আমরা এর আগে দেখেছি যে সংসদের আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অর্থবিল ছাড়া সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে তবেই একটি বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তারপর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলে সেটি আইনে পরিণত হয়। সাধারণ বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির ডাকা উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে তার নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু অর্থ বিলের ক্ষেত্রে লোকসভাই সর্বেসর্বা। অর্থ বিল একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হয় এবং লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভাকে তা ১৪ দিনের মধ্যে তা অনুমোদন করতে হয়। রাজ্যসভা অবশ্য ঐ বিল সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করতে পারে, কিন্তু সে সুপারিশ লোকসভা কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়। কোন বিল অর্থ বিল কি না তাও স্থির করে লোকসভার স্পীকার, সুতরাং অর্থসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

ভারতের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকার গঠনের একমাত্র ভূমিকা লোকসভার, কারণ কোন্ দল বা জোট মন্ত্রীসভা বা সরকার গঠন করবে তা নির্ভর করে লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। অনেক সময় মন্ত্রীসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেন। যেমন, ১৯৯৯ সালে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জোট সরকার থেকে আন্না ডি এম কে-র সমর্থন তুলে নিলে মন্ত্রীসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। রাষ্ট্রপতি তখন প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার আস্থা ভোট নিতে বলেছিলেন। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে আস্থা ভোটের প্রস্তাব পরাজিত হলে বাজপেয়ী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। তখন লোকসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা চলে।

সরকার গঠন ছাড়াও সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও লোকসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূল কথা হল আইনসভার কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতা। আমরা আগেই দেখেছি যে এই দায়িত্বশীলতা একমাত্র লোকসভার কাছেই। সংবিধানের ৭৫(৩) নং ধারায় পরিষ্কার বলা আছে "মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকবে"। এর অর্থ হল সরকারি নীতি ও কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। সুতরাং সরকার গঠন করার পর সেই সরকারকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা লোকসভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্ন উপায়ে লোকসভা এই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, যেমন—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা ইত্যাদি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই অনাস্থা প্রস্তাব। লোকসভা এই প্রস্তাব পাস করলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। আবার, লোকসভায় কোন মন্ত্রীর পরাজয়কে সমগ্র মন্ত্রীসভার পরাজয়রূপে গণ্য করা হয়। সুতরাং মন্ত্রীসভা বা সরকার কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা নির্ভর করে লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর। অনাস্থা প্রস্তাব পাস হওয়ার পর মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে বিকল্প সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চলতে পারে, অথবা পরাজিত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডাকার জন্য পরামর্শ দিতে পারেন। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে লোকসভায় আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোন জোট কিংবা তৃতীয় কোন ফ্রন্ট বিকল্প সরকার গঠনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন ডেকেছিলেন।

অনাস্থা প্রস্তাব পাস কিংবা আস্থা ভোটে হেরে যাওয়া ছাড়াও কোন সরকারি বিল, বিশেষ করে বাজেট যদি লোকসভা প্রত্যাখ্যান করে তাহলেও তা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে লোকসভার অনাস্থা বোঝাবে, সুতরাং সেক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

(৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

লোকসভা জাতীয় অর্থের জিম্মাদার। সরকারের যাবতীয় আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোকসভার একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। লোকসভার অনুমোদন ছাড়া সরকার কোন কর ধার্য কিংবা ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না। সরকারি আয়-ব্যয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য লোকসভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি আছে। এই দুটি কমিটি হল ঃ (ক) সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts Committee), এবং (খ) আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (Estimates Committee)। প্রতি বছর লোকসভায় আগামী বছরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বাজেট সংসদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়।

(৪) নির্বাচনমূলক ক্ষমতা ঃ

লোকসভার সদস্যগণ রাষ্ট্রপতিও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন। নির্বাচনমূলক ক্ষমতা ছাড়াও লোকসভার হাতে গুরুত্বপূর্ণ অপসারণমূলক ক্ষমতাও আছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, লোকসভার স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, মুখ্য নির্বাচনী অফিসার, রাষ্ট্রকৃত্যকের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অপসারণে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

(৫) সাংবিধানিক ক্ষমতা ঃ

সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভার তথা সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট কিংবা কেন্দ্ররাজ্য ক্ষমতা বণ্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংশোধনের ক্ষেত্রে লোকসভা রাজ্যসভা ছাড়াও রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সম্মতি দরকার হয়।

(৬) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণা লোকসভা ও রাজ্যসভা কর্তৃক সমর্থিত হতে হয়, তা না হলে বাতিল হয়ে যায়। তাছাড়া জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধন (১৯৭৮) লোকসভার হাতে এক বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। লোকসভার এক-দশমাংশ সদস্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের ইচ্ছা লিখিতভাবে জানালে লোকসভার স্পীকার অথবা রাষ্ট্রপতি ১৪ দিনের মধ্যে ঐ উদ্দেশ্যে লোকসভার এক বিশেষ অধিবেশন ডাকবেন।

এই সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী ছাড়াও লোকসভাকে আরও কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। যেমন — বিভিন্ন কমিশন ও সাংবিধানিক পদাধিকারীর রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা,অধিকার ভঙ্গের জন্য কোন সদস্য বা বাইরের কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া, তথ্য সরবরাহ করা, জনমত গঠন করা ইত্যাদি।

৭১.৩.৩ লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পর্ক

আমরা এর আগে দেখেছি যে ভারতীয় সংসদ একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। এর উচ্চ-কক্ষ, রাজ্যসভা আর নিম্ন-কক্ষ লোকসভা। এই দুটি কক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। তখন আমরা এ দুটি কক্ষের মধ্যে কি সাংবিধানিক সম্পর্ক তা তুলনামূলক আলোচনা করে দেখবো।

উভয় কক্ষের মধ্যে কিছু গঠন, যোগ্যতা ও কার্যকাল সংক্রান্ত পার্থক্য আছে। রাজ্যসভার তুলনায় লোকসভার সদস্যসংখ্যা দ্বিগগুণেরও বেশি। রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা যেখানে ২৫০-এর বেশি হতে পারে না। সেখানে লোকসভার সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫৫২। রাজ্যসভার সদস্যরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের

প্রতিনিধি, আর লোকসভার সদস্যরা ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি। রাজ্যসভার সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নিজ নিজ রাজ্যের বিধানসভার দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্যদিকে লোকসভার সদস্যগণ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষে কিছু সদস্য মনোনীত করতে পারেন। তিনি রাজ্যসভায় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মনোনীত করতে পারেন কিন্তু লোকসভায় ২ জন ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় থেকে মনোনীত করতে পারেন। রাজ্যসভার সদস্যপ্রার্থীকে কমপক্ষে ৩০ বছর হতে হয়। কিন্তু লোকসভার ক্ষেত্রে ২৫ বছর বয়স্ক হলেই চলে। আবার রাজ্যসভার প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোন লোকসভার নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার হতে হবে, কিন্তু লোকসভার প্রার্থীকে ভারতের যে কোন নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার হলেই হয়।

রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ। একে ভেঙে দেওয়া যায় না। এর সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে ২ বছর অন্তর একতৃতীয়াংশ সদস্যকে অবসর গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু লোকসভা স্থায়ী কক্ষ নয়। লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি একে ভেঙে দিতে পারেন; আবার জরুরী অবস্থায় এর মেয়াদ এক বছর করে বাড়ানো যায়।

এবারে আমরা ক্ষমতা ও মর্যাদার দিক থেকে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করবো।

একমাত্র অর্থ বিল ও মন্ত্রীসভার দায়িত্বশীলতা সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে সংসদের দুটি কক্ষই সমক্ষমতাসম্পন্ন। ঐ দুটি বিষয় লোকসভার নিজস্ব বিষয়, সুতরাং এ ব্যাপারে রাজ্যসভার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন—

(১) অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না।

(২) অর্থ বিল রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান কিংবা সংশোধন করতে পারে না—শুধু নিজস্ব মতামত বা সুপারিশ জানাতে পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থ বিল পাশ না করে তাহলে তা পাশ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৩) কোন বিল অর্থ বিল কিনা তা স্থির করবেন লোকসভার স্পীকার।

(৪) রাজ্যসভা 'বাৎসরিক আর্থিক বিবৃতি' বা বাজেট আলোচনা করতে পারে, কিন্তু দাবি মঞ্জুর করতে পারে না।

(৫) মন্ত্রীসভা লোকসভার কাছেই দায়ী থাকে, রাজ্যসভার কাছে নয়। সুতরং রাজ্যসভা মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করতে পারে না। এবং সব শেষে

(৬) রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য লোকসভার এক-দশমাংশ সদস্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) লোকসভাকেই এই ক্ষমতা দিয়েছে রাজ্যসভাকে নয়।

লোকসভার এই প্রাধান্যের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না যে রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ। অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল সম্পর্কে উভয় কক্ষের ক্ষমতা সমতুল্য। উভয়ের অনুমোদন না থাকলে কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। যেমন—রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও পদচ্যুতি। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতির জারি করা অর্ডিন্যান্স, জরুরী অবস্থার ঘোষণা — এ সবই সংসদের উভয় কক্ষেই পেশ করতে হয় এবং উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। অর্থ বিল এবং সংবিধান সংশোধনী বিল বাদে বাকি সমস্ত বিলের ক্ষেত্রে উভয় সভার মতবিরোধ উভয় সভার যুগ্ম অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে মিটে যায়। এই যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন।

এ ছাড়া সংবিধান রাজ্যসভাকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে যা লোকসভাকে দেয় নি। সংবিধানের ২৪৯ নং ধারা অনুসারে রাজ্যসভা যদি উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন তাহলে সেই বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার অনুরূপ সংখ্যারিষ্ঠতায় গৃহীত রাজ্যসভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদ অতিরিক্ত সর্বভারতীয় কৃত্যক (All India Service) গঠন করতে পারে।

৭১.৪ সংসদ ও শাসন বিভাগ

সংবিধান অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান। সমস্ত শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। তিনি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে নিজে অথবা তার অধস্তন অফিসারদের মাধ্যমে সংবিধান অনুসারে প্রয়োগ করবেন। সুতরাং সমস্ত শাসন বিভাগীয় কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তবে সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভার সাহায্য ও পরামর্শ অনুসারে কাজ পরিচালনা করতে হয়। (৭৪ নং ধারা)। সুতরাং রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে মন্ত্রীসভা।

যদিও রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্য বা সরকারি কর্মচারীরাও শাসনবিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বর্তমান আলোচনায় শাসন বিভাগ বলতে শুধু মন্ত্রীসভা বা রাজনৈতিক শাসন বিভাগকে বোঝানো হবে। ভারত সরকার এই মন্ত্রীদের নিয়েই গঠিত এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান।

নতুন লোকসভা গঠনের পর রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান জানান। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের কোন সুযোগ নেই। তবে কদাচিৎ যদি লোকসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন অর্জনকারী নেতার অবস্থান

সম্পর্কে নেতার অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা দেখা দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে একজনকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে পারেন যিনি তাঁর মতে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে সরকারের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম।

প্রধানমন্ত্রী সাধারণত লোকসভারই সদস্য যদিও রাজ্যসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের নজিরও আছে (ইন্দিরা গান্ধী, ১৯৬৬, পি. ভি. নরসিমা রাও, ১৯৯১); এমন কি সংসদের কোন কক্ষেরই সদস্য নন এমন ব্যক্তিত্ব প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন (দেব গৌড়া)। অন্যান্য মন্ত্রীগণ সংসদের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে পারেন। সংসদের সদস্য নন এমন কাউকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করলে ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হয়। তা না হলে ইস্তফা দিতে হয়। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। মন্ত্রীসভা যৌথভাবে এবং একজন মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারেই মন্ত্রীরা লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। সংবিধানেও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশও আছে [৭৫(৩) নং ধারা]। এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়পূর্ণ মিশ্রণ থাকে, কারণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন এক দলীয় সদস্যদের হাতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা থাকে যাঁরা আইনসভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাধিক্য ভোগ করেন এবং ততক্ষণই তাঁরা ক্ষমতাশীল থাকেন যতক্ষণ তাঁদের সেই সংখ্যাধিক্য বজায় থাকে। সুতরাং ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভার আস্থা বা সংখ্যাধিক্যের সমর্থন হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

ভারতের শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও আইনসভার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাসনবিভাগ সংসদের বাইরের কোন সংস্থা নয়। এর অবস্থান সংসদের ভেতরেই। বলা যেতে পারে মন্ত্রীসভা হল সংসদের একটি কমিটি যার উপর শাসনপরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু মন্ত্রীসভার সদস্যরা সবাই সংসদের সদস্য এবং সংসদের কাছে দায়িত্বশীল থাকে, তাই উভয়ের সম্পর্ক কিছুটা পূর্ণ ও অংশের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনীয়। পরস্পরনির্ভরশীল এই দুই বিভাগের কার্যাবলীর প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন। সংসদের কাজ হল আইন প্রণয়ন করা, শাসন বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া, সমালোচনা করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ তুলে ধরা। শাসনবিভাগের কাজ হল শাসন করা; তবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও শাসন বিভাগকেই উদ্যোগ নিতে হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব বা বিল এবং কাজের উত্থাপন করে মন্ত্রীসভা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সে বিল সহজেই পাশ হয়ে যায়। সুতরাং আইনগত দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে সংসদ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, সংসদ সরকারের প্রভু। মন্ত্রীসভা গঠন থেকে শুরু করে তার কার্যকালের মেয়াদ সব কিছুই নির্ভরশীল সংসদের সমর্থনের উপর, বিশেষ করে লোকসভার আস্থার উপর। তবে, সংসদের এই নিয়ন্ত্রণ যতটা তাত্ত্বিক ততটা বাস্তব নয়। বাস্তবে মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে কারণ সংসদের অধিকাংশ সদস্য এবং মন্ত্রীসভা একই রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীসভা যে কোন ধরনের প্রস্তাব সংসদে পাশ করিয়ে নিতে পারে।

৭১.৫ সংসদ ও বিচারবিভাগ

আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের মত বিচারবিভাগও আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। বিরোধের ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দ্বিভাগবিশিষ্ট বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আমাদের সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির জন্য একটি মাত্র অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই গোটা ব্যবস্থার শীর্ষে আছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নিচে আছে বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের নিচে আছে অন্যান্য অধস্তন আদালত।

ভারতের আদালত সমূহের স্থাপন গঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ২৫ জন অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতা বলে সংসদ বার বার আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে হাইকোর্ট আছে তবে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ হাইকোর্ট স্থাপন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। হাইকোর্ট গঠিত হবে একজন প্রধান বিচারপতি এবং কতিপয় অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে যাঁরা সবাই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত। সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী মন্ত্রীসভা ছাড়াও প্রধানত বিচারকবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়; কারণ তাঁরাই এ বিষয়ে মতামত দেবার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য।

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের একজন বিচারক স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু সংবিধান নির্দেশিত 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতি ছাড়া তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যায়। এবং এই ইমপিচমেন্টের ক্ষমতা একমাত্র সংসদের। এই পদ্ধতি অনুসারে অসদাচরণ ও অসামর্থ্যের অভিযোগ সম্বলিত কোন প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ও উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে পদচ্যুত করেন। এ পর্যন্ত দুর্নীতিমূলক আচরণের জন্য ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব মাত্র একবারই সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের মে মাসে সংসদ কর্তৃক সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ভি. রামস্বামীর বিরুদ্ধে আনীত এই ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে বাতিল হয়ে যায়। একমাত্র ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবের উপর ছাড়া সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের বা হাইকোর্টের কোন বিচারকের আচরণ নিয়ে সংসদে আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা স্পষ্টতই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

সংসদ আইন প্রণয়ন করে কেন্দ্রের জন্য এবং আলাদাভাবে রাজ্যের জন্য প্রশাসনিক আদালত গঠন করতে পারে এবং তাঁদের এলাকা ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে সংসদ সর্বভারতীয় বিচারবিভাগীয় কৃত্যক গঠন করতে পারে। সংসদের কোন কক্ষের কার্যাবলী সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। সংসদের চার দেয়ালের মধ্যে যাই বলা হোক বা করা হোক তা নিয়ে আদালতে কোনরকম অনুসন্ধান করা যাবে না। সংসদের আভ্যন্তরীণ বিষয় বা কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কোন আদালত কোন রিট বা আদেশ, নির্দেশ জারি করতে পারে না।

সংসদের সঙ্গে বিচার বিভাগের সম্পর্কের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা এই সঙ্গে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার আলোচনা না করি। আমরা জানি বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে বিচারবিভাগ সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে যে কোন আইন ও সরকারি সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। ভারতের সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মধ্যে ক্ষমতা ও কার্যাবলীর এক্তিয়ার নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদ যদি এমন আইন প্রণয়ন করে যা সংবিধানবিরোধী তাহলে সেই আইনকে আদালত বাতিল করে দেবে। সংবিধানের ১৩ নং ধারা পরিষ্কারভাবে সংসদ, রাজ্য আইনসভা কিংবা যে কোন কর্তৃপক্ষকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার লঙঘন করে আইন করতে নিষেধ করে দিয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকার লঙঘন করে আইন করতে নিষেধ করে দিয়েছে। সংবিধানের ৩২ এবং ২২৬ নং ধারা যথাক্রমে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টকে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং আদালতে সংসদের যেকোন আইনের সংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে কতকগুলি কারণে, যথা—(ক) আইনটি সংসদের আইন প্রণয়নের এক্তিয়ারের বাইরে; (খ) আইনটি সংবিধানের ব্যবস্থার বিরোধী; কিংবা (গ) আইনটি মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে।

সুপ্রিমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বা শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট নিজে তার কোন সিদ্ধান্ত, ব্যাখ্যা বা রায় না পাল্টালে তা অবিসংবাদিত বিধান হিসাবে গণ্য করা হয় এবং দেশের সমস্ত আদালত তা মেনে নিতে বাধ্য থাকে। বিচার বিভাগ যখন সংসদের কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তখন সংসদ সেই আইনের ত্রুটি দূর করে পুনরায় সেই আইন পাস করতে পারে। অথবা তার সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারে যাতে ঐ একই আইন এখন বৈধ হতে পারে।

সুতরাং ভারতের সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত অসীম ক্ষমতার অধিকারী নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন আইনই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার আওতায় পড়ে না। আবার ভারতে বিচার বিভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মত ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার উপর কার্যত কোন সীমা নেই।

৭১.৬ সংসদ ও রাজ্য আইন সভা

ভারতের শাসন ব্যবস্থার কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে এখানে দু ধরনের সরকারের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে আছে কেন্দ্রীয় সরকার, অন্য দিকে রাজ্য সরকার। ভারতের সংবিধান উভয় সরকারের মধ্যে আইন, শাসন ও আর্থিক ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছে। রাজ্য আইনসভাগুলি যাতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেজন্য আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি তালিকার কথা সংবিধানের সপ্তম তপসিলে (Seventh Schedule) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিতে কেবলমাত্র সংসদই আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে।

সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা নিজ নিজ এলাকায় স্বাতন্ত্র্য ভোগ করলেও ক্ষমতা বণ্টনের যে নীতি অনুসৃত হয়েছে তাতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সংসদের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। তিনটি তালিকার মধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকাই দীর্ঘতম এবং এই তালিকায় প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, রেলপথ, যোগাযোগ, ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাব্যবস্থার মত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তালিকা বহির্ভূত অবশিষ্ট ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়েছে। আবার, যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইনের সঙ্গে রাজ্যের আইনের বিরোধ দেখা দিলে সংসদের আইনই বলবৎ থাকবে। সংবিধানের ২৫৬ নং ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি রাজ্যের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিচালিত হবে। এমন কি যে বিষয়গুলি একমাত্র রাজ্যের জন্য সংরক্ষিত সে বিষয়গুলি সম্পর্কেও সংসদ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন, রাজ্যসভা যদি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এই মর্মে প্রস্তাব পাস করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিংবা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে যদি রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের দরকার হয় তাহলেও তা সংসদই করবে। দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধেও সংসদ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

কোন রাজ্যের আইন সভার দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি বা বিলোপ সাধন, নতুন রাজ্যল গঠন কিংবা কোন রাজ্যের নাম, সীমানার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে একমাত্র সংসদই সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও সংসদ একক ক্ষমতার অধিকারী, যদিও সামান্য কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অনুমোদনসংক্রান্ত কিছুটা ভূমিকা আছে।

সুতরাং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংসদ ও রাজ্য আইনসভার নিজ নিজ ক্ষেত্রে যাতে আইন

প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাতন্ত্র ভোগ করতে পারে সেজন্য সংবিধানে ক্ষমতাবিভাজন করে দেওয়া হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংসদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাজ্য, আইনসভার স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

৭১.৭ সংসদের কার্যাবলী

সংসদে আজ শুধু আইন প্রণয়নকারী সংস্থাই নয়। আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংসদকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বহু ধরনের কাজ করতে হয়। তাই সংসদকে বিবিধ-কর্মবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত সংসদ বিশেষজ্ঞ ডঃ সুভাষ কাশ্যপ সংসদের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা—শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করা, তথ্য সরবরাহ করা, প্রতিনিধিত্বমূলক, শিক্ষামূলক ও পরামর্শদান সংক্রান্ত কাজ করা, দ্বন্দ্বের নিরসন করা, আইন প্রণয়ন করা ও সরকারি সিদ্ধান্তকে বৈধতা প্রদান করা, সংবিধান সংশোধন করা, এবং নেতৃত্বের অনুশীলন ও যোগান দেওয়া। এই কাজগুলিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) প্রধানত মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বের নীতি কার্যকর করা ও বাজেট পাসের মধ্য দিয়ে সংসদ শাসন-বিভাগের উপর তার নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ রাখে। আমরা জানি আমাদের এই সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা সমস্ত সরকারি নীতি ও কাজ পরিচালনার জন্য সংসদের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। বাস্তবে এই দায়িত্বশীলতার অর্থ হল মন্ত্রীসভাকে সর্বদা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে চলতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং সংসদ অনাস্থা প্রসতাব পাস করে মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করতে পারে।

অনুরূপভাবে বাৎসরিক ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি ও করধার্যের প্রস্তাব বাজেট সংসদে উত্থাপন করে সরকার। কিন্তু বাজেট সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। সুতরাং কর ধার্যের প্রস্তাব এবং ব্যয়-মঞ্জুরীর দাবি অনুমোদন, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে সংসদ বিশেষ করে লোকসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। কারণ সংসদের অনুমোদন ছাড়া সরকার একটি পয়সাও করধার্য করতে পারে না, কিংবা ব্যয় করতে পারে না।

এইভাবে সংসদ শাসন বিভাগের উপর তার রাজনৈতিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। (২) সংসদ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীদের মাধ্যমে। মন্ত্রীরা সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর তা কার্যকর করে প্রশাসন বা রাষ্ট্রীয় কৃত্যকের সদস্যগণ। কিন্তু একজন মন্ত্রী তার দপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম ও ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য নিজে দায়ী থাকেন। তাই কোন বিভাগের অফিসার বা কর্মচারীর ত্রুটিবিচ্যুতি বা দুষ্কর্মের জন্য ঐ বিভাগীয় মন্ত্রী সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদ প্রশাসনের উপর নজর রাখে। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি গঠন, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশ, আলোচনা ইত্যাদি।

(৩) সংসদের পক্ষে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হল তথ্য। সংসদ বিভিন্নভাবে এই তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন উৎস থেকে, তবে সবচেয়ে বড় উৎস হল সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগ। সরকারের কাছ থেকে, তথ্যের দাবি চাওয়া সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। একমাত্র জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এমন তথ্য ছাড়া সংসদের তথ্যসংগ্রহের অধিকার প্রায় অবাধ। সরকারেরও কর্তব্য হল সংসদকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সঠিক এবং পরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা। সরকারি নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে সদস্যগণ মন্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। বিভাগীয় মন্ত্রীদের এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। তাঁরা উভয় কক্ষেই বিবৃতি দেন, বিভিন্ন রিপোর্ট, দলিল ও কাগজপত্র সভায় পেশ করেন। এই সব নিয়েই সংসদের মূল্যবান তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয় যা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং সংসদের আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

(৪) আধুনিক গণতন্ত্রে আইনসভার প্রাথমিক কাজ হল জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা। আইনসভা জনগণের এক সর্বোচ্চ রাজনৈতিক মঞ্চ যেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে। ভারতের সংসদও ঠিক এই ভূমিকাই পালন করে আসছে।

তাছাড়া সংসদের একটা শিক্ষামূলক ভূমিকাও আছে। সংসদের একজন সদস্যকে সংসদের কাজকর্ম ভাল করে বুঝতে হয় এবং সেই কাজকর্মে এবং বিতর্কে তাকে অংশ গ্রহণ করতে হয় যাতে সে তার নির্বাচনী এলাকার জনগণকে জানাতে পারে বা বোঝাতে পারে সংসদের প্রকৃত ভূমিকা কি। তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কেও তাকে ওয়াকিবহাল হতে হয় যাতে সে বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সেই সমস্যা সংসদে তুলে ধরতে পারেন।

সংসদের কিছু পরামর্শদান ভূমিকাও আছে। সংসদের বিতর্ক প্রশাসনের উপরেও প্রভাব ফেলে। যদিও রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্য ও আমলারা স্বাধীনমত মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত ও সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতি কার্যকর করে, তবুও তারা সংসদীয় বিতর্ক ও সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাদের নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

(৫) সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন মত, পথ ও স্বার্থের যে সংঘাত দেখা দেয় তার নিরসন ঘটে সংসদে। এই নিরসনের জন্য প্রয়োজান হলো বিভিন্ন মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। সংসদের এই ভূমিকা ভারতের মত বহুত্ববাদী সমাজের পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

(৬) আইন প্রণয়ন করাই হল সংসদের প্রধান কাজ। সংবিধান অনুসারে সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়, অবশিষ্ট বিষয় এবং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন প্রণয়ন করে। আজকের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনসাধনের মাধ্যমে যাতে জনগণের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে সেজন্য সংসদকে বিভিন্ন ধরনের সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করতে হয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংসদ সর্বদা প্রকৃত অর্থে আইন প্রণয়ন করে না।

শুধু শাসনবিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীসভা কর্তৃক উত্থাপিত আইনের প্রস্তাবে আলোচনার পর সম্মতি দেয় মাত্র।

(৭) আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে সংসদের হাতে সংবিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা বলে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে। ঐ ধারায় বর্ণিত সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন — (ক) সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি 'বিল' সংসদে উত্থাপন করতে হবে। তার মানে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ একমাত্র সংসদই নিতে পারে। (খ) সংবিধানের বেশিরভাগ অংশই সংসদের উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংশোধন করা যায়। ব্যতিক্রম শুধু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলি সংশোধনের জন্য ঐ বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াও অন্তত অর্ধেক রাজ্য আইনসভার অনুমোদন দরকার হয়। (গ) প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস এবং রাজ্যগুলির দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে এবং তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন অন্যান্য বিলের মত। তিনি তা প্রত্যাখ্যান বা সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন না। পরিশেষে, (ঘ) সংবিধানের কোন অংশই অসংশোধনীয় নয়; তবে সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করতে পারে না (কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য, ১৯৭৩)।

(৮) সংসদ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুশীলনভূমি হিসাবে কাজ করে। জাতীয় ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দ এখান থেকেই নিযুক্ত হন।

৭১.৮ লোকসভার স্পীকার

যে কোন সভা সুশৃঙ্খলভাবে চলতে হলে সভার কাজকর্ম ও নিয়মকানুন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একজন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন আছে। লোকসভার এই কর্তৃপক্ষ হলেন স্পীকার।

লোকসভার স্পীকারের পদ অত্যন্ত সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার পদ। লোকসভাকে যদি জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চরূপে গণ্য করা হয়, তাহলে স্পীকার হলেন সেই মঞ্চের প্রধান পরিচালিক ও অভিভাবক। লোকসভার স্পীকার পদের উপলব্ধি করেই মর্যাদার দিক থেকে এই পদকে ভারতে সপ্তম স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর পদমর্যাদা ভারতের প্রধান বিচারপতির সমান।

ব্রিটেনের কমন্সসভার স্পীকারের অনুকরণে লোকসভার স্পীকারের পদ সৃষ্টি করা হলেও প্রধানত দুটি দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কমন্সসভার স্পীকারের উৎপত্তি ও বিকাশ যেরূপ প্রথাগতভাবে হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে হয়নি। ভারতের লিখিত সংবিধানে বিভিন্ন ধারায় স্পীকারের নিয়োগ, ক্ষমতা, কার্যাবলী ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কমন্সসভার স্পীকারের পদের জন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে একজনকে সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার পদে নির্বাচিত করে। শুধু তারা নয় ব্রিটেনের স্পীকারের দলনিরপেক্ষতার উপর এতই জোর দেওয়া

হয় যে কমন্সসভার পরবর্তী নির্বাচনেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দেওয়া হয় না। ভারতে এখনও এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। পূর্বতন স্পীকারগণকে দলীয় প্রার্থী হিসাবে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়।

স্পীকারের যোগ্যতা, নির্বাচন ও কার্যকাল ঃ

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী স্পীকারকে লোকসভার সদস্য হতে হয়। সুতরাং লোকসভার সদস্য হতে হলে যে সব যোগ্যতা থাকা দরকার স্পীকারকেও অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। নব নির্বাচিত লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পীকার ও আর একজনকে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করে। ভারতে স্পীকার নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়।

লোকসভার স্পীকারের কার্যকাল সম্পর্কে সংবিধানে কিছু উল্লেখ করা হয় নি তবে লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ যতদিন থাকে স্পীকারও ততদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং তিনি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য কতকগুলি কারণে কার্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই তাঁর পদ খালি হতে পারে। যেমন, লোকসভার সদস্যপদ বাতিল হওয়া, পদত্যাগ এবং অপসারণ। তবে অপসারণের উদ্দেশ্যে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করতে হলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হয় এবং ঐ অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সময় তিনি সভাপতিত্ব করেন না। লোকসভার কার্যকাল শেষ হলে, কিংবা লোকসভা ভেঙে দেওয়া হলে পরবর্তী লোকসভা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত স্পীকার তাঁর পদে আসীন থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভার স্পীকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ক্ষমতা বহু ও বিভিন্ন। স্পীকারের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ভারতের সংবিধান এবং লোকসভার কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মবিধি। স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) লোকসভার সভাপতিত্ব করা এবং অধিবেশন পরিচালনা করা ঃ

স্পীকার লোকসভার সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কাজ পরিচালনা করেন। তিনি সংবিধান এবং লোকসভার নিয়মকানুনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা। যে কোন সংসদীয় বিষয়ে স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং তাঁর কোন সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করা কিংবা আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। সভায় ন্যূনতম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না থাকলে তিনি কোরামের অভাবে সভার কাজ মুলতুবি বা স্থগিত রাখতে পারেন।

স্পীকার লোকসভার বিতর্ক ও আলোচনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভার নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি লোকসভার কর্মসূচী স্থির করেন। প্রয়োজন হলে তিনি বিরোধী দলের নেতার সঙ্গেও পরামর্শ নেন। সংখ্যালঘু সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি সভার নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা করেন এবং বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসা করেন। কোন বিষয়ে আলোচনার পর যদি ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি ভোট গ্রহণ করেন। ভোটের ফলাফল তিনিই ঘোষণা করেন। স্পীকার নিজে কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন না। তিনি ভোটাভুটিতেও অংশগ্রহণ করেন না। তবে কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি তাঁর নির্ণায়ক ভোট (Casting vote) দিয়ে অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে পারেন।

(২) সভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করা ঃ

স্পীকারকে লোকসভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। সুতরাং তাঁকে সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সভায় বক্তৃতা দিতে হলে কিংবা কোন বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে প্রত্যেক সদস্যকেই স্পীকারের অনুমতি নিতে হয়। কোন সদস্য তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন বক্তব্য পেশ করলে বা সংসদীয় রীতি বহির্ভূত কোন বক্তব্য পেশ করলে তিনি সভার কার্য-বিবরণী থেকে সেই বক্তব্য বাতিলের নির্দেশ দিতে পারেন। একাধিক সদস্য একই সঙ্গে বক্তৃতা দিতে চাইলে কোন্ সদস্য আগে বলবেন তা তিনি স্থির করে দেন। তিনি স্থির করেন কিভাবে বক্তৃতা দেওয়া হবে; অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য, পুনরাবৃত্তি কিংবা অশালীন মন্তব্য তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সভায় কোন সদস্য শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে কিংবা আপত্তিকর আচরণ করলে স্পীকার তাঁকে সংযত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন, কিংবা চরম অবস্থায় তিনি তাঁকে সভা থেকে বহিষ্কার বা কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করতে পারেন। সভায় বিশৃঙ্খলা হৈ হট্টগোল দেখা দিলে তিনি সভা মুলতুবি কিংবা স্থগিত রাখতে পারেন।

(৩) সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করা ঃ

সভায় অধিকার ভঙ্গের বিষয়ে স্পীকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সভার অবমাননার জন্য কোন সদস্য বা ব্যক্তিকে তিনি গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারেন। সভার এলাকার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পীকারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। আর এলাকার বাইরে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করলে বিষয়টা স্পীকারকে তৎক্ষণাৎ জানাতে হয়।

(৪) স্পীকারের বিশেষ ক্ষমতা ঃ

স্পীকার কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—

(ক) কোন অর্থ বিল কি না তা চূড়ান্তভাবে স্থির করেন এবং অর্থবিল হলে ঐ মর্মে একটি প্রমাণপত্র দেন।

(খ) সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন;

(গ) দলত্যাগ বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করা;

(ঘ) ৩৩-তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোন সদস্যের পদত্যাগ বলপূর্বক আদায় করা হয়েছে কি না তার অনুসন্ধান করা।

লোকসভার মর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতীক হলেন স্পীকার। যেহেতু লোকসভা সমগ্র জাতির প্রতিনিধি, সেহেতু স্পীকারও জাতীয় স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতীক। তাই দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে লোকসভার কার্যাদি পরিচালনা করা স্পীকারের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে স্পীকারের দলনিরপেক্ষতার কোন স্পষ্ট ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠে নি।

৭১.৯ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইন প্রণয়ন সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যদিও আইন প্রণয়ন ছাড়াও সংসদকে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। আইন প্রণয়নের জন্য আইনের খসড়া প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করতে হয়। আইনের এই খসড়া প্রস্তাবকে বিল (Bill) বলে। বিল প্রধানত দুরকমের ঃ (ক) সরকারি বিল (Govt Bill) এবং (খ) বে-সরকারি বিল (Private Member's Bill)। যে বিল কোন মন্ত্রী উত্থাপন করেন তাকে সরকারি বিল বলে; আর যে বিল সংসদের কোন সাধারণ সদস্য উত্থাপন করেন তাকে বে-সরকারি বিল বলে। বেশিরভাগ বিলই সরকারি বিল, অর্থাৎ কোন না কোন মন্ত্রী উত্থাপন করেন। সরকারি বিল আবার দু'রকম হতে পারে — অর্থবিল (Money Bill) ও সাধারণ বিল (Ordinary Bill)। তা ছাড়াও রয়েছে আর এক ধরনের বিল — সংবিধান সংশোধন বিল। কারণ সংবিধান সংশোধন করতে হলে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিল সংসদে উত্থাপন করতে হয়।

৭১.৯.১ সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধন বিল ও অর্থবিল ছাড়া বাকি সবই সাধারণ বিল। সাধারণ বিল, তা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক, সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। বে-সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য 'বে-সরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি'র সুপারিশ প্রয়োজন। কিন্তু সরকারি বিলের ক্ষেত্রে এ সবের দরকার হয় না। কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করা হবে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদনের পর প্রস্তাবাকারে সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করেন। যে কোন সাধারণ বিলকে সংসদে কয়েকটি স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। সংসদ কর্তৃক পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়। এই পর্যায়গুলি হল —

(১) উত্থাপন ও প্রথম পাঠ ঃ

সভার অনুমতি নিয়ে বিলের উত্থাপক বিলটি উত্থাপন করেন। এই পর্যায়ে বিলটির উপর কোন আলোচনা

বা বিতর্ক হয় না। শুধু বিলটির শিরোনাম পাঠ করা হয়। একেই বিলের প্রথম পাঠ বলা হয়। এরপর বিলটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় পাঠ ঃ

বিলটির প্রথম পাঠ শেষ হওয়ার কয়েকদিন পর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। দ্বিতীয় পাঠ বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, কারণ এই পর্যায়েই বিলটির নীতি, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর উপর বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিবেচনা হয়।

দ্বিতীয় পাঠের শুরুতে উত্থাপক বিলটিকে একটি সিলেক্ট কমিটিতে অথবা উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করতে পারেন। কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব ছাড়াও তিনি আরও দুটি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন—বিলটির উপর জনমত গ্রহণের জন্য পাঠানো, অথবা বিলটি সরাসরি সভা কর্তৃক বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিল সরাসরি কক্ষ কর্তৃক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয় এবং তার জন্য একটি দিন স্থির করা হয়।

(৩) কমিটি পর্যায় ঃ

কোনো বিলকে সিলেক্ট কমিটি বা যৌথ কমিটিতে পাঠানো হলে কমিটি বিলটির ধারা উপধারা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং প্রয়োজন মনে করলে বিলের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সংশোধন করার সুপারিশ করতে পারে। কমিটি বিলটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে, বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থের প্রতিনিধিদের মতামত শুনতে পারে। তবে কমিটি বিলটির মূল নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। বিলটির বিচার-বিবেচনার পর কমিটি তার সুপারিশ সম্বলিত একটি রিপোর্ট বিলটির উত্থাপক সভায় পেশ করে।

(৪) রিপোর্ট পর্যায় ঃ

কমিটির রিপোর্ট কক্ষে আসার পর বিলটির উত্থাপক যে কোন একটি বিকল্প প্রস্তাব করতে পারেন; (ক) কমিটির রিপোর্ট সহ বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাব; (খ) বিলটি পুনরায় সেই কমিটির কাছে কিংবা নতুন কোন কমিটির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব এবং (গ) জনমত গ্রহণের জন্য পাঠানোর প্রস্তাব। সাধারণত প্রথম প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং তখন বিলটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা হয়। এই পর্যায়ে বিভিন্ন ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় এবং তা নিয়ে আলোচনা হয় এবং ভোটাভুটির পর সভা কর্তৃক গৃহীত হয় অথবা প্রত্যাখ্যাত হয়।

(৫) তৃতীয় পাঠ ঃ

এই পর্যায়ে বিলের ধারা-উপধারার উপর কোন কোনরূপ আলোচনা বা বিতর্ক হয় না। কোনো সংশোধনীও

গৃহীত হয় না শুধুমাত্র কিছু মৌখিক পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এই পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা হয়।

সংসদের একটি কক্ষ কর্তৃক বিলটি গৃহীত হওয়ার পর অপর কক্ষে প্রেরণ করা হয়। সেই কক্ষেও বিলটিকে পূর্বোক্ত প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। অপর কক্ষ বিলটি সম্পর্কে তিনটির যেকোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে—

(ক) বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সেক্ষেত্রে উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থা দেখা দেবে।

(খ) কক্ষটি সংশোধন ছাড়াই বিলটিকে পাস করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হল। এরপর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য বিলটিকে পাঠানো হবে।

(গ) আর যদি বিলটির উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করে তাহলে ঐ সংশোধনে উভয় কক্ষের সম্মতি থাকতে হবে। তা নাহলে উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

উভয় কক্ষের মধ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১০৮(১) নং ধারা অনুসারে উভয় কক্ষের যুক্তি অধিবেশন আহ্বান করে বিতর্কিত বিলটি ভোটে দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলটি গৃহীত হলে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হল এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না। তিনি সম্মতি দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। অসম্মতি দিলে বিলটি আর আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতি সম্মতি বা অসম্মতি কোনোটিই না দিয়ে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে অর্থবিল ফেরত পাঠানো যায় না। পুনর্বিবেচনার পর বিলটি আবার যদি উভয়সভা কর্তৃক গৃহীত হয় তাহলে তাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকেন।

৭১.৯.২ অর্থবিল পাসের পদ্ধতি

অর্থবিল পাসের পদ্ধতি সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি থেকে কিছুটা আলাদা। সংবিধানের ১১০ নং, ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা আছে যে বিলের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কর সরকারি ঋণ, সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিকতা তহবিল বা এর যে কোন একটি বিষয় বা আনুষঙ্গিক বিষয় জড়িত থাকে তাকে অর্থবিল বলে। তবে সংবিধানে বলা আছে বিল অর্থবিল কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে লোকসভার স্পীকারে'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না, কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করতে হয় রাষ্ট্রপতির সুপারিশক্রমে। অর্থবিল মাত্রই সরকারি বিল। লোকসভায় অনুমোদিত হওয়ার পর অর্থবিল রাজ্যসভায় পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। অর্থবিলের ব্যাপারে রাজ্যসভার কোন ক্ষমতা নেই বললেই হয়। রাজ্যসভা

এই বিল প্রত্যাখ্যান করতে পারে না কিংবা সংশোধনও করতে পারে না। রাজ্যসভা অবশ্যই ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল অনুমোদন দেবে অথবা সুপারিশ পাঠাবে, যে সুপারিশ লোকসভার অনুমোদন সাপেক্ষ। ঐ ১৪ দিনের মধ্যে অর্থবিল রাজ্যসভা পাস না করলে কিংবা সুপারিশ লোকসভায় না পাঠালে ধরে নেওয়া হবে অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং অর্থবিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

৭১.৯.৩ সংবিধান সংশোধন বিল পাসের পদ্ধতি

সংবিধান সংশোধন করতে হলে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিল সংসদের যে কোন কক্ষে উত্থাপন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(ক) যে ধারাগুলি সংশোধন করতে হলে সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হয়। অর্থাৎ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতেই এই ধারাগুলির সংশোধন করা যায়। যে বিষয়গুলি এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় সেগুলি নতুন রাজ্য গঠন, রাজ্য পুনর্গঠন, রাজ্যের সীমানা কিংবা নাম পরিবর্তন, রাজ্য আইনসভা উচ্চকক্ষ গঠন বা বিলোপসাধন ইত্যাদি।

(খ) যে ধারাগুলি সংশোধন করতে হলে সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন (বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা) দরকার হয়। সংবিধানের মৌলিক অধিকার, নির্দেশাত্মক নীতিসহ সংবিধানের বেশিরভাগ অংশই এই পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়।

(গ) সংবিধানের কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলির সংশোধনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবকে সংসদের উভয় সভায় বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়ার পর বিলটিকে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার অন্তত অর্ধেকের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। এই বিষয়গুলি হল রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্য আইন ও শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি।

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সংসদ অথবা সংসদ ও রাজ্যবিধানসভাগুলি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার হয়। তবে সংবিধান সংশোধন বিলে রাষ্ট্রপতি অসম্মতি জ্ঞাপন করতে পারেন না।

৭১.১০ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের সংখ্যা ও জটিলতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বৃহৎ একটি আইনসভার পক্ষে আইন প্রণয়নের সমস্ত প্রস্তাব যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় না। আজকাল আইন প্রণয়নের দরকার বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও সম্যক বিচার-বিশ্লেষণ যা ভারতের সংসদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাই আইন

প্রণয়নের কাজে সংসদকে সাহায্য করার জন্য ভারতে সংসদীয় কমিটিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারতীয় সংসদে দু'প্রকার কমিটি আছে — স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং অস্থায়ী কমিটি (add hoc committee)। স্থায়ী কমিটিগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির। কিন্তু অস্থায়ী কমিটি কোন বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য গঠিত হয় এবং কাজ শেষ হলে কমিটিও ভেঙে যায়। লোকসভার স্থায়ী কমিটিগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল —

(১) আনুমানিক ব্যয় কমিটি (Estimates Committee) ঃ

সরকার যখন বাজেটের ব্যয়ের প্রস্তাব করে তখন এই কমিটি সেই ব্যয়ের হিসাবকে সরকারি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে ব্যয় সংক্ষেপের সুপারিশ করে।

এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে সাংগঠনিক উন্নতি, নৈপুণ্যবৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশও পেশ করে। এমনকি বিকল্প নীতিও সুপারিশ করতে পারে।

এই কমিটি ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কার্যকালের মেয়াদ ১ বছর। তবে সংসদে বাজেট অনুমোদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কমিটির কাজ শেষ হয়ে যায় না। এই কমিটি সারা বছর ধরে কাজ করে।

(২) সরকারি হিসাব পরীক্ষা (Public Accounts Committee) ঃ

সরকারি অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হল তা পরীক্ষা করে সরকারি হিসাব-পরীক্ষা কমিটি। এই কমিটির সদস্যগণ উভয় কক্ষ থেকে নির্বাচিত হন। লোকসভা থেকে ১৫ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ৭ জনকে নিয়ে মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। প্রথা অনুসারে বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়।

সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটির মূল কাজ হল সরকারের সকল ব্যয় ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করা। এই কমিটির দায়িত্ব হল সরকার যে ব্যয় করেছে সংসদ কর্তৃক সেই ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা হয়। যে বিষয়ের জন্য ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে সেই বিষয়ের জন্য ব্যয় করা হয়েছে কিনা এই কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখা। কমিটি নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের প্রতিবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে নিজস্ব মতামত একটা রিপোর্টের মাধ্যমে লোকসভার নিকট পেশ করে।

(৩) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Public Undertaking) ঃ

বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তা যেহেতু সরকারি অর্থ সেহেতু এই অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাটা লোকসভার দায়িত্ব। এই উদ্দেশ্য লোকসভা থেকে ১৫ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ৭ জন মোট ২২ জন সদস্য নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কাজ হল এই সংস্থাগুলির

রিপোর্ট এবং হিসাব পরীক্ষা করা এবং সংস্থাগুলির কার্যাবলী সঠিক ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা।

(৪) নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (Rulex Committee) ঃ

১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির দায়িত্ব হল লোকসভার কাজের পদ্ধতি এবং কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করা।

(৫) কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি (Business Advisory Committee) ঃ

এই কমিটির প্রধান কাজ হল লোকসভার বিভিন্ন বিলের এবং অন্যান্য কাজের সময় নির্ধারণ করা। তাছাড়া আলোচনার সময় কোন্ কোন্ বিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে বিষয়েও কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়।

(৬) বেসরকারি বিল বিষয়ক কমিটি (Committee on Private Member's Bill) ঃ

এই কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। কমিটির দায়ত্ব হল সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলের সকল বিষয় আলোচনার পর রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করা।

(৭) আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petition) ঃ

লোকসভার স্পীকার দ্বারা মনোনীত ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির কাজ হল বিল বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণ যে আবেদন করে তা বিবেচনা করে লোকসভায় পেশ করা।

(৮) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Privileges) ঃ

লোকসভার স্পীকার লোকসভা বা তার সদস্যদের অধিকারভঙ্গ জনিত কোন বিষয় যখন এই কমিটির কাছে পাঠান, কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির ভিত্তিতে অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কি না সে বিষয়ে বিবেচনার পর সভার নিকট সুপারিশ করে।

(৯) অধস্তন আইন বিষয়ক কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) ঃ

এই কমিটির কাজ হল শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উপ-আইন বিধি, উপ-বিধি সংসদ প্রদত্ত মূল আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না, মূল আইনে যে সমস্ত রক্ষাকবচগুলি আছে তা মেনে চলা হয়েছে কিনা এইসব খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেওয়া।

(১০) সরকারি প্রতিশ্রুতিসংক্রান্ত কমিটি (Committee on Govt. Assurances) ঃ

মন্ত্রীগণ লোকসভায় যে সব প্রতিশ্রুতি দেন সেগুলি কতখানি কার্যকর হয়েছে তা পর্যালোচনা করে এই কমিটি সভার নিকট রিপোর্ট পেশ করে। এই ধরনের কমিটি থাকার ফলে সরকারকে সাবধানে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।

এই সমস্ত স্থায়ী কমিটি ছাড়াও লোকসভায় কিছু অস্থায়ী কমিটি আছে যেমন বিলবিষয়ক সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills)। তাছাড়া উভয় কক্ষের যৌথ সংসদীয় কমিটি (Joint Parliamentary Committee)-র ব্যবস্থা আছে। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিতর্কিত বিয়ে তদন্ত করে দেখার জন্য এই ধরনের কমিটি গঠিত হয়। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভি.পি.সিং-এর রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে আনীত বোফর্স কেলেঙ্কারি অভিযোগের ভিত্তিতে যৌথ পার্লামেন্টারি কমিটি গঠিত হয়েছিল বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য। এই কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল।

ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভারও কতকগুলি কমিটি আছে। এই সকল কমিটি হল কার্যপরিচালনা বিষয়ক কমিটি, নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি, অধিকার বিষয়ক কমিটি ইত্যাদি। এইসব কমিটির সদস্যগণ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান দ্বারা মনোনীত হন।

৭১.১১ সংসদ এবং তার সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি

সংসদের প্রতিটি কক্ষ সমষ্টিগতভাবে এবং সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে যে সকল অধিকার ভোগ করেন তাকে সংসদের বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি (Privilege and Immunities) বলে। এই সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ছাড়া কোন আইনসভার সদস্যদের পক্ষে তাদের কাজকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

সংবিধানের ১০৫ নং ধারায় সংসদ এবং সংসদের সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। মূল সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে সংসদের এই অধিকার নির্ধারণ করে সংসদ আইন প্রণয়ণ করতে পারবে। তবে যতদিন পর্যন্ত তা নির্ধারণ না করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্রিটেনের কমন্স সভা এবং তার সদস্যগণ ও কমিটিগুলি যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ভারতের সংসদ, তার উভয় কক্ষের সদস্যগণ এবং কমিটি সমূহ সেই অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে একটি বিদেশী শাসন ব্যবস্থার সরাসরি উল্লেখ বিতর্কের সৃষ্টি করে। পরে ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪ তম সংশোধনের মাধ্যমে কমন্সসভার উল্লেখ বাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এই সংশোধন কার্যকর হওয়ার আগে যে সব অধিকার ও অব্যাহতি সংসদসদস্যরা ভোগ করতেন তাঁরা তাই ভোগ করতে থাকবেন।

সংসদের সদস্যগণ বর্তমানে যে অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — সদস্যদের ব্যক্তিগত অধিকার ও অব্যাহতি এবং সংসদের প্রত্যেক কক্ষের যৌথ অধিকার ও অব্যাহতি।

(ক) সংসদের প্রতিটি কক্ষের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে যে অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন তা হলো —

(১) বাক্ স্বাধীনতা ঃ

সংবিধানের ১০৫ (১) এবং (২) নং ধারা অনুসারে সংসদের প্রত্যেক সদস্যের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে। তবে এই মত প্রকাশের অধিকার সংবিধান ও সংসদের কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম ও স্থায়ী নির্দেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাছাড়া, সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করা হলেও সদস্যগণ হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের আচরণ সম্পর্কে কোন সমালোচনা করতে পারেন না, একমাত্র বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় ছাড়া।

'সার্চলাইট' মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ঘোষণা করে যে সংবিধানের ১৯(২) নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারের উপর যে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে সেগুলি থেকে ১০৫ নং ধারায় বর্ণিত মত প্রকাশের স্বাধীনতা মুক্ত থাকবে।

সংসদের অভ্যন্তরে কিংবা কোন কমিটিতে বক্তৃতাপ্রদান কিংবা ভোটদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না।

(২) গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার ঃ

সংসদের কোন কক্ষ কিংবা কমিটির অধিবেশন শুরু হওয়ার ৪০ দিন পূর্বে এবং অধিবেশন শেষ হওয়ার ৪০ দিনের মধ্যে দেওয়ানি অভিযোগের দায়ে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে ফৌজদারী অভিযোগ কিংবা নিবর্তনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে না।

(৩) জুরির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ঃ

বিচারের সময় জুরির দায়িত্ব পালনের জন্য সংসদের কোন সদস্যকে বাধ্য করা যায় না।

(খ) সংসদের যৌথ অধিকার ও অব্যাহতি ঃ

যৌথভাবে সংসদের অধিকার ও অব্যাহতি হল—

(১) বিতর্ক ও কার্যবিবরণী প্রকাশের এবং প্রকাশে বাধা দেবার অধিকার সংসদের আছে। আবার দরকার মনে করলে অন্য কাউকে ঐ সমস্ত প্রকাশ করতে বাধা দিতে পারে। সভার কার্যবিবরণী থেকে কোন বক্তব্য বা বক্তৃতা স্পীকার বা সভাপতি বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। সেই সমস্ত বক্তব্য কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে কিংবা সংসদের ঘটনাবলী বিকৃতভাবে প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক বা প্রকাশকের বিরুদ্ধে সংসদ অবমাননার অভিযোগ আনা যায়।

(২) প্রয়োজনে সংসদের প্রতিটি কক্ষ বহিরাগত ব্যক্তিদের উপস্থিতির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

(৩) সভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সংসদের প্রতিটি কক্ষ আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মকানুন রচনা এবং সেগুলি কার্যকর করার অধিকার প্রতিটি কক্ষের আছে।

(৪) সভার কার্য পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টির কিংবা অশোভন আচরণের জন্য সংসদের প্রতিটি কক্ষ স্পীকার কিংবা সভাপতির মাধ্যমে কোন সদস্যকে তিরস্কার কিংবা সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করতে পারে। আবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলপূর্বক সভাকক্ষে এনে সংসদের যে কোন কক্ষ তীব্র ভৎর্সনা করতে কিংবা কারাগারে আটক রাখতে পারেন। সভার অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। সংসদের অবমাননার জন্য প্রদত্ত শাস্তির বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই। এমনকি সংসদের অভ্যন্তরে কোন সদস্যের মতামত কিংবা সভার কার্যপ্রণালী আদালতের বিচার্য বিষয় নয়।

সংসদের অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা স্থির করে একমাত্র সংসদের সংশ্লিষ্ট সভা।

সংসদের অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করার কথা সংবিধানের ১০৫(৩) নং ধারায় উল্লেখ থাকলেও এগুলি বিধিবদ্ধ করা উচিত কি না এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। এই অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ করা হলে সংসদের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়বে বলে অনেকে মনে করেন কারণ সেক্ষেত্রে সেগুলি বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপের আওতায় পড়বে। সুতরাং এগুলি লোকসভার স্পীকার এবং রাজ্যসভার সভাপতির হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে, অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ না করাটাই সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে অনেকে মনে করেন।

৭১.১২ ভারতীয় সংসদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা

বিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম আইনসভা, কারণ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে, সংশোধন করতে কিংবা বাতিল করতে পারে এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা কোন আদালতের নেই। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস একটি অ-সার্বভৌম আইনসভা, কারণ সুপ্রিম কোর্টকে কংগ্রেসের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইন সংবিধান বিরোধী কিংবা স্বাভাবিক ন্যায়নীতি বিরোধী এই কারণে বাতিল করে দিতে পারে।

ভারতের সংসদ ব্রিটিশ সংসদের মত সার্বভৌম আইনসভা নয়, কারণ সুপ্রিম কোর্ট সংসদ প্রণীত আইন সংবিধান বিরোধী এই কারণে বাতিল করে দিতে পারে যদিও স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবিরোধী এই কারণে বাতিল করতে পারে না।

আবার ভারতের সংবিধান লিখিত। এই লিখিত সংবিধান দ্বারা সংসদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সংবিধাননির্দিষ্ট এই গণ্ডীর মধ্যে থেকেই সংসদকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু ব্রিটেনের

সংবিধান অলিখিত হওয়ায় পার্লামেন্টপ্রণীত আইনই সংবিধানের এক বড় উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়।

পরিশেষে, ভারতের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হওয়ায় রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ ও রাজ্যআইনসভার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত হয়। এরফলে কোন আইন সভাই এককভাবে আইন প্রণয়নের সকল ক্ষমতার অধিকার নয়।

এই সমস্ত কারণে ভারতের সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম আইনসভা হয়ে উঠতে পারে নি। তবে ভারতীয় সংবিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মত দুষ্পরিবর্তনীয় না হওয়ায় মোটামুটি সহজভাবেই সংবিধানের যে কোন বিষয় (সংবিধানের মৌল কাঠামো বাদে) সংশোধন করে নিতে পারে। সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংসদ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অকার্যকর করে দিতে পারে। যেমন—গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে না, কারণ ১৩(২) নং ধারায় তা নিষেধ করা আছে। কিন্তু সংসদ ২৪ তম সংবিধান সংশোধন করের পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে সংসদ মৌলিক অধিকারসহ সংবিধানের যে কোন বিষয় সংশোধন করতে পারবে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে আদালতের চরম প্রাধান্যও স্বীকার করা হয় নি। ভারতের সংসদ সংবিধাননির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

৭১.১৩ সংসদের ক্ষমতা হ্রাস

বিভিন্ন কারণে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এই কারণগুলি হল—

(১) সংসদের ক্ষমতাহ্রাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হল অর্পিত আইনের (Delegated Legislation) সংখ্যা ও পরিধিবৃদ্ধি। বর্তমানের জনকল্যাণকর রাষ্ট্র এত বেশি সংখ্যায় আইন প্রণয়ন করতে হয় এবং আইন প্রণয়নে এত বেশি মাত্রায় বিশেষ আইনের দরকার হয় যে সময় ও জ্ঞানের অভাবে সংসদের পক্ষে এককভাবে এই সমস্ত আইন সম্পূর্ণভাবে প্রণয়ন করতে পারে না। তাই সংসদ আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে দেয় এবং আইনটির পরিপূর্ণরূপ দেওয়ার ভার শাসনবিভাগের উপর অর্পণ করে। এই সমস্ত আইনগুলিকেই অর্পিত আইন বলে। সুতরাং আইনের প্রস্তাবগুলিতে এমন ব্যবস্থা থাকে যার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত নিয়মকানুন বা উপ-আইন তৈরি করে নিতে পারে। সুতরাং অর্পিত আইন বহুলাংশে সংসদের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

(২) তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় সংসদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটই সংসদের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। সংসদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন হলেও এ ব্যাপারে মন্ত্রীরাই সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রায় সমস্ত বিলই মন্ত্রীরাই উত্থাপন করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিলগুলি সহজেই পাস হয়ে যায়। দলীয় নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতার জন্য সাধারণ সদস্যরা বিলটির পক্ষে ভোট না দিয়ে পারেন না। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়েও সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে

থাকেন। বস্তুত, সংবিধানে সংসদের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সে সব ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার রূপান্তরিত হয়েছে। তাই অনেকে অভিযোগ করেন যে ব্রিটেনের মত ভারতেও ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) বর্তমানে ভারতের সংসদে অযোগ্য সদস্যদের আধিক্য, সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন আচরণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিচার বিবেচনার সময় মন্ত্রীদের এবং সদস্যদের অনুপস্থিতি, সংসদের প্রতি কোন কোন প্রধানমন্ত্রীর চরম অবহেলার মনোভাব, অনেক ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি প্রায়ই সংসদে আলোচনা ছাড়াই গ্রহণ — এ সবই বর্তমান ভারতের পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলি নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে।

৭১.১৪ সারাংশ

ভারতের পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থা সংসদের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদের মাধ্যমেই ভারতীয় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। ভারতের সংসদ দ্বি—কক্ষবিশিষ্ট —উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা এবং নিম্নকক্ষ লোকসভা এই দুটি কক্ষ নিয়ে সংসদ গঠিত। অনধিক ২৫০ জন সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত। এরমধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। বাকি সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ। সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হলেও প্রতি দু'বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন, এবং শূন্য পদগুলির জন্য নির্বাচন হয়। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ৫৫২। এই সভা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত। তবে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি একে ভেঙে দিতে পারেন। সভার সভাপতিত্ব করার জন্য সদস্যগণ একজনকে স্পীকার এবং আর একজনকে ডেপুটি স্পীকারপদে নির্বাচিত করেন। স্পীকার সভার কাজ পরিচালনা করেন, সভার শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করেন, সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং অর্থবিল নির্ধারণ করেন।

সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিভিন্ন; যেমন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা, আইন প্রণয়ন করা, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, জাতীয় অর্থের তদারকি করা, সংবিধান সংশোধন করা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও অপসারণ করা ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রে দুটি কক্ষকে সমান ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নি। অর্থবিষয়ক ক্ষমতা এবং মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করার ক্ষমতা একমাত্র লোকসভাকে দেওয়া হয়েছে। অর্থবিল ছাড়া যে কোন সাধারণ বিল উভয় কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং

উভয় কক্ষ কর্তক অনুমোদিত হলে তবেই তা আইনে পরিণত হয়। সাধারণ বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহুত উভয় কক্ষের এক যৌথ অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তার নিষ্পত্তি হবে।

অর্থবিল ও বাজেট লোকসভায় উত্থাপিত হয়। রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। আনুমানিক ব্যয় কমিটি, সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটি করে লোকসভা সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করে।

সাধারণভাবে লোকসভার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও সংবিধান জাতীয় স্বার্থে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব এবং সর্বভারতীয় কৃত্যক গঠনের প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা রাজ্যসভাকে দিয়েছে।

সংসদে আইন প্রণয়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। বিলের প্রকারভেদে এই পদ্ধতির কিছুটা হের-ফের হয়। সংসদে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিল উত্থাপিত হয়। বিলটি উভয় কক্ষে কতকগুলি পর্যায় অতিক্রম করার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়। আইন প্রণয়নের কাজ পরিচালিত হয় সংসদের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে। কমিটিগুলি বিলের বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করে সংসদকে সাহায্য করে।

সংসদের প্রতিটি কক্ষ এবং সদস্যগণ কতকগুলি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে যেমন — বাকস্বাধীনতা, গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার, অধিকার ভঙ্গের জন্য শাস্তিদান ইত্যাদি।

ভারতের সংসদের সঙ্গে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং রাজ্য আইনসভার সম্পর্ক আলোচনা করলে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রকৃতি সহজেই অনুধাবন করা যায়।

ভারতের পার্লামেন্টীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভাকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত, যদিও শাসন বিভাগের একটি অরাজনৈতিক অংশও আছে যা গঠিত হয় সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের নিয়ে। রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করে তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের সংসদের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রীসভার কার্যকাল নির্ভর করে লোকসভার আস্থার উপর। বিভিন্ন সংসদীয় উপায়ে লোকসভা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অবশ্য মন্ত্রীসভার পেছনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকলে মন্ত্রীসভাই সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ভারতের আদালতসমূহের স্থাপন, গঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের আছে। সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে হাইকোর্ট আছে, তবে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ হাইকোর্ট স্থাপন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে বিচারবিভাগ

সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনকে বাতিল করে দিতে পারে। বিচারবিভাগ যখন সংসদের কোন আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে তখন সংসদ সেই আইনের ত্রুটি দূর করে পুনরায় সেই আইন পাস করতে পারে অথবা সংবিধান সংশোধন করে আগের বাতিল করা আইনটিকেই পুনরায় পাস করে বৈধ করে নিতে পারে।

ভারতে সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সংসদের প্রাধান্য স্বীকৃত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তিনটি তালিকার মাধ্যমে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে — কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা ও অবশিষ্ট বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য আইনসভার হলেও সংসদ কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় এই বিষয়গুলির উপরেও আইন প্রণয়নের অধিকারী।

ভারতের সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম আইনসভা নয়; আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের মত অত্যন্ত দুর্বল আইনসভাও নয় যার, আইনের বৈধতা নির্ভর করে সুপ্রিম কোর্টের উপর। মর্যাদার দিক থেকে ভারতের সংসদ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মার্কিন কংগ্রেসের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। ভারতের লিখিত সংবিধান সংসদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এই নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সংসদ সার্বভৌম। সংসদ সংবিধানের যে কোন ধারা মোটামুটি সহজেই পরিবর্তন করতে পারে, যদিও সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না (১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়)।

পরিশেষে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতা ও মর্যাদা নানা কারণে হ্রাস পেয়েছে। তাহলেও সংসদ ভারতীয় রাজনীতির এক অদ্বিতীয় মঞ্চ যেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয় এবং সরকারি নীতি ও কাজকর্মের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হয়।

৭১.১৫ অনুশীলনী

(১) রাজ্যসভার গঠন আলোচনা করুন।

(২) অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ক্ষমতা কি?

(৩) রাজ্যসভার দুটি অনন্য ক্ষমতা উল্লেখ করুন।

(৪) সংসদের দুটি কক্ষের মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৫) সংসদের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন কখন অনুষ্ঠিত হয়?

(৬) সংসদে সংবিধান সংশোধন বিল কিভাবে পাস হয়?

(৭) সংসদ ও তার সদস্যদের বিশেষ অধিকার ব্যাখ্যা করুন।

(৮) শাসনতান্ত্রিক মর্যাদার প্রশ্নে ভারতের সংসদের সঙ্গে ব্রিটেনের পার্লামেন্টের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের তুলনা করুন।

(৯) সংসদের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ কি?

৭১.১৬ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Subhash C. Kashyap, *Our Parliament,* National Book Trust, India, 1989, New Delhi.

(২) S. L. Sikri, *Indian Government and Politics,* Kalyani Publishers, 1989, New Delhi.

(৩) নিমাই প্রামাণিক, ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, ১৯৯৭ কলকাতা।

একক ৭২ ❐ ভারতের বিচার বিভাগ

গঠন

৭২.০ উদ্দেশ্য

৭২.১ প্রস্তাবনা

৭২.২ ভারতের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৭২.৩ ভারতের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

৭২.৪ সুপ্রিম কোর্ট

- ৭২.৪.১ গঠন ও নিয়োগ
- ৭২.৪.২ যোগ্যতা
- ৭২.৪.৩ কার্যকাল ও অপসারণ
- ৭২.৪.৪ বেতন ও ভাতা
- ৭২.৪.৫ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা
- ৭২.৪.৬ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
  - (১) মূল এলাকা
  - (২) আপীল এলাকা
  - (৩) পরামর্শদান এলাকা
  - (৪) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার এলাকা
  - (৫) অন্যান্য ক্ষমতা
- ৭২.৪.৭ বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা
- ৭২.৪.৮ সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

৭২.৫ হাইকোর্ট

৭২.৬ অধস্তন আদালত

৭২.৭ সারাংশ

৭২.৮ অনুশীলনী

৭২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা ভারতের বিচার ব্যবস্থার গঠন, এলাকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে এই এককে তা হল—

- ভারতের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো
- সুপ্রিম কোর্টের গঠন, এলাকা ও কার্যাবলী
- হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালতের কার্যাবলী

৭২.১ প্রস্তাবনা

সংবিধানপ্রনেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে যতটা যত্নবান ছিলেন বিচারব্যবস্থা রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বিচারব্যবস্থাকে মৌলিক অধিকারেরই একটা সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে দেখেছেন, কারণ একমাত্র নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচার ব্যবস্থাই মৌলিক অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের অস্তিত্ব অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। এই আদালত স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টই এই ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার বিভাগের, স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই এককে আমরা বিচার বিভাগের গঠন, বিচারকদের নিয়োগ যোগ্যতা, কার্যকাল, বেতন-ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। এই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মূল, আপীল ও পরামর্শদান এলাকা সহ অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং হাইকোর্ট ও অধস্তন আদালতগুলির এক্তিয়ার নিয়েও আমরা আলোচনা করবো।

৭২.২ ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ভারতের বিচার ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয়, শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে দ্বৈত বিচারব্যবস্থা অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য আলাদা আলাদা বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অখণ্ড বিচারব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই গোটা ব্যবস্থার শীর্ষে আছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নীচে আছে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট এবং প্রত্যেক হাইকোর্টের নীচে আছে অন্যান্য অধস্তন আদালত। অখণ্ড

(২) সমগ্র দেশে একই ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারী আইন অনুসারে বিচার কার্য সম্পাদিত হয়।

(৩) ভারতের বিচার ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট শীর্ষস্থানে অবস্থিত হলেও তার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের

তুলনায় বহুলাংশে সীমিত। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র আইনের পদ্ধতিগত দিক বিচার করতে পারে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় ও আইনের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে না। তাছাড়া সংসদ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায় অতিক্রম করতে পারে।

(৪) ভারতে সাধারণভাবে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের' নীতি গৃহীত হলেও সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যকালকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা আছে। স্বপদে থাকাকালীন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না। সংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য তা কোন আদালতের কাছে দায়িত্ববদ্ধ নন।

(৫) ভারতে পূর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত না হলেও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত রাখার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে।

(৬) ভারতের বিচার-ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল এবং সময় সাপেক্ষ।

(৭) ভারতের জুরির সাহায্যে বিচারের নীতি গৃহীত হয় নি।

৭২.৩ ভারতে বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

সুপ্রিম কোর্ট

রাজ্যের হাইকোর্টসমূহ

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জুডিসিয়াল কমিশনারের আদালত

জেলা আদালত ও দায়রা জজের আদালত

বৃহৎ প্রেসিডেন্সি শহরের আদালত

দেওয়ানি সাব-জজের আদালত

ছোট আদালত

ফৌজদারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

দেওয়ানির ক্ষুদ্র আদালত ফৌজদারী আদালত

মুন্সেফের আদালত

ন্যায় পঞ্চায়েত

সাব-জজের আদালত

পঞ্চায়েত আদালত

বেতনভোগী বিচারপতিদের আদালত

অবৈতনিক বিচারপতিদের আদালত

৭২.৪ সুপ্রীম কোর্ট

ভারতের ক্রম-স্তর-বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট সমেত ভারতের সকল স্তরের অন্যান্য আদালতের মেনে নিতে হয়। এর রায় আইন হিসাবে গণ্য হয়। সংবিধানের ১২৪ নং - ১৪৭ নং ধারাগুলিতে সুপ্রীম কোর্ট সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৭২.৪.১ গঠন ও নিয়োগ

সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের সংখ্যা স্থির করে। বর্তমানে ১ জন প্রধান বিচারপতি এবং ২৫ জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। এই ২৬ জন বিচারপতি ছাড়াও সংবিধানে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারক নিয়োগের আগে তাঁকে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে মনে করবেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। তবে অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের সময় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক। তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মত, প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুসারেই চলেন।

৭২.৪.২ যোগ্যতা

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হতে গেলে প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং তাঁকে কমপক্ষে ৫ বছর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা অন্তত ১০ বছর হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে অথবা রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে।

৭২.৪.৩ কার্যকাল ও অপসারণ

সুপ্রীমকোর্টের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন যদি না কোন বিচারপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চান।

সংবিধানে বিশেষ কারণে বিচারককে অপসারণ করার ব্যবস্থা আছে। অসদাচরণ বা অসামর্থের অভিযোগ সংসদের উভয় সভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারেন।

৭২.৪.৪ বেতন ও ভাতা

বিচারপতিদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি পার্লামেন্টে প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্থিরীকৃত। ১৯৮৩ সালে প্রণীত

৫৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ যথাক্রমে মাসিক ১০,০০০ ও ৯০০০ টাকা বেতন এবং অবসরকালে মাসিক ৫০০০ ও ৪০০০ টাকা পেনশন পান। তাছাড়া অন্যান্য ভাতা এবং বিনা ভাড়ায় সরকারি বাসভবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরা ভোগ করেন।

৭২.৪.৫ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর। বিচারকগণ নির্ভীক, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন না হলে তাঁদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। সেজন্য ভারতের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য সংবিধান কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে— (১) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ যাতে রাজনীতি-মুক্ত ও পক্ষপাতশূন্য হতে পারে সেজন তাঁদের নিয়োগের ভার রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির এই নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা আবার বিচারবিভাগীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগের ব্যাপারে বিচারবিভাগের সঙ্গেই পরামর্শ করতে হয়।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিচারপতিদের যোগ্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই প্রলোভন ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভারতের সংবিধানের ১২৪ (৩) ধারায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে বিচারপতিকে হাইকোর্টে বিচারপতি হিসাবে কাজ করার ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অর্থাৎ বিচারকদের বিচার-বিভাগীয় অভিজ্ঞতা ও আইনগত যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(৩) কার্যকালের স্থায়িত্ব ব্যতীত বিচারপতিদের পক্ষে নির্ভীকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সেজন্য ভারতের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বর্ণিত আছে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৫ বছর এবং এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ৬২ বছর পর্যন্ত স্বপদে আসীন থাকেন। একমাত্র প্রমাণিত অসদাচরণ কিংবা অসামর্থ্য-জনিত কারণে আনীত ইম্‌পিচমেন্ট প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা গৃহীত হলে তবেই কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দ্বারা অপসারিত হবেন।

(৪) বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা তাঁদের বেতনভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর অনেকাংশে নির্ভশরশীল। তাঁদের আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে না পারলে তাঁরা শাসন বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। ভারতের সংবিধান এব্যাপারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিচারকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয় পার্লামেন্টের

অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ঐ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। তাছাড়া বিচারকদের বেতন ও ভাতা সাধারণ অবস্থায় হ্রাস করা যায় না।

(৫) অবসর গ্রহণের পর সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারপতি ভারতের কোন আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া অবসর গ্রহণের পর কোন সরকারি পদে তাঁরা নিযুক্ত হতে পারেন না।

৭২.৪.৬ সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা—(ক) মূল এলাকা (খ) আপীল এলাকা (গ) পরামর্শদান এলাকা, (ঘ) নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার এলাকা।

(১) মূল এলাকা ঃ সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দ্বৈত সরকারি ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের আইনগত ক্ষমতা সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে। সংবিধানের ১৩১ নং ধারা অনুসারে আইনগত অধিকারের প্রশ্নে উভয় সরকারের মধ্যে কিংবা দুটি রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা বিচারের অনন্য ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে সুপ্রীম কোর্ট ঐ সব যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধের মীমাংসা করে।

(২) আপীল এলাকা ঃ সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। এই আদালতের আপীল এলাকাকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়—

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপীল ঃ কোন মামলা সম্পর্কে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে, সংশ্লিষ্ট মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহলে সেই মামলার বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। হাইকোর্ট সার্টিফিকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্ট নিজেই আপীল করার বিশেষ অনুমতি দিতে পারেন।

(খ) দেওয়ানি আপীল ঃ কোন দেওয়ানি মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে প্রমাণপত্র দেন যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির সঙ্গে আইনের প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রশ্ন জড়িত আছে তাহলে তা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়। সংবিধানের ৩০-তম সংশোধন (১৯৭২) এর আগে দেওয়ানি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের আপীলের ক্ষেত্রে মামলাটির ক্ষেত্রে অন্তত ৩০ হাজার টাকা মূল্যের প্রশ্ন জড়িত থাকা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, কোন দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রীম কোর্টে হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করলে সেই মামলা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়।

(গ) ফৌজদারি আপীল ঃ সংবিধানের ১৩৪ নং ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে তিনটি ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়, ডিগ্রি বা চূড়ান্ত আদেশ এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা যায়—(ক) নিম্নতম আদালতের বিচারে নির্দোষ বলে ঘোষিত কোন ব্যক্তিকে যদি হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিংবা

(খ) নিম্ন আদালতে বিচারচলাকালীন কোন মামলা নিজের হাতে তুলে নিয়ে হাইকোর্ট যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন, অথবা (গ) হাইকোর্ট কোন মামলাকে সুপ্রীম কোর্টের নিটক আপীলযোগ্য বলে যদি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

(ঘ) ভারতের যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যে কোন রায়, আদেশ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার 'বিশেষ অনুমতি সুপ্রীম কোর্ট প্রদান প্রদান করতে পারেন।

(৩) **পরামর্শদান এলাকা ঃ** সংবিধানের ১৪৩ নং ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শমূলক এক্তিয়ার আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান সংক্রান্ত ক্ষমতাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—(ক) রাষ্ট্রপতি মনে করলে আইনের যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মতামতের জন্য সুপ্রীম কোর্টে তিনি তা পাঠাতে পারেন; (খ) প্রচলিত যে সমস্ত সন্ধি, চুক্তি, সদস্য যা সংবিধান চালু হওয়ার আগে সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

(৪) **নির্দেশ, আদেশ ও লেখ জারি করার ক্ষমতা ঃ** সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩২ নং ধারা অনুসারে বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ ইত্যাদি লেখ, নির্দেশ বা আদেশ (Write) জারি করতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের এই সমস্ত এলাকা, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা ছাড়াও আরও কতকগুলি ক্ষমতা আছে, যেমন—সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় দেওয়া যে কোন রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। যেমন—সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে বলে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল শঙ্করী প্রসাদ (১৯৫১) ও সজ্জন সিং (১৯৬৫)-এর মামলায়, সে রায় সুপ্রীম কোর্ট গোলকনাথ মামলায় (১৯৬৭) পুনর্বিবেচনা করে রায় দেয় যে ভবিষ্যতে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে না। আবার কেশবানন্দ ভারতী মামলায় (১৯৭৩) সুপ্রীম কোর্ট এই রায় পুনর্বিবেচনা করে রায় দেয় যে সংসদের হাতে মৌলিক সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে। তবে সে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ সংশোধনের মাধ্যমে সংসদ সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করতে পারবে না।

এ ছাড়া আদালতের অবমাননার জন্য সুপ্রীম কোর্ট অবমাননাকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৭২.৪.৭ বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) বলতে আদালতের এমন এক ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা আদালত আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ বা নির্দেশ সংবিধানবিরোধী

এই কারণে বাতিল করে দিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টেরও এই ক্ষমতা আছে। সুপ্রীম কোর্টই সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইন ও আদেশের বৈধতা বিচার, কেন্দ্র রাজ্যের বিরোধমীমাংসা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষ করে ৪২ তম সংশোধন (১৯৭৬) এর মাধ্যমে সংসদ সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছে।

৭২.৪.৮ সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকা

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও সাংবিধানিক বিরোধ সহ বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করে; সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ-নির্দেশ সংবিধানসম্মত না হলে সেটিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট মৌলিক অধিকারের বিরোধী সমস্ত আইনকে বাতিল করে দিয়ে নাগরিক-অধিকার সুনিশ্চিত করে।

৭২.৫ হাইকোর্ট

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। অবশ্য সংসদ আইন প্রণয়ন করে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট স্থাপন করতে পারে।

(১) গঠন ঃ একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য কয়েকজন বিচারপতিকে নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে। অন্যান্য বিচারপতির সংখ্যা কত হবে তা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করবেন।

(২) নিয়োগ ঃ হাইকোর্টের বিচারপতিরগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তাঁকে পরামর্শ করতে হয়। অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁকে এ ছাড়াও সেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরমার্শ করতে হয়।

(৩) কার্যকাল ও অপসারণ ঃ হাইকোর্টের একজন বিচারক ৬২ বছর পর্যন্ত পদে আসীন থাকতে পারেন। তবে বিভিন্ন কারণে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদ খালি হতে পারে—(ক) পদত্যাগ, (খ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্তি অথবা বদলি অথবা (গ) অসাধারণ কিংবা অসামর্থ্য-র অভিযোগ সংসদের উভয় কক্ষে মোট সদস্যের অধিকাংশ ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা সমর্থিত হলে রাষ্টপতি কর্তৃক অপসারণ।

(৪) বেতন ভাতা ইত্যাদি ঃ হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি মাসিক ৯০০০ এবং অন্যান্য বিচারপতি মাসিক ৮০০০ টাকা বেতন পান। বিচারপতিদের বেতন-ভাতা আর্থিক জরুরী অবস্থা ছাড়া অন্য সময়ে হ্রাস করা যায় না।

(৫) যোগ্যতা ঃ হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যোগ্যতাবলীর প্রয়োজন তা হল—

(ক) ভারতীয় নাগরিকত্ব; এবং

(খ) ভারতে যে কোন বিচারবিভাগীয় পদে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা (গ) হাইকোর্টে ১০ বছরের এ্যাডভোকেট হিসাবে অভিজ্ঞতা।

(৬) বিচারকদের স্বাধীনতা ঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের মত হাইকোর্টের বিচারকদেরও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবিধান কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) কেবলমাত্র প্রমাণিত অসদাচরণ ও অক্ষমতার কারণে সংসদের উভয় কক্ষে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত ইম্‌পিচমেন্ট প্রস্তাবের পর রাষ্ট্রপতি একজন হাইকোর্টের বিচারককে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করতে পারেন।

(খ) হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও ভাতা বাবদ যে ব্যয় হবে তা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হত।

(গ) বিচারকদের বেতন ও ভাতা আর্থিক জরুরী অবস্থা ছাড়া হ্রাস করা যায় না।

(৭) হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

(ক) মূল এলাকা ঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ৪২তম সংবিধান সংশোধন (১৯৭৬) এই ক্ষমতা হাইকোর্টের হাত থেকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ট্রাইব্যুনালের হাতে দিলেও ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) আবার তা হাইকোর্টের ফিরিয়ে দিয়েছে।

(খ) আপীল এলাকা ঃ হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

(গ) নির্দেশ, আদেশ লেখ জারির ক্ষমতা ঃ হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ, আদেশ বা লেখ (Writ) জারি করতে পারে (২২৬ নং ধারা)। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ছাড়াও অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট ঐসব নির্দেশ জারি করতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে অর্পিত হয় নি।

(ঘ) আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ঃ হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করতে

পারে। ৪২ তম সংশোধন আইনে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতার উপর যে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল, ৪৩ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তা অপসারণ করা হয়েছে।

(ঙ) তত্ত্বধানমূলক ক্ষমতা ঃ প্রত্যেক হাইকোর্ট তার এক্তিয়ারভুক্ত গোটা এলাকার সমস্ত আদালত ও ট্রাইব্যুনালের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা আছে। তবে কোন সামরিক ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্টের এই ক্ষমতা নেই।

এই কোর্ট অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঐ সমস্ত আদালতগুলির বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন রচনা করতে পারে।

এ সব কার্যাবলী ছাড়াও হাইকোর্টকে অভিলেখ আদালতক (Court of Record) হিসাবে কাজ করতে হয়, এবং নিজের অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

৭২.৬ অধস্তন আদালতসমূহ

হাইকোর্টের নিম্নে বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব অধস্তন আদালত-সমূহের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। এই অধস্তন আদালতগুলির গঠন ও নাম রাজ্যভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

অধস্তন বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত দিক থেকে সর্বনিম্নে অবস্থিত ন্যায়-পঞ্চায়েত। ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারপতিগণ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা মিউনিসিপ্যালিটির কোন সদস্য ন্যায় পঞ্চায়েতের বিচারপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। ন্যায় পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের ছোট খাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

ন্যায় পঞ্চায়েতের ঊর্ধ্বতন দেওয়ানি আদালত হল মুন্সেফ আদালত। মহকুমা ও জেলা শহরে এরূপ আদালতের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মুন্সেফ আদালতের উপর আছে সাব-জজের আদালত। মুন্সেফ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সাব-জজের আদালতে আপীল করা যায়। আদালতের মূল এলাকা ও আপীল এলাকা আছে। অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের টাকার দাবি-সমন্বিত মামলা মূল এলাকায় হয়।

সাব-জজের ওপরে রয়েছে জেলা জজের আদালত। জেলার সর্বোচ্চ বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা জজ। সাধারণত প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা জজের আদালত থাকে। এই আদালতের মূল এলাকা এ আপীল এলাকা রয়েছে।

বড় বড় শহরে ছোট খাটো মামলা বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Courts) আছে। এ

ছাড়া কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশেষ ধরনের মামলার বিচারের জন্য নগর দেওয়ানি আদালত (City Civil Courts) গঠন করা হয়েছে।

জেলা শহরে ফৌজদারি মামলার জন্য সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হলেন দায়রা জজ। জেলা জজই দায়রা জজ হিসাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। জেলার আয়তন অনুসারে একাধিক দায়রা জজও থাকতে পারেন।

কলিকাতার মত মেট্রোপলিটান শহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আছেন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে একমাত্র হাইকোর্টেই আপীল করা যায়। সংবিধানের ২৩৩ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যপাল জেলা জজ, দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা করেন।

শীর্ষে সুতরাং ভারতের ক্রমস্তর-বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে ন্যায় পঞ্চায়েত।

৭২.৭ সারাংশ

ভারতের বিচার-ব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী এবং বিচারপতিদের নিয়োগ, যোগ্যতা কার্যকাল, বেতন-ভাতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার উপায়সমূহ সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত আছে।

ভারতের ক্রমস্তর, পিরামিড-সদৃশ অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রীম কোর্ট, তারপর হাইকোর্ট এবং হাইকোর্টের নীচে অধস্তন আদালত আছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখে, সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি এবং মূল এলাকার সাংবিধানিক বিরোধসহ বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করে। সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সংসদ-প্রণীত আইন ও শাসন বিভাগের আদেশ-নির্দেশ সংবিধানে সম্মত না হলে তা বাতিল করে দিয়ে সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা করে। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের বিরোধী সমস্ত আইন বাতিল করে দিয়ে নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করে।

সুপ্রীম কোর্টের নীচে সাধারণত প্রতিটি রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট আছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্গত। তাছাড়া, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টের মত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন লেখ বা রিট (Writ) জারি করে, আইনের বৈধতা বিচার করে এবং অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজ্যের

গভর্নর হাইকোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন।

অধস্তন আদালতগুলির শীর্ষে রয়েছে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে জেলা জজের আদালত, আর ফৌজদারি মামলার জন্য দায়রা জজের আদালত। মেট্রোপলিটান শহরগুলিতে ফৌজদারি মামলার জন্য রয়েছে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট। জেলা জজ, দায়রা জজ ও মেট্রোপলিটান জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করতে হয়।

জেলা স্তরের নীচে সাব-জজের আদালত, মুন্সেফের আদালত এবং অধস্তন বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে রয়েছে ন্যায় পঞ্চায়েত।

সুতরাং ভারতের ক্রমস্তর বিন্যস্ত অখণ্ড বিচার-ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত সুপ্রীম কোর্ট এবং সর্বনিম্নে ন্যায় পঞ্চায়েত।

৭২.৮ অনুশীলনী

(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কে এবং কিভাবে নিযুক্ত করে?

(২) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাবলী কি?

(৩) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে অপসারিত হন?

(৪) সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শদান এলাকা ব্যাখ্যা করুন?

(৫) বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

(৬) হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন?

(৭) অধস্তন আদালতের গঠন বিবৃত করুন?

৭২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Granville Austin; *The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation,* Oxford University Press, London, 1977.

(2) Upendra Baxi; *The Indian Supreme Court and Politics,* Eastern Book Co., Lucknow.

(3) দুর্গাদাস বসু ; *ভারতের সংবিধান পরিচয়,* (অনুবাদ) প্রেন্টিস হল, নিউ দিল্লী, ১৯৯৪

(4) নিমাই প্রামাণিক; *ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা,* ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।

একক ৭৩ ❐ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

গঠন

৭৩.০ উদ্দেশ্য

৭৩.১ প্রস্তাবনা

৭৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৭৩.৩ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৭৩.৪ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৪.১ মূল্যায়ন

৭৩.৫ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৬ আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৭ পরিকল্পনা কমিশন

৭৩.৮ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

৭৩.৯ সারাংশ

৭৩.১০ অনুশীলনী

৭৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতীয় সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনক্ষমতার যে সুস্পষ্ট বিভাজন করা হয়েছে তার প্রকৃতি বুঝতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্র না এককেন্দ্রিক, কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছে, সেই প্রশ্নের সমাধান সূত্র পাবেন।
- কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধুনা যে সব চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও কিছুটা অবহিত হবেন।

৭৩.১ প্রস্তাবনা

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়, সেখানে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজ্যসংঘ পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্য বহন করলেও, সংবিধানে অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'যুক্তরাষ্ট্রে' শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। তাই নানান সময়ে অসতর্কভাবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অনেকে বর্ণনা করলেও সর্ব অর্থে ভারতকে একটি পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা হয় না।

ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো বিচার করলে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল ঃ (ক) কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই ধরনের সরকারের অবস্থিতি (খ) লিখিত ও অংশত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (গ) কেন্দ্র ও রাজ্য, এই দুই ধরনের সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত ক্ষমতা (ঘ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত।

কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের সুবাদে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করার কিছু বাধাও আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন এবং আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন, দ্বিবিধ সংবিধান ও দ্বিবিধ নাগরিকতার অনুপস্থিতি, সংসদের উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের অভাব ইত্যাদির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই সংবিধান বিশেষজ্ঞ অস্টিন মন্তব্য করেছেন যে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি এতোই বিচিত্র যে তার কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রায়ন সম্ভব নয়।

অস্টিনের এই মন্তব্যটিকে সামনে রেখে ভারতের সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোটি নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে বিচার করার চেষ্টা করব। শাসন

৭৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকাঠামো অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধান ভারতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার অনেকাংশে মিল থাকলেও কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতার সূত্র ধরে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে, সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা কী বুঝি।

সাধারণভাবে যেকোন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার থাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকার। এই দুই সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় যে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। একদিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য ইত্যাদি

কারণে একটি কেন্দ্র অভিমুখী শক্তির জন্ম দেয় যার ফলে একটি সাধারণ জাতীয় সরকারের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ইত্যাদি নানান পার্থক্য থাকবার জন্য আঞ্চলিকভাবে সরকার প্রতিষ্ঠার মনোভাব কাজ করে। এই ধরনের মনোভাব কেন্দ্রাতিগ শক্তির জন্ম দেয়। এই শক্তিই আঞ্চলিক সরকারকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। এইভাবে এই দুধরনের সরকার পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিবিধ সরকার থাকায়, এই দুই স্তরের সরকারের কাজকর্মকে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অন্যথায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেই কারণে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরপক্ষে শিক্ষা, কৃষি, জলসেচ ইত্যাদি আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইভাবে একই সঙ্গে, দুটি স্তরে দুটি সরকার আপন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে যাতে কোনভাবেই কোনও স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সব সময়ই সংবিধান প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত, সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় না হলে উভয় সরকারই স্বীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে পারে এবং শাসনকার্যকে জটিল করে তুলতে পারে। তাই সংশোধন পদ্ধতিটিকে জটিল করে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। ফলে এককভাবে কোন সরকার সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে না।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ মেটাতে এবং সংবিধানের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রয়োজন হয়। বস্তুত, নিরপেক্ষতা না থাকলে কোনও আদালত বিরোধের যথাযথ মীমাংসা করতে পারে না। সেইদিক থেকে এই আদালতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয়, আইনসভার দুটি কক্ষ এবং দ্বিনাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম দুটি শর্ত। দ্বিনাগরিকত্বের ক্ষেত্রে একজন নাগরিক একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গরাজ্য উভয়েরই নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যগুলি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে ইচ্ছামতো যোগ দিতে এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সেই কারণে এই দ্বিনাগরিকত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়। অপরদিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে আইনসভার উচ্চকক্ষে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাই আইনসভার উচ্চকক্ষে আঞ্চলিক সমস্যার যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে। অপরপক্ষে, জনগণের প্রতিনিধিরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে নিম্নকক্ষে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর কথাও বলা হয় যাতে প্রতিটি রাজ্যই আইনসভায় সমান গুরুত্ব পায়। তবে এই দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক শর্ত বলে অনেকে মনে করেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে ভারতের শাসনকাঠামোকে যদি বিচার করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, ভারতকে প্রচলিত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র কেন বলা হয় না।

৭৩.৩ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

কোনও রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কীভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজনৈতিক আদর্শ, ভূখণ্ডের আয়তন, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি নানান কারনের উপর। ভারতের সংবিধান যখন রচনা করা হয়, সংবিধান প্রণেতারা স্বভাবত এই বিষয়গুলিকে বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন। এর ফলে ভারতে যে শাসনকাঠামো নির্মাণ করা হয় তা আকারগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সব রীতিই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই সংবিধানের ১নং ধারায় ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ বলা হয়েছে। এই সংঘের অন্তর্ভুক্তি যেমন অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের মতো স্বেচ্ছাধীন নয় তেমনি প্রয়োজনবোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরে শাসনক্ষমতা বণ্টন করা হলেও ভারতে কোনওক্রমেই একটি যুক্তরাষ্ট্র বলে মনে করা যাবে না।

তবে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে গড়ে তোলার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ভারত একটি বিশাল ও জনবহুল রাষ্ট্র। এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভিতরেও নানান ধরনের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন, কোনও এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে এতো ব্যাপক সমাধান করা সহজ হবে না। যেহেতু আঞ্চলিক সমস্যাগুলি স্বতন্ত্র এবং জটিল, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এই সংস্কৃতি চেতনার স্ফুরণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। আমরা জানি, প্রাকস্বাধীনতা পর্বে ভারতে দু'ধরনের রাজ্য ছিল : (ক) ইংরেজ-শাসিত ভারত অর্থাৎ ভারতের যে অংশটি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল এবং (খ) দেশীয় রাজ্যসমূহ অর্থাৎ দেশীয় রাজা-নবাব শাসিত রাজ্য যেগুলি আবার ইংরেজ সরকারের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত, ঐ একই আইনের প্রবর্তনার ফলে অনেক প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন, যাঁরা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এঁরা সকলেই স্বাগত জানান কারণ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরাও সকলে আঞ্চলিক রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেন।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো হলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। একথা সত্য যে ভারতের শাসনকাঠামোয় যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। যেমন, প্রথমত, ভারতে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক এই দুই স্তরে সরকার বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় সবসময়ই ভারতীয় সংবিধান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এই সংবিধান লিখিত এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি যেহেতু জটিল, তাই সংবিধানকে আপাতভাবে সুপরিবর্তনীয় বলা যায় না। চতুর্থত, সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। এর ফলে উভয় সরকারে শাসন করার এক্তিয়ার সুস্পষ্ট এবং সাদাকালো অক্ষরে লেখা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে সেই কলহের মীমাংসা করার জন্য স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে। প্রয়োজনবোধে ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংবিধানের কোনো আইনের ব্যাখ্যার জন্য সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সরকারের কার্যাবলীর সাংবিধানিকতা যাচাই করতে পারে। কোনো আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কিন্তু সেই আইন অযৌক্তিক কিংবা ক্ষতিকারক কিনা সেই প্রশ্নে যেতে পারে না।

ভারতের শাসনব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে অনেকেই মনে করেছেন প্রকৃতিগতভাবে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আরও একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব যে ভারতের সংবিধান ভারতকে আক্ষরিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় করে গড়ে তুলতে চায়নি। বস্তুত, অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় সংবিধান তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে যে সকল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকল সময়ই কেন্দ্রকে অঙ্গরাজ্যগুলির তুলনায় অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কীভাবে সংবিধানে কেন্দ্রীভবনের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। এর ফলে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভবনের যে ঝোঁক দেখা যায়, তার ব্যাপকতা বিচার করে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ভারতকে আধাযুক্তরাষ্ট্রীয় বা সমজাতীয় বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। তবে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, ভারতের শাসনব্যবস্থা যে কোনও বিশেষ যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক সরকারকে অনুকরণ করে গড়ে তোলা হয়নি। বরং উভয় প্রকার ব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, একথাই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। এই সমন্বয় ঘটানোর ফলে ভারত একটি নতুন রকমের রাজ্যসংঘ হয়ে উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭৩.৪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৬(১) ধারায় সংসদকে সমগ্র রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের যে কোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সংসদে গৃহীত যে কোন আইন সকল অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা ঐ আইনে নির্দেশিত বিশেষ কোনও অঞ্চলের প্রতি প্রয়োগ করা যাবে। এছাড়া ২৪৫(২) ধারা অনুসারে সংসদীয় আইন ভারতীয় নাগরিক, প্রজা এবং ভারতের বাইরে অবস্থিত কোনও সম্পত্তির উপরও প্রযুক্ত হবে।

তবে সংসদের অধীনস্থ অধিকার ক্ষেত্র সম্পর্কে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন আন্দামান এবং লাক্ষাদ্বীপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন সংসদীয় আইনকে বাতিল বা সংশোধন করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংসদীয় আইন তফশীল অন্তর্ভুক্ত কোন স্থানের প্রতি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, অসমসহ কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যপাল বিশেষ নোটিস বলে কোনও বিশেষ সংসদীয় আইন কোনও স্বায়ত্তশাসিত জেলা বা অঞ্চলের প্রতি প্রযোজ্য হবে না সেকথা ঘোষণা করতে পারেন।

এছাড়া ২৪৫ (১) ধারা অনুসারে, কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা সেই রাজ্য বা তার কোন বিশেষ অঞ্চল সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু সেই আইন কোনক্রমেই অন্য অঙ্গরাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য হবে না। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফশীলে তিনটি তালিকা সংযোজিত করে কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই স্তরে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। উল্লেখিত তালিকা তিনটি হল ঃ (ক) কেন্দ্র তালিকা (খ) রাজ্য তালিকা ও (গ) যুগ্ম তালিকা। তালিকার নামকরণ থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে তালিকাগুলি কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে। মূলত জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিই তালিকার অন্তর্গত। বিভিন্ন সময়ে নানান রকম সংশোধনের ফলে বর্তমানে এই কেন্দ্র তালিকার বিষয়সংখ্যা হল ৯৯টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয়াবলি, যুদ্ধ ও শান্তি, পারমাণবিক শক্তি, বীমা, ডাক ও তার ইত্যাদি। সংসদ কেবল এই বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। এ ছাড়া মূলত আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য তালিকা গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, আরক্ষা বাহিনী, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ রাস্তাঘাট, কৃষি ইত্যাদি। বর্তমান রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়সংখ্যা হল ৬১। রাজ্য আইনসভা এইসব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে।

যুগ্মতালিকার অন্তর্গত বিষয়সংখ্যা বর্তমানে ৫২। এই বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে যদি দেখা যায় কোনও একটি বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় আইন ও রাজ্য আইনের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হবে এবং কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী রাজ্য আইন বাতিল বলে গণ্য করা হবে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, বিদ্যুৎ, বন্যপ্রাণী ও পাখি সংরক্ষণ, ওজন ও পরিমাপ, ক্রীড়া, শিক্ষা ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আলোচিত এই তিনটি তালিকার বাইরে এমন যদি কোনও বিষয় থাকে যে কোন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, সেইসব অনুল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই বিষয়গুলিকে বলা হয় অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residual Power) এবং সংবিধানের ২৪৮ ধারা অনুসারে এই ক্ষমতাপুঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত। সংবিধান নির্দেশিত এই তালিকা তিনটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে।

এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন সংবিধানের অন্যান্য কয়েকটি ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ও বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সংবিধানের ২৪৯-২৫৩ ধারায় এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪৯ ধারা অনুসারে, রাজ্যসভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের, ২/৩ অংশ যদি এমন প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনও বিষয় নিয়ে সংসদে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহলে সেই বিষয়ে সংসদ আইন নির্মাণ করতে পারে।

২৫০ ধারা অনুসারে, জরুরী অবস্থার সময় সংসদ রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

২৫১ ও ২৫৫ ধারা অনুসারে যুগ্ম তালিকার অন্তর্গত বিষয়ে কেন্দ্র রাজ্য বিরোধে কেন্দ্রীয় আইন, বলবৎ হবে।

২৫২ ধারা অনুসারে দুই বা ততোধিক রাজ্যের অনুরোধক্রমে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এছাড়া ২৫৩ ধারা বলে সংসদ রাজ্য তালিকার বিষয় সম্পর্কে আইন তৈরি করতে পারে যদি কোনও আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তির বিষয় হয়ে থাকে।

সংবিধানে উল্লিখিত এইসব আইন যেমন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য অপেক্ষা কেন্দ্রকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তেমনি সংবিধানের আরও কিছু ধারা কেন্দ্রীভবনের বিষয়টিকে সমর্থন করে।

যেমন ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা (Constitutional breakdown) ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের হাতে অর্পণ করতে পারেন।

এছাড়া রাজ্যপালের হাতেও এমন কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে পরোক্ষভাবে কেন্দ্র রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন, রাজ্য আইনসভায় প্রস্তাবিত কোন বিল রাজ্যপালের কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো হলে, রাজ্যপাল সেই বিলে সম্মতি ও অসম্মতি কোনও কিছু না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও সেই বিলকে ইচ্ছেমতো তাঁর মতামত না দিয়ে আটকে রাখতে

পারেন। রাষ্ট্রপতি যেহেতু আবার প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই কাজ করেন, সুতরাং এইভাবে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের প্রণীত কোনও আইন বলবৎ করা না করার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়া সংবিধানের ২৮৮ (১) ও (২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আন্তঃরাজ্য নদী অথবা নদীউপত্যকা নিয়ন্ত্রণ সূত্রে কোনও আইন রাষ্ট্রপতির আদেশ ছাড়া বলবৎ হতে পারবে না।

আবার ৩০৪ ধারা অনুসারে, আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যের উপর কর ধার্য করার এক্তিয়ার রাজ্যের হাতে থাকলেও তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষ।

কেন্দ্রীভবনের এইসব উদাহরণ সামনে রেখে বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এ সম্পর্কে জনমত গড়ে উঠেছে। অনেকে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস চেয়েছেন। আমরা পরবর্তী আলোচনা থেকে বোঝবার চেষ্টা করব যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বাইরেও নানান ক্ষেত্রে রাজ্যের উপর কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটাতে সাহায্য করে।

৭৩.৪.১ মূল্যায়ন

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক এবং আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের নীতি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সমর্থক নয়, তা আমরা সংবিধান পর্যালোচনা করে দেখাতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট এবং স্বাধিকার রক্ষিত হয়, এখানে তা দেখা যায় না। সংবিধান কেন্দ্রেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কেন্দ্রের অধীন এবং সময়সাপেক্ষে রাজ্যের বিষয়গুলিও কেন্দ্রের অধীনে চলে যাতে পারে। এছাড়া সংবিধানের ২০০ ধারা অনুযায়ী যে কোন রাজ্য আইন সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতিকে সেই বিলে স্বাক্ষর না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। অবশিষ্ট ক্ষমতাও যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে, ভারতীয় সংবিধান সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতেই রেখেছে। সমালোচকরা বিভিন্ন সময় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টনের এই নীতিকে অযুক্তরাষ্ট্রীয় বলে যেভাবে দোষারোপ করেছেন তা ঠিক নয়। কারণ মনে রাখতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হলেও সংবিধানের ১নং ধারা থেকে শুরু করে কোথাও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়নি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত ভারতীয় শাসনব্যবস্থা, এই ধরনের অভিযোগই ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা আপাত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে যে ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন সেটা খেয়াল রাখা দরকার। আইনপ্রণয়ন ছাড়া শাসনক্ষমতা ও আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখতে পাব যে একই আদর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আধিপত্য অঙ্গরাজ্যগুলির উপর বিস্তৃত হয়েছে।

৭৩.৫ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

আইনসংক্রান্ত বিষয়ে যেমন লক্ষ্য করা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটানো হয়েছে, সঙ্গতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই কেন্দ্রীভবনের ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতারা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট করার সময় প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয়টিকেও বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। সংবিধানের ৭৩নং ধারায় প্রশাসনিক এক্তিয়ার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ধারা অনুসারে যেসব বিষয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সন্ধি ও চুক্তির ব্যাপারে ভারত সরকার যেসব ক্ষমতা বা অধিকার ভোগ করে, সেইসব বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতার এক্তিয়ার প্রসারিত। অপরপক্ষে রাজ্য তালিকাভুক্ত যেসব বিষয়ে রাজ্য-আইনসভা আইন প্রণয়ন করার অধিকারী, সেইসব বিষয় ১৬২ নং ধারা অনুসারে রাজ্যগুলির হাতে থাকবে। এছাড়া সংবিধানের ২৫৬-২৬৩ নং ধারা, ২৫৩, ৩৩৯, ৩৫০, ৩৫১ ও ৩৬৫ নং ধারায়ও কেন্দ্ররাজ্যের প্রশাসনিক সম্পর্কের কিছু কিছু বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। সংবিধান অনুসারে, সপ্তম তফশীলে বর্ণিত তিনটি তালিকায় যেভাবে আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার বণ্টন করা হয়েছে, ৭৩ ও ১৬২ ধারায় বলা [illegible] যে প্রশাসনের ক্ষেত্রেও ঐ তালিকা অনুসারে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে [illegible] করা হবে। সুতরাং স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসদ কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা এবং [illegible] তালিকার বিষয়গুলির উপর নিজের প্রশাসনিক এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। [illegible] জরুরি অবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার সূত্রে যেভাবে ২৫৩, ৩৫৬ [illegible] ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তেমন [illegible] ও ঐ বিষয়গুলির উপর করতে পারে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রশাসন সাধারণভাবে রাজ্যের উপরই থাকে। তবে দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে ঃ (ক) যদি সংসদ রাজ্যের কিছু শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে প্রয়োজনবোধে তুলে দেয় এবং (খ) সংবিধানের যেসব ধারা যুগ্ম তালিকার কিছু বিষয়কে কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করেছে।

২৫৬ ধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে সংসদ প্রণীত আইনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশও দিতে পারে।

২৫৭ ধারায় আবার বলা আছে যে রাজ্যসরকার এমনভাবে রাজ্যের কার্য পরিচালনা করবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। জাতীয় স্বার্থে বা সামরিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

২৫৮ ধারা অনুসারে, রাজ্যসরকারের সম্মতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীনভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা তার কর্মচারীদের উপর বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদনার দায়িত্ব দিতে পারেন।

২৬০ ধারা অনুসারে, ভারত সরকার যেকোন বিদেশী সরকারের সঙ্গে চুক্তির বলে বিদেশী সরকারের অধীনস্থ কোন অংশে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার এক্তিয়ার বর্ধিত করতে পারে।

২৬১ ধারা অনুসারে সকল সরকারি আইন সমগ্র ভারতে সমান মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া, ২৬২ ধারা বলে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে। তবে এর জন্য সংসদে প্রয়োজনীয় আইন পাস করা প্রয়োজন।

২৬২ ধারা অনুসারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ মীমাংসা এবং সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারেন।

এছাড়া প্রশাসনের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষা বাহিনী, প্রভৃতি রাজ্যে প্রেরণ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

মূল্যায়ন ঃ কেন্দ্ররাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্ক নিয়ে সংবিধানে যেভাবে নিয়ম তৈরি করা হয়েছে, তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোপুরিভাবে সম্ভব একথা প্রায় বলা যেতে পারে। বস্তুত সংবিধানের ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৬ ধারাসহ আরও অন্যান্য ধারা কেন্দ্রকে বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই এককেন্দ্রিক করে তুলতে পারে। ফলে রাজ্যের স্বাধিকারের ধারণাটি সাধারণভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

রাজ্যের বিনা অনুমতিতে রাজ্যগুলিতে আধাসামরিক বাহিনী পাঠানোর ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবার ফলে রাজ্য-র উপর কেন্দ্রের দমননীতির প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যায়। এছাড়া রাজ্যপাল যেহেতু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যে প্রেরিত হন, সুতরাং রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্যের উপর নানারকম চাপসৃষ্টি করার সুযোগ কেন্দ্রের হাতে সব সময়ই থাকে। বিশেষত যদি দেখা যায় কেন্দ্র এবং অঙ্গ রাজ্যের সরকারগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করে, এই ধরনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই কারণেই ১৯৬৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা প্রমুখ রাজ্য শাসনসম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবি বারবার উঠে আসছে। এরই সূত্রে ১৯৭১ সালে রাজা রামান্না কমিটি ও ১৯৮৩ সালে সারকারিয়া কমিশন গঠিত হয়। তবে এদের সুপারিশের ফলে অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

৭৩.৬ আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

অর্থনৈতিক উৎসটি প্রাণবন্ত রাখতে না পারলে কোন রাষ্ট্রই যথার্থভাবে এগোতে পারে না। সেই কারণে রাষ্ট্রের আর্থিক প্রসঙ্গটি সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিষয়টি ক্রমশ জটিল হয়। কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক দায়দায়িত্ব বণ্টনব্যবস্থা সুস্পষ্ট না থাকলে জটিলতা আরও বাড়ে। সেকথা মনে রেখে সংবিধানের দ্বাদশ অধ্যায় এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একথা প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে দ্বিবিধ সরকার ব্যবস্থায় আর্থিক দায়দায়িত্বের বণ্টন এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যে কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলি যেন স্বাধিকার রক্ষা করতে পারে। ভারতের সংবিধানে সপ্তম তফশীলে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। (i) কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতার বণ্টনব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারব অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে কতটা প্রভাবমুক্ত। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সম্পর্কের বিষয়টিকে চারভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) কেন্দ্র ও রাজ্য কর্তৃক ধার্য কর সংগ্রহ ও বণ্টন করা

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় অনুদান

(গ) ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা

(ঘ) অর্থ কমিশন গঠন সংক্রান্ত বিষয়

আমরা একে একে এই চারটি বিষয়ের আলোচনা করব।

(ক) পূর্বোল্লিখিত সপ্তম তফশীলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাকে দুটি তালিকায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৩টি রাজস্ব বিষয়ক ক্ষমতা যার মধ্যে রয়েছে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, আন্তঃরাজ্য ব্যবসাবাণিজ্যের উপর ধার্য কর, কোম্পানির আয়ের উপর কর, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর ধার্য কর, রেলপথ, উৎপাদন কর ইত্যাদি।

অপরদিকে রাজ্য তালিকায় রাখা হয়েছে ১৯টি বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে ভূমি-রাজস্ব, কৃষি আয়ের উপর কর, জমির উপর উত্তরাধিকার কর, প্রমোদ কর, বিলাস কর ইত্যাদি। এই দুই তালিকার বহির্ভূত বিষয়গুলির উপর কর ধার্যের ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রের হাতে রয়েছে। তবে রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে যুগ্ম তালিকার কোনও অস্তিত্ব নেই। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রের ভূমিকা ব্যাপক হলেও রাজস্বের সবটাই কেন্দ্রের একক ভোগে লাগে না। যেমন, সংবিধানের ২৬৮ ধারা অনুযায়ী স্ট্যাম্প কর, ঔষধপত্র ও প্রসাধনী সামগ্রীর উপর কর কেন্দ্র সংগ্রহ করলেও রাজ্য ভোগ করে। আবার, কৃষিজমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, সম্পত্তি কর ইত্যাদি কিছু কর কেন্দ্র ধার্য ও সংগ্রহ করলেও সংগৃহীত অর্থ রাজ্য সরকার ধার্য ও আদায় করলেও সেই অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে বণ্টন করা হয় (২৭০ ধারা)।

২৭১ নং ধারা অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও বিশেষ করের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপাতে পারে এবং সেই অর্থ কেবল কেন্দ্রই ভোগ করতে পারে।

সংবিধান রাজ্যের হাতে যেসব কর সংগ্রহ করার ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়েছে তার ওপরও কিছু নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে রয়ে গেছে। যেমন—বৃত্তি কর, অন্য রাজ্যের কোনও সামগ্রী বিক্রির উপর কর, বিদ্যুতের

উপর সুনির্দিষ্ট কর ইত্যাদি। এছাড়া কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সম্পত্তির উপর কর ধার্য করতে পারবে না।

(খ) সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে অনুদান প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই অনুদান প্রদানের অর্থ হল বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য আনা, রাজ্যগুলির রাজস্বের ঘাটতি পূরণ করা এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার পাট ও পাটজাত পণ্যের উপর রফতানি মাশুল ধার্য করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সব রাজ্যকে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করে।

এছাড়া সংবিধানের ২৭৫ ধারা অনুসারে, তফশীলভুক্ত উপজাতি কল্যাণে অনুদান প্রদান বাধ্যতামূলক।

২৮২ ধারা অনুসারে, বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে অনুদান করতে পারে।

(গ) ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেও ২৯২ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ২৯৩ ধারা বলে রাজ্য সরকার কেবল দেশের অভ্যন্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) ২৮০ ধারা অনুসারে, প্রতি পাঁচবছর অন্তর একটি অর্থকমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশনে একজন সভাপতি ও চারজন সদস্য থাকবেন যাঁদের নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ২৮০ (৩) ধারা অনুসারে, অর্থ কমিশনকে মূলত দুটি দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রথমত, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টনযোগ্য রাজস্ব নির্ধারণ করা ও দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় অনুদান নীতি স্থির করা।

সুতরাং, সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে ভারতে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি বুঝতে আর্থিক সম্পর্কের দিকটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন ঃ আইনসংক্রান্ত এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে যেমন বোঝা গিয়েছে যে উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্গরাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব অপরিসীম, আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থ কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন এই দুই কেন্দ্রীয় আয়োগ রাজ্যের আর্থিক প্রতিকারকে বিপুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষত যদি দেখা যায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারে যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসন করছে, অর্থবণ্টনের বিষয়টি সেখানেও আরও জটিল হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেক্ষেত্রে আর্থিক বিষয়গুলি নানানভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অঙ্গরাজ্যের শাসকগোষ্ঠীকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে। ফলে, অঙ্গরাজ্যের স্বার্থও বিঘ্নিত হবে। এই সব বিষয়গুলি বিবেচনা করে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতা

পুনর্বিন্যাসের কথা বারবার উঠছে এবং সঙ্গতভাবেই কেন্দ্ররাজ্যের আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার কথাও এসে যাচ্ছে।

৭৩.৭ পরিকল্পনা কমিশন

ভারতের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক ও সর্বোপরি আইনগত ক্ষমতার যেভাবে বণ্টন করেছে, সেখানে আমরা বারবারই লক্ষ্য করেছি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেও সবসময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অধিক পরিমাণে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের এইসব নিয়মকানুনকে জোরালো করেছে ভারত সরকারের অবিধিবদ্ধ ও সংবিধান-বহির্ভূত একটি সংস্থা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

পরিকল্পনা কমিশন গঠন করার উদ্দেশ্য হল সমগ্র ভারতের জন্য সুসংহত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা। এই কমিশনের সদস্য সংখ্যা আট। একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, তিনজন মন্ত্রী সদস্য এবং তিনজন অন্যান্য সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি। মন্ত্রীসহ অন্যান্য সদস্যদের যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন, তাই নিজের আস্থাভাজন এবং পছন্দসই ব্যক্তিদেরই তিনি নিয়োগ করেন। তাই এই সব ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের মনোমতো এবং রাজনীতি প্রভাবিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্য রূপায়ণ করার জন্য রয়েছে ১৯টি বিভাগ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, শক্তি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প ও খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ ইত্যাদি। এইসব বিভাগ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখে এবং প্রয়োজন মতো কমিশনের নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। দেশের বৈষয়িক, কারিগরীগত, মূলধনী সম্পদ এবং সর্বোপরি মানবসম্পদের মূল্যায়ন এবং বৃদ্ধিসাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম কাজ। এছাড়া পরিকল্পনা অনুসারে সম্পদের বণ্টন, প্রকল্প সমূহের সফল রূপায়ণের ব্যবস্থা করা এবং পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে মূল্যায়ন করে এই সংস্থা। আমরা জানি, যে কোন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সমস্যা একটি বড় প্রতিবন্ধক। এই বাধা দূর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন নানান ধরনের সুপারিশ করে থাকে। এমনকি কোনও কাজের মাঝপথে সমস্যা দেখা দিলে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়াও এই কমিশন রাজ্যের পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করে। বাস্তবিক, এই ব্যয়বরাদ্দর ক্ষেত্রে রাজ্যের কোন ভূমিকা নেই। আসলে পরিকল্পনা কমিশনের গঠন থেকে শুরু করে ব্যয়বরাদ্দ কোন ক্ষেত্রেই রাজ্যের এক্তিয়ারে নেই। রাজ্যগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, সাফল্য বা যাবতীয় বিষয়গুলিই কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণ যেহেতু পরিকল্পনা

কমিশনের ইচ্ছানুসারী বা অনুরূপভাবে পরিকল্পনা কমিশনের নীতি যেহেতু কেন্দ্রীয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই সর্বার্থেই রাজ্য সরকার কেন্দ্রমুখীন হয়ে পড়ে। তবে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ করার ক্ষমতা আছে। প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা নেই। সংসদের কাছেও এর কোন দায়দায়িত্ব নেই। অথচ সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তার সুপারিশ দানের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরোক্ষভাবে প্রভূত প্রভাবিত করে থাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি-নীতির বিচারে, বিশেষত আর্থিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমিশনের সংবিধান বহির্ভূত এই ক্ষমতা রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে করা হয়।

৭৩.৮ কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি

আইন, শাসন ও অর্থ, এই তিন ক্ষেত্রের সূত্র ধরে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা যে কেন্দ্রীয় আধিপত্য দেখতে পাই, তা সংবিধান প্রণেতাদের অভীষ্ট হলেও, ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি নানান সময় এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিভিন্ন সময় সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা করেছেন। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্য নানান প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এবং মধ্যে উল্লেখ্য রাজারামান্না কমিশন (১৯৭১) এবং সারকারিয়া কমিশন (১৯৮৮)। এছাড়া ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি ২৫০০ শব্দের স্মারকলিপি পশ্চিমবঙ্গের ক্যাবিনেটে পাস করেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দিয়ে কেন্দ্ররাজ্যের উন্নতির কথা এঁরা সকলেই মনে করেন। এইসব মতামতের কিছু কিছু গ্রহণ করা হলেও এর ফলে কেন্দ্ররাজ্যের সম্পর্কের যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, তা বলা যাবে না।

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে নানা ধরনের আলোচনা লক্ষ্য করা গেলেও বিশেষত ১৯৬৭ সালের পর থেকে যখন বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে, তখন থেকে এই আন্দোলন আরোও জোরালো আকার নিতে থাকে। ১৯৮৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম ও কর্ণাটকে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সমগ্র ভারতে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলি জোরদার আন্দোলন শুরু করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই বিষয়টি পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য সারকারিয়া কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন যার কিছু কিছু বক্তব্য পরবর্তীকালে গৃহীত হয়। তবে এই প্রতিবেদন রাজ্যের পক্ষে খুব সুখকর হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির কথা এই প্রতিবেদন খুব প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করেননি। বরং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যকেই স্বীকার করেছেন।

তবুও কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের প্রসঙ্গটি বারবারই ঘুরে ফিরে আলোচনার মধ্যে এসে থাকে। মনে করা হয়, আইন, প্রশাসন এবং আর্থিক এই তিনটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। যেমন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'অবশিষ্ট ক্ষমতা' রাজ্যের হাতে অর্পণ করা

উচিত এবং রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য প্রেরিত রাজ্যের কোন বিল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হবে বলে মনে করা হয়। শাসনবিভাগীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা উচিত। যেজন্য ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৬ ও ৩৬৫ ধারা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। এছাড়া রাজ্যপাল নিয়োগের বিষয় এবং সেই সঙ্গে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রয়োগসীমা সম্পর্কে বিচার করা প্রয়োজন এমনভাবে যাতে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অপশাসনের শিকার না হয়ে উঠতে পারে।

আসলে ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনেক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লেও এর এককেন্দ্রিক প্রবণতা এতোটাই স্পষ্ট যে কিছু সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্ররাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো দুরূহ।

৭৩.৯ সারাংশ

ভারতের সংবিধান যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনা করেছে, আপাতদৃষ্টিতে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে মনে হতে পারে। যেমন দ্বিবিধ সরকার, লিখিত সংবিধান, সংবিধানের প্রাধান্য ইত্যাদি। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় যে কিছু যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও প্রকৃত বিচারে ভারত যুক্তরাষ্ট্র নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই শাসনের মূল দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানেও ভারতকে রাজ্যসংঘ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরের সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব প্রচুর। আইনগত, শাসনগত এবং আর্থিক-এই তিন ক্ষেত্রেই মূল দায়িত্ব কেন্দ্রের। রাজ্যের হাতে যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার অনেকাংশই সময় বিশেষে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। এছাড়া রয়েছে পরিকল্পনা কমিশন। এই কমিশন একটি উপদেষ্টা সংস্থা হলেও এর প্রভাব কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে।

বর্তমানে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় কিনা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কিছু পরিবর্তন ঘটানো যায় কিনা সে সম্পর্কে নানান চিন্তা ভাবনা চলছে।

৭৩.১০ অনুশীলনী

১। ভারতকে কি 'যুক্তরাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা যায়?

২। ভারতের শাসনব্যবস্থাকে 'আধা যুক্তরাষ্ট্রীয়' বলা হয় কেন?

৩। ভারতকে একটি 'রাজ্যসংঘ' বলে সংবিধানে বর্ণনা করা হয়েছে কেন?

৪। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আইন সংক্রান্ত সম্পর্ক কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে?

৫। ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৬। ভারতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক কী ধরনের?

৭। ভারতে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে "পরিকল্পনা কমিশন'-এর ভূমিকা কী?

৮। ভারতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন।

৭৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

১। S.L. SIKRI : *Indian Government and Politics,* Kalyani Publishers, Ludhiana 1999.

২। A.S. NARANG : *Indian Government and Politics,* Gitanjali Publishing House, New Delhi 19.

৩। নির্মলকান্তি ঘোষ ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রবীন্দ্র লাইব্রেরী,* কলকাতা ১৯৯৭।

৪। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি,* নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯৬।

একক ৭৪ ☐ রাজ্যের শাসনবিভাগ

গঠন

৭৪.০ উদ্দেশ্য

৭৪.১ প্রস্তাবনা

৭৪.২ রাজ্যের শাসনবিভাগ ঃ কাঠামোগত বিন্যাস

৭৪.৩ রাজ্যপাল ঃ নিয়োগ, যোগ্যতা ও কার্যকাল

৭৪.৪ রাজ্যপালের ক্ষমতা

৭৪.৫ রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা

৭৪.৬ রাজ্যের মন্ত্রীসভা

৭৪.৭ মুখ্যমন্ত্রী

৭৪.৮ সারাংশ

৭৪.৯ অনুশীলনী

৭৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- অঙ্গরাজ্যের শাসনবিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হবেন।
- শাসনবিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন পদাধিকারীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে বণ্টন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা কে সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারবেন।

৭৪.১ প্রস্তাবনা

ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো যে দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থা বহাল করা হয়েছে, তারই একটি হল অঙ্গরাজ্যের শাসন। ভারতে কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে, রাজ্যগুলিতেও অনুরূপভাবে সংসদীয় শাসনরীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। এই সংসদীয় রীতিনীতি অনুসরণ করে তাই রাজ্যগুলিতে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাজ্যপাল এবং প্রকৃত শাসক হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর অস্তিত্ব দেখতে

পাই। কাঠামোগতভাবে কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে দেখা যায় এবং প্রধানমন্ত্রী সমগ্র রাষ্ট্রের মুখ্য শাসক হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, অঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা প্রায় তারই সমান্তরাল। তবে নিশ্চিতভাবে, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মধ্যে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োগ গুণগতভাবে স্বতন্ত্র।

বর্তমান এককে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীপরিষদের ভূমিকা নিয়ে আমরা যে আলোচনা করব, সেক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কিছু কিছু তুলনামূলক আলোচনা করব।

৭৪.২ রাজ্যের শাসন বিভাগ ঃ কাঠামোগত বিন্যাস

রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্বের আধার হলেন রাজ্যপাল। কাঠামোগতভাবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। অপরদিকে সংসদীয় রীতি ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজ্যের প্রকৃতি শাসনভার অর্পিত হয় মুখ্যমন্ত্রীর উপর। মন্ত্রীসভার সকল সদস্যদের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যশাসন করেন। সংবিধান অনুসারে, রাজ্যপালকে মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি। আবার মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরাও রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। আবার একথা আমরা জানি যে রাষ্ট্রপতি যে কোন কাজই প্রধানমন্ত্রীর পরমার্শক্রমে করেন। কাজেই রাজ্যপালের ক্ষমতার উৎস এবং প্রকৃত ক্ষমতার প্রয়োগ কীভাবে এবং কেমন করে ঘটে থাকে সে সম্পর্কে আলোচনার নানান অবকাশ আছে। তবে সেইসব আলোচনার আগে, আমরা একে একে রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসন বিভাগের নানা অংশের ক্ষমতা ও কাজকর্মের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করব।

৭৪.৩ রাজ্যপাল ঃ নিয়োগ, যোগ্যতা ও কার্যকাল

সংবিধানের ১৫৩ ধারা অনুসারে, প্রত্যেক রাজ্যে একজন রাজ্যপাল থাকবেন। একই ব্যক্তি প্রয়োজনে দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপালও থাকতে পারবেন।

১৫৪ ধারা বলে রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে এবং তিনি এই ক্ষমতা সংবিধান অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করবেন।

১৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এবং রাজ্যপালের অধিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন (১৫৬ ধারা)।

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হতে গেলে তাঁর কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতা বাদ উল্লেখ করা হয়েছে যেমন (ক) রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। (খ) তাঁর অন্ততপক্ষে ৩৫ বছর বয়স হতে হবে। (গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য

কোন আইনসভারই তিনি সদস্য হতে পারবেন না। (ঘ) রাজ্যপাল অন্য কোনও লাভজনক পদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। (ঙ) বিনা ভাড়ায় কার্যক্ষেত্রে থাকার সুবিধা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা তিনি ভোগ করবেন এবং তাঁর কার্যকালের মধ্যে অসুবিধাজনকভাবে বেতন, ভাতা ইত্যাদি হ্রাস করা যাবে না।

রাজ্যপালের কার্যকাল আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। তাই কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেও প্রয়োজনবোধে রাজ্যপালকে অপসারিত করা হতে পারে। আবার রাজ্যপালও কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে নিজেই পদত্যাগ করতে পরেন।

রাজ্যপাল অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ার ফলে বিষয়টি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। অনেকেই রাজ্যপালের পদটিকে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন নির্ভর না করে জনগণ কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নির্বাচনভিত্তিক করা উচিত বলে অনেকেই মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানের খসড়া কমিটির নির্বাচনভিত্তিক রাজ্যপাল নিয়োগের কথা প্রস্তাব করে। এই বিষয়ে গণপরিষদে চারটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়। যেমন (ক) জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন (খ) রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন (গ) রাজ্যের নিম্নতম সভা কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেরিত ব্যক্তিদের নামের ভিতর থেকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং (ঘ) রাষ্টপতি কর্তৃক নির্বাচন।

উল্লেখবাহুল্য, গণপরিষদ শেষোক্ত পদ্ধতিই গ্রহণ করে। এর পিছনে অবশ্য কিছু যুক্তিও উপস্থাপিত করা হয়। মনে করা হয় রাজ্যপালও যদি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরূপে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে নির্বাচিত মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যপালের বিরোধ বাধতে পারে। সেক্ষেত্রে সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে যা শেষ পর্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়ত আইনসভা রাজ্যপালকে নির্বাচন করলে রাজ্যপাল আইনসভার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়তে পারেন এবং দলব্যবস্থার উপস্থিতি এই অবস্থাকে গুরুতর করে তুলতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যপাল দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না। আসলে রাজ্যপালের পদকে নিরপেক্ষ হিসাবে গড়ে তোলার মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপালের তত্ত্বকে গ্রহণ করে। তবে একথা এই সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে রাজ্যপালের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে যে কেন্দ্রাভিমুখী ক্ষমতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সংবিধান প্রণেতারা করেছিলেন, রাজ্যপাল নামক ব্যক্তিত্বটিকে সেই অনুসারেই তাঁরা গড়তে চেয়েছিলেন।

পরবর্তী অংশে রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করলে সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবহিত হব।

৭৪.৪ রাজ্যপালের ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে, রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতেই ন্যস্ত থাকবে। এই ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করবেন নিজে বা তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের সাহায্যে। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের ক্ষমতার প্রশ্নে সংবিধান তাঁর স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (discretionary powers) ও অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করেছে। সংবিধানের ১৬৩(১) ধারা স্পষ্টভাবেই বলেছে, যেসব বিষয়ে রাজ্যপালের স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না, সেই সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বসহ মন্ত্রীসভা রাজ্যপালকে পরামর্শদান ও কার্য পরিচালনায় সহায়তা করবেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু রাজ্যের প্রকৃত শাসক, সেই কারণে রাজ্যপালের ক্ষমতাও অনেকটাই নিয়মতান্ত্রিক বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এমন কিছু ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন যে তখন তাঁকে কেবলই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে আখ্যা দেওয়া যায় না। রাজ্যপালের ক্ষমতার শ্রেণীবিভাজন করলে বিষয়টি বোঝা যাবে।

ক. শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যপাল যেহেতু রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, সেই কারণে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্মই তাঁর নামে হয়ে থাকে। এই ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে দুধরনের ক্ষমতা ঃ নিয়োগসংক্রান্ত এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষমতা। প্রথমত, তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন। এছাড়া, রাজ্যের মহাব্যবহারিক (advocate general), রাজ্যসরকারি রাষ্ট্র কর্তৃক কমিশনের সদস্যদের তিনি নিয়োগ করেন। দ্বিতীয়ত, সংবিধান অনুসারে, মুখ্যমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীর কার্যকাল রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন। রাজ্যপাল শাসনকার্য সুপরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে পারেন বিভিন্ন রাজ্যে তফশিলি জাতি ও উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণের ভার রাজ্যপালের উপর দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার রাজ্যপালগণ একজন করে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তফশিলি জাতি, উপজাতি ও এলাকার শাসনকার্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালকে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে হয়।

খ. আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালও আইনসভার সদস্য হতে না পারলেও রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (১৬৪ ধারা) রাজ্যপালই রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজন মনে করলে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া কোন বিলই আইনে পরিণত হতে পারে না। কোন বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হবার পর তাঁর সম্মতি জন্য পাঠানো হয়। রাজ্যপাল সব ক্ষেত্রে যে সম্মতি দেবেন, তা নয়। এমনকি তিনি বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে অর্থবিলের ক্ষেত্রে

রাজ্যপালের এ ধরনের ক্ষমতা নেই কোন কোনও বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। এছাড়া আইনসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কিছু বিষয় রাজ্যপালের এক্তিয়ারভুক্ত। যেমন, (ক) রাজ্য আইনসভায় বক্তৃতা দেওয়া বা বাণী পাঠানো (খ) বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সাময়িক অর্ডিন্যান্স জারী করতে পারেন (গ) যেসব রাজ্যের আইনসভায় দুটি পরিষদ আছে, সেখানে রাজ্যপাল উচ্চতর কক্ষ বা বিধানপরিষদে চারুকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কয়েকজনকে মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া (ঘ) প্রয়োজনবোধে রাজ্যের আইনসভায় ইঙ্গভারতীয় সম্প্রদায় থেকে একজন সদস্যকে তিনি বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন।

গ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

বিধানসভায় গৃহীত অর্থবিল সম্মতির জন্য পাঠানো হলে সেই বিলে রাজ্যপাল পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন না অর্থাৎ এক অর্থে অর্থবিলে তাঁর সম্মতিপ্রদান বাধ্যতামূলক। আবার অন্যদিকে অর্থসংক্রান্ত কোন বিল বিধানসভায় পেশ করতে হলে রাজ্যপালের অনুমতি আবশ্যক। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতে তিনি অর্থমন্ত্রী মারফত আইনসভায় আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট পেশ করবার ব্যবস্থা করে থাকেন। বাজেট অধিবেশন শুরু হবার আগে তিনি বিধানসভায় (যে সব রাজ্যে দ্বিকক্ষব্যবস্থা আছে সেখানে যৌথ অধিবেশনে) আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়ে থাকেন।

ঘ. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাজ্যের জেলাসমূহের বিচারক ও বিচারবিভাগীয় কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল ইত্যাদি বিষয়ে আদেশ প্রদান রাজ্যপালের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার অন্তর্গত। তবে রাজ্যের হাইকোর্টের বিচরপতি নিয়োগের ক্ষমতা তাঁর নেই। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি (২১৭ ধারা অনুসারে) রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ১৬১ ধারা অনুসারে, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা করার বা অপরাধীর দণ্ডাদেশ হ্রাস বা স্থগিত করার সীমিত ক্ষমতা রাজ্যপালের থাকলেও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীকে ক্ষমা প্রদর্শনের কোনও ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। সংবিধানের ১৯১ ধারা অনুসারে, রাজ্য আইনসভায় কারা সদস্য হতে পারবেন না তা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও বিরোধ দেখা দিলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাজ্যপালের। তবে তিনি সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের মতামত নেবেন।

ঙ. স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

ভারতের সংবিধান রাজ্যপালকে বিশেষভাবে এমন কিছু ক্ষমতা দিয়েছে যার সমান্তরাল কোন ক্ষমতা স্বয়ং রাষ্ট্রপতিরও নেই। এই ক্ষমতাকেই বলা হয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যা তিনি মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার পরামর্শ ব্যতিরেকেই প্রয়োগ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, কোনও বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারও স্বয়ং রাজ্যপালেরই। ১৬৩ ধারায়

স্পষ্টতই বলা হয়েছে। যে এ ব্যাপারে রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। এই বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) আসামের স্বশাসিত উপজাতি অঞ্চলের খনি রয়্যালটি ও উপজাতি অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের নিজস্ব ক্ষমতার কথা। (খ) রাষ্ট্রপতি নাগাল্যান্ডের রাজ্যপালকে আইন ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব দিতে পারেন। নাগাবিদ্রোহীদের কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যেই এই ক্ষমতা যে প্রদান করা হয়েছে, তা বোঝা যায়। (গ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ঐ দুই রাজ্যের রাজ্যপালের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। (ঘ) অনুরূপভাবে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি মণিপুরের রাজ্যপালকে সেই রাজ্যের বিধানসভার কমিটিতে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধি নিয়োগের বিশেষ দায়িত্বও দিতে পারেন। (ঙ) সিকিমের রাজ্যপালকেও রাজ্যের শান্তি রক্ষার্থে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের হাতে আরও কিছু ক্ষমতা রয়েছে যেগুলি তিনি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারেন। তবে সেগুলি রাজ্যপালের ক্ষমতা বলে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়নি। যেমন, (ক) মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর আপন বিচার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। সাধারণত, নিয়মানুসারে, বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে হয়। তবে বিধানসভায় যদি কোনও বিশেষ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের এই ক্ষমতা প্রয়োগের উপলক্ষ্য দেখা দেয়। এই ধরনের অবস্থায় ক্ষমতা প্রয়োগের কিছু উদাহরণ আমরা বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। যেমন, ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার গঠনকালে। (খ) যদি রাজ্যবিধানসভায় সরকারি দলের কিছু সদস্যের দলত্যাগ করার ফলে মন্ত্রীসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়, তবে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করতে পারেন। (গ) সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যের সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘটলে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠানো রাজ্যপালের অন্যতম কর্তব্য। সেক্ষেত্রে তিনি যদি মনে করেন রাজ্যে জরুরী অবস্থা জারী করা প্রয়োজন, তিনি অনুরূপ মতামতও পাঠাতে পারেন। (ঘ) সাংবিধানিক অচলাবস্থার কারণে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হলে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাজ্যে ঐ ভূমিকা পালন করতে

প

(ঙ) বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত কোন বিল তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে বিষয়টিকে আইনে রূপান্তরিত করা থেকে কিছুদিন পিছিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন।

উপরের আলোচনা থেকে রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণা করা গেল, তার ভিত্তিতে রাজ্যপাল পদের অবস্থান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন জাগে। রাজ্যপালের নানান ক্ষমতা, বিশেষত স্বেচ্ছাধীন

ক্ষমতা বিবেচনা করে আমরা তাঁর প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হতে পারি।

৭৪.৫ রাজ্যপালের শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা নেহাতই নিয়মতান্ত্রিক নাকি তিনি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা স্বাধীন, তা নিয়ে নানান সময় বিতর্ক উঠেছে। এই বিতর্কে কখনও বা স্বয়ং রাজ্যপালও অংশগ্রহণ করেছেন, আবার সাংবিধানিক সঙ্কটের সূত্রে নানান সময় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্যপালের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। ফলে, সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। যেমন, একদল সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্রপতি, তেমনি রাজ্যস্তরে রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। এরই বিপরীত মতামত আর একদল বিশেষজ্ঞের যাঁরা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালকে পুরোপুরি নিয়মতান্ত্রিক হিসাবে মেনে নিতে নারাজ। উভয় মতের বিশেষজ্ঞরাই তাঁদের যুক্তির স্বপক্ষে রাজ্যরাজনীতির নানান উদারহণ পেশ করেছেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, রাজ্যপালকে যেমন নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে রাজ্য মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। একদিকে যেমন বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালদের ইচ্ছানুসারে বদলি এবং বরখাস্ত করেছেন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেছেন। সেইসব উদাহরণ মনে রেখে যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তা হল মন্ত্রীসভা যেহেতু যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল, তাকে উপেক্ষা করে কেবল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার দোহাই তুলে এভাবে একের পর এক রাজ্যপালগণ গণতন্ত্রের প্রতি এভাবে উপেক্ষা দেখান কীভাবে। তাই যেসব সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবেই মনে করেন তাঁরা তাঁদের সুনির্দিষ্ট কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের মতে (ক) মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়মতান্ত্রিক। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবং তাঁর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার সদস্যদের তিনি নিয়োগ করতে বাধ্য। (খ) সংসদীয় নিয়মানুসারে, মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও তাঁর ক্ষমতা সীমিত। (গ) রাজ্যপালের সন্তুষ্টির উপর মন্ত্রীসভার অস্তিত্ব নির্ভর করলেও এই সন্তুষ্টি রাজ্যপালের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন নয়। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টিও সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনেই। তাই তিনি কোনক্রমেই একনায়কোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। (ঘ) সর্বোপরি, রাজ্যপাল যেহেতু জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপাল, তাই মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বিধানমণ্ডলীর উপর, রাজ্যপালের উপর নয়।

এইসব কিছু বিবেচনা করে রাজ্যপালকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উর্ধ্বে ভাবতে রাজী নন এইসব বিশেষজ্ঞরা।

এর উত্তরে বিপরীত মতের বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন যে রাজ্যপাল যদি কেবল নিয়মতান্ত্রিক শাসকই হবেন, তাহলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন কীভাবে। কারণ তাঁরা স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে রাষ্ট্রপতিকে যেমন সকল ক্ষেত্রেই মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকেন, রাজ্যপালের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও বাধ্যতা আরোপ করা হয়নি। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্রে যে পূর্ণ স্বাধীনতা রাজ্যপালের উপর রাখা হয়েছে তা নিশ্চয়ই রাজ্যপালের আসনকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। আবার মুখ্যমন্ত্রীরও যেহেতু রাজ্যপালকে রাজ্যের যাবতীয় বিষয় জানাবার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আছে, সেই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ কোনও নির্দেশ দিলে তা মানার দায়িত্বও মুখ্যমন্ত্রীর রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা বা বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রাজ্যপাল যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি তা ভারতীয় রাজনীতিতে বারবারই ঘটেছে। সেসবই সংবিধানকে উপেক্ষা করে যে রাজ্যপালগণ করেছেন এমনও নয়।

পরস্পর বিরোধী এই উভয় বক্তব্য মনে রেখে রাজ্যপালের পদমর্যাদা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা কিছুটা দুরূহ। এছাড়া রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যরাজনীতির নানান উত্থান পতন লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব রাজ্যপালের সাংবিধানিক ভূমিকার সরলীকরণ সম্ভব নয়। বিশেষত, ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যপালের পদ ও ভূমিকা নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন উঠেছে। কেন্দ্রীয় তথা রাজ্যরাজনীতির ইতিহাসের দিকে তাকালে আমাদের অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়বে। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে যেহেতু কংগ্রেস সরকার নেতৃত্ব দিয়েছে, কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কে দ্বিধা থাকলেও সরাসরি কোনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি। কিন্তু এই নির্বাচনে অনেকগুলি রাজ্যে যেহেতু অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় এল এবং কোথাও কোথাও কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তি হিসাবে পর্যবসিত হল, কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস রাজ্যরাজনীতির ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে দিয়ে নানানভাবে রাজ্যরাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফলে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ রাজ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সংঘাত বাধতে শুরু করল। মুখ্যমন্ত্রীরা যেখানে রাজ্যপালের পদকে কেবল নিয়মতান্ত্রিক শাসক ছাড়া অন্য কোন মর্যাদা দিতে নারাজ, সেখানে কোনও কোনও রাজ্যপাল তাঁদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজেদের রাজনৈতিক শাসক হিসাবে প্রতিফলিত করতে চাইলেন। এই অবস্থা চলেছিল ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যতদিন না পর্যন্ত কংগ্রেস কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে। ইতিমধ্যে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে খতিয়ে দেখার জন্য কাশ্মীরের রাজ্যপাল ভগবান সহায় এবং আরও চারজন রাজ্যপাল নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। তাঁদের রিপোর্টে বলা হয় যে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ রাজ্যপালের কাছে বাধ্যতামূলক যদি প্রয়োজনে রাজ্যপাল কোন বিষয়ে আপত্তি

লিখিতভাবে রেকর্ডে রাখতে পারেন। ইতিহাস বলে ভারতের রাজ্যরাজনীতির ঘূর্ণিপাকে রাজ্যপালকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে বারবার। মনোনীত ভূমিকা পালন করতে না পারলেই রাজ্যপাল অপসারণ করার ঘটনা প্রায়শই ঘটেছে। কেবল পাঞ্জাবেই ১৯৮১ সাল থেকে, পাঁচ বছরে সাতবার রাজ্যপাল বদল ঘটেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলিতে রাজ্যপালের জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর বারবার আঘাত হেনেছে। ১৯৮১ সালে কেরালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সি পি আই (এম) সরকার গড়ার দাবি থাকলেও, কংগ্রেস (আই) নেতা করুণাকরণকে সরকার গড়তে রাজ্যপাল আহ্বান জানান— যদিও ১৪১টি আসনের সূত্রে ১৭টি ছিল কংগ্রেস (আই)-র এবং অন্যান্য দলের ৭১ জন সমর্থক করুণাকরণের সঙ্গে ছিলেন। এক্ষেত্রে রাজ্যপাল যদিও প্রভূত পরিমাণে সমালোচিত হন। এই সরকারের পতনও হয় এক বছরের মধ্যে। আসামেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এইভাবে ১৯৮২-তে হরিয়ানার, জিডিতপসে, ১৯৮৩ তে কর্ণাটকে গোবিন্দ নারায়ণ রাজ্যপাল হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার তত্ত্ব উপেক্ষা করে নিজের ক্ষমতার ব্যবহার করেন। সিকিমে নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর সঙ্গেও রাজ্যপালের বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে রাজ্যপাল শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন বহাল করেন। ১৯৮৪-তে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপাল রামলাল রামা রাওয়ের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার কোন সুযোগ না দিয়েই। এই ঘটনার জেরে রামলালকে রাজ্যপালের পদ থেকে চলে যেতে হয় এবং সেইস্থানে শঙ্করদয়াল শর্মাকে বসানো হয়। ১৯৮৯ সালে কর্ণাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এই অজুহাতে বোম্বাই মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের পরামর্শে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপালদের পদত্যাগপত্র দিতে বলেন রাষ্ট্রপতি। ১৩টি রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপাল অপসারিত করা হয়। এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে তদনীন্তন বিরোধী দল কংগ্রেস। কিন্তু ১৯৯১ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে নরসিং রাও মন্ত্রীসভার সময় ১৪ জন রাজ্যপাল বদল করা হয়। উল্লেখ্য, এইসব রাজ্যপাল ভি পি সিং এবং চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশে রমেশ ভান্ডারী এবং ১৯ সালে বিহারে বিনোদ পাণ্ডের ভূমিকাও রাজ্যপালের অগণতান্ত্রিক আচরণের উদাহরণ তুলে ধরে। সুতরাং এইভাবে অকারণে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, রাজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠানো, ৩৫৬ ধারার প্রয়োগের প্ররোচনা দেওয়া এবং কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম করার ধারাবাহিক নজির রাজ্যপালের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংবিধানের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারা যেভাবে রাজ্যপালের ক্ষমতাকে নির্ণয় করেছে, সেখানে অনেকক্ষেত্রেই রাজ্যপাল সাংবিধানিক ব্যবস্থার অসহায় শিকার হয়ে পড়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে রাজ্য রাজ্যনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের যে ধারা বর্তমানে বহমান, সেখানে রাজ্যপালের পক্ষে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের পছন্দসই ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিয়োগের প্রথা সবসময়ই বজায় রাখতে চান এদেশের শাসককুল। রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিয়োগ

করা বা কোন ব্যক্তিকে কোন রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগের পর তাঁকে যদি স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, তাহলে রাজ্যপালের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবেই। কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম করলেই তা শাস্তিযোগ্য বলে যদি রাজ্যপালের উপর রাজনৈতিক চাপ রাখা হয়, তা যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

৭৪.৬ রাজ্যের মন্ত্রীসভা

সংবিধানের ১৬৩ (১) ধারা অনুসারে, রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং তাঁর কাজে সহায়তার জন্য রাজ্যে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত নিয়োগই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে হয়। যেমন বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মন্ত্রীসভায় যাঁরা স্থান লাভ করেন তাঁদের প্রত্যেককেই আইনসভার সদস্য হতে হয়। সদস্য নয় এরকম কোনও ব্যক্তিকে ছ'মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হতে হয় নইলে পদত্যাগ করতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, যদি কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী উচ্চকক্ষের সদস্যও হতে পারেন।

সংবিধান অনুসারে, রাজ্য মন্ত্রীসভার কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর এবং যতদিন তাঁরা আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন তাঁদের পদচ্যুত করা যায় না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে কোনও বিশেষ মন্ত্রী পদচ্যুত হতেই পারেন বা ভিন্ন দপ্তরের ভার নিতে পারেন। রাজ্য মন্ত্রীসভায় সাধারণত তিন ধরনের মন্ত্রী থাকেন—ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। ক্যাবিনেট মন্ত্রী বলতে সেইসব মন্ত্রীদেরই বোঝানো হয় যাঁরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির ভারপ্রাপ্ত হন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন রাষ্ট্রমন্ত্রীরা। তাঁরা কোন কোন সময় স্বাধীনভাবে মন্ত্রীসভায় থাকতে পারেন। এবাদে রয়েছেন উপমন্ত্রী যাঁরা সাধারণত বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের অধীনে থেকে কাজ করেন এবং তাঁদের কাজে সাহায্য করেন। এঁরা সকলেই বিভিন্ন হারে বেতন, ভাতা এবং আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন।

সংবিধানে রাজ্য মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে আলাদা কিছু লেখা না থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় মন্ত্রীপরিষদ সম্পর্কে যেসব উল্লেখ রয়েছে, সেখান থেকে আমরা মন্ত্রীপরিষদের কাজকর্ম সম্পর্কে নানা আভাস পাই।

মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে রাজ্য আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল। রাজ্যপালকে তাঁর কাজে সাহায্য করা মন্ত্রীসভার কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভা তার সুনির্দিষ্ট কাজ করবে। সেক্ষেত্রে কয়েকটি নিয়মনীতি মন্ত্রীসভার সদস্যরা মেনে চলেন। রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থা বজায় রেখে তাঁদের চলতে হয়। কারণ এই আস্থা বজায় রাখলে রাজ্যপাল মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন না। মন্ত্রীসভা সব সময়ই

ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেন। মন্ত্রীসভার উপর যেসব দায়িত্ব রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করলে বোঝা যাবে যে মন্ত্রীসভার দায়দায়িত্বর পরিমাণ বিপুল।

প্রথমত, সংবিধানে রাজ্যসরকারের হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেইসকল বিষয়ে নীতি নির্ধারণ মন্ত্রীসভার প্রধান কাজ। দ্বিতীয়ত, নীতিগুলির বাস্তব রূপায়ণের দায়িত্বও মন্ত্রীসভার উপর। এইসব নীতিরূপায়ণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি দূর করে নীতিসমূহ বাস্তবায়িত করাই মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। তৃতীয়ত, অঙ্গরাজ্যের জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলি আইনসভায় বিলের আকারে উপস্থাপিত করার প্রাথমিক কাজ মন্ত্রীসভাতেই আলোচিত হয়। অর্থাৎ আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভাই কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। চতুর্থত, মন্ত্রীসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য মন্ত্রীসভাকে প্রশাসনকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হয়। কোনও বিভাগে কোনও নীতি প্রয়োগে সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উদ্যোগও মন্ত্রীসভাকেই গ্রহণ করতে হয়। এর উপরই নির্ভর করে বিশেষ কোন মন্ত্রীসভার সাফল্য ও ব্যর্থতা। পঞ্চমত, সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রীসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শুরুতেই অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় বাজেট পেশ করেন এবং সেই বাজেট রাজ্য আইনসভায় বিতর্ক-র মধ্য দিয়ে অনুমোদন লাভ করে এবং তদনুসারে সরকার অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়। নতুন করস্থাপন বা ব্যয়মঞ্জুরী দাবি সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমোদনসাপেক্ষ আইনসভায় উত্থাপন করা হয়। আবার রাজ্যপাল এই উত্থাপনের অনুমোদন দেন মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শক্রমে। সুতরাং কার্যত মন্ত্রীসভার সমর্থনেই বার্ষিক আয় ব্যয় বরাদ্দ রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপিত হয়। ষষ্ঠত, আইনসভার অধিবেশন স্থাপিত থাকাকালীন কোন বিষয়ে যদি অর্ডিন্যান্স জারী করার প্রয়োজন হয়, রাজ্যপাল তা মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে করে থাকেন বা পরবর্তীকালে আইনসভার অধিবেশন শুরুর ছ'সপ্তাহের মধ্যে আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। সর্বোপরি, রাজ্যের শাসনবিভাগের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং তাদের কার্যের সীমা নির্ধারণ করার দায়িত্ব মন্ত্রীসভার উপর রয়েছে। তা না হলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া মন্ত্রীসভা যেহেতু তাদের যাবতীয় কাজের জন্য যৌথভাবে দায়িত্বশীল, তাই বিভিন্ন দপ্তর ক্যাবিনেট নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার উপর কাজের চাপ এতো বেশি বেড়ে গেছে যে মন্ত্রীসভাকেই নীতিপ্রণয়নের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। তাই সংবিধান আলাদাভাবে চিহ্নিত না করলেও বর্তমান সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার কাজকর্ম বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে মন্ত্রীসভার কাজকর্ম সব কিছুই নির্ভর করে যোগ্য নেতৃত্বের উপর। সুতরাং মন্ত্রীসভার নেতৃত্বে যেহেতু দেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই শাসনব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

৭৪.৭ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুখ্য শাসক হিসেবে আমরা যাঁকে দেখতে পাই, তিনি মুখ্যমন্ত্রী। সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল। রাজ্যরাজনীতির কেন্দ্রে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী যিনি

একই সঙ্গে বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপালের স্থান সর্বোচ্চ হলেও তাঁকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি শাসন করেন। ফলে রাজ্যশাসনের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী কার কতটা ভূমিকা সে সম্পর্কে বিরোধ বিতর্কের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে বিভিন্ন দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যধারা বিচার করা প্রয়োজন।

একথা প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে সংসদীয় রাজনীতির হাত ধরে বিশেষত অঙ্গরাজ্যের মুখ্যশাসক হিসাবে যিনি ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেন, তাঁকে নানান বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হল। বিশেষত, ভারতের মতো বৈচিত্রপূর্ণ দেশে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেরই এমন কিছু স্থানীয় বা প্রাদেশিক সমস্যা থাকে যেগুলি স্বতন্ত্রভাবে সমাধান করতে হয়। অসমের বোরো জঙ্গীর সমস্যা, বিহার বা উত্তরপ্রদেশের জাতপাতের লড়াই জনিত সমস্যা থেকে অতি অবশ্যই আলাদা। সেক্ষেত্রে এইসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরও এইসব সমস্যা নিজেদের মতো করে মোকাবিলা করতে হয়। বিচার করে দেখলে আমরা একথাও হয়তো বা মেনে নেব যে এইসব প্রাদেশিক সমস্যাগুলির ভিতর থেকেই রাজ্য নেতৃত্ব উঠে আসে। তাই সঠিক ব্যক্তি সঠিক রাজ্যে মুখ্যশাসকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম না হলে রাজ্যে জটিলতা বাড়ে।

নিয়োগ, কার্যকাল ও সুযোগসুবিধা

সংবিধান অনুসারে যদিও রাজ্যপালের হাতেই মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রক্ষিত, তবু রাজ্যপাল এক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়মেই নিয়োগকার্য সম্পাদন করেন। সাধারণত বিধানসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাজ্যপাল ঐ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সাধারণত পাঁচ বছরের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাজ্য আইনসভার নির্বাচিত সদস্য না হলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে আইনসভার সদস্য হতে হয়। যে সকল রাজ্য আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট, সে সকল ক্ষেত্রে তিনি উচ্চকক্ষের সদস্য হলেও মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আইনানুসারে বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা তিনি লাভ করেন।

১৬৭ ধারা অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কিছু সুনির্দিষ্ট দায়দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এবং আইন বিষয়ক যাবতীয় প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে রাজ্যপালের গোচরে আনা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল চেয়ে পাঠালে আইন বিষয়ক প্রস্তাব এবং শাসনসংক্রান্ত তথ্যাদিও মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ জানাতে বাধ্য। তৃতীয়ত, মন্ত্রীপরিষদে বিবেচিত হয়নি অথচ কোন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রাজ্যপাল সে বিষয়ে মন্ত্রীসভার কাছে বিবেচনার জন্য দাবি করতে পারেন এবং

এক্ষেত্রে রাজ্যপালের ইচ্ছানুসারে তা মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থিত করতে হয়। রাজ্যপালের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এই তিনটি ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার কথা বাদ দিলেও মুখ্যমন্ত্রীর করণীয় নানান দায়দায়িত্ব রয়েছে। যেমন—

(ক) রাজ্যসরকারের মুখ্য প্রশাসক হলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ, তাঁদের দফতর বণ্টন এবং পদত্যাগ পত্র গ্রহণের বিষয়ে রাজ্যপালকে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া তাঁর কাজ। প্রয়োজনে তিনি রাজ্যপালকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ভিতর থেকে একজনকে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করার পরামর্শও দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী পরিচালিত মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রয়োজনে তিনি একাধিক সংসদীয় সচিবও নিয়োগ করতে পারেন।

(খ) মন্ত্রীসভার বিভিন্ন বৈঠকে নেতৃত্বপ্রদান, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধন, প্রয়োজনে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত নানান কাজ মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ারভুক্ত। কার্যক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা যথেষ্ট ব্যাপক এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভা তথা রাজ্যরাজনীতির উত্থানপতন ঘটে। যে কোন দফতরের সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করা এবং সমাধানে সচেষ্ট থাকা তাঁর কাজ। সুতরাং সামগ্রিকভাবে কোন কাজের জন্য মন্ত্রীসভা যৌথভাবে দায়িত্বশীল হলেও মুখ্যমন্ত্রীকে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। রাজ্যের রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন বিষয়ে অলোচনার জন্য যদি কোন মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপাল আলাদাভাবে আলোচনা করতে চান, সে ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীর সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নেতৃত্বের দৃঢ়তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মন্ত্রীসভাকে সুসংহত করা তাঁর কাজ। এইসব কারণে তিনি মন্ত্রীসভার মূলস্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হন।

(গ) আইনসভার অভ্যন্তরে সরকারি দলের নেতৃত্বে থেকে যাবতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া, মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কাজ। রাজ্যের কোথায় কী ঘটছে, আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কোথায় উন্নতি বা অবনতি ঘটছে এ সম্পর্কে আইনসভায় দলের, কোন কোন সময় শরিকী দলের এবং সর্বোপরি বিরোধী দলের প্রশ্ন এবং সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। আইনসভার নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভা এবং আইনসভার যেমন নেতৃত্ব দেন, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দলীয় কর্মসূচীর রূপায়ণ, আদর্শগত অবস্থানের প্রচার, জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে নিজস্ব এবং দলের ভাবমূর্তি বজায় রেখে বক্তৃতা প্রদান এবং দলের আভ্যন্তরীণ উপদলীয় বিরোধিতার সমাধান এবং ভারসাম্য বজায় রাখা মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। প্রকৃতপক্ষে দলের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

(ঙ) আইনসভার ভিতরে তো বটেই, বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কোন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বৃহত্তর রাজনীতিতে বিশেষ রাজ্যের সরকারের নেতা হিসাবে দেখা যায়। বিশেষত, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীই সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আন্তঃরাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন (যথা নদীর জলবণ্টন), খরা-বন্যা-ভূমিকম্প-র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কেন্দ্র থেকে নানান সাহায্য আহরণ করা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সদর্থক ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী। এমনকি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(চ) অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এছাড়া আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে কাজ করতে হয়। যেমন, বার্ষিক বাজেট পেশ করার আগে অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া, প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া, রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, রাজ্যের উন্নয়ন কেন্দ্রিক নানান কমিটি, কমিশন, বোর্ড ইত্যাদির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা, পরামর্শ প্রদান এবং গ্রহণ করা ইত্যাদি তাঁর বিপুল কাজকর্মের অন্যতম দিক।

বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পালাবদলের সূত্রে রাজ্যপাল তাঁর বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার করে সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বতন্ত্র উদাহরণ তৈরির চেষ্টা করলেও রাজ্যরাজনীতি তথা প্রকৃত শাসনের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীই মূল ক্ষমতার অধিকারী। তবে সমগ্র ভারতে সব রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা এক রকম নয়। রাজ্য আইনসভায় রাজনৈতিক দলগুলির চেহারা, রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা তাঁর দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব—এই সব কিছুর সমন্বয়েই মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা নির্ভর করে।

৭৪.৮ সারাংশ

ভারতের সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনা করা হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই একই রীতি মানা হয়েছে। রাজ্যস্তরে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তাঁর নামেই রাজ্যের প্রশাসন চলে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে শাসনতান্ত্রিক, আইনগত, অর্থসংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিশেষ কিছু ক্ষমতা যাকে বলা হয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা।

রাজ্যপালের নিয়মতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে যাই বিতর্ক হোক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রকৃত শাসক এবং তিনিই যে তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে রাজ্যের শাসনপরিচালনা করেন সে বিষয়ে সন্দেহ

নেই।

মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে বিরোধ বিতর্ক যেমন চলে, তেমনি এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিমানসের অভিঘাতের উপরেই নির্ভর করে রাজ্যস্তরে প্রশাসনিক সঙ্কট কীভাবে সমাধান হবে।

৭৪.৯ অনুশীলনী

১। রাজ্যপালের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করুন।

২। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপালের কী কী ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ভোগ করেন?

৩। রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করুন।

৪। রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বিষয়ে আলোকপাত করুন।

৬। রাজ্যের মন্ত্রীসভার গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India.* Wadhawand Company, Nagpur, August 1999

২। নির্মলকান্তি ঘোষ : পূর্বোল্লিখিত

৩। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র : পূর্বোল্লিখিত

৪। S. L. Sikri : *Indian Government and Politics* (1989)

একক ৭৫ ❐ রাজ্যের আইনসভা

গঠন

৭৫.০ উদ্দেশ্য

৭৫.১ প্রস্তাবনা

৭৫.২ রাজ্য আইনসভার গঠন

৭৫.৩ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী

৭৫.৪ রাজ্য আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ-পদাধিকারীবৃন্দ ও তাঁদের ভূমিকা।

৭৫.৪.১ অধ্যক্ষ

৭৫.৪.২ উপাধ্যক্ষ

৭৫.৪.৩ বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি

৭৫.৫ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা,

৭৫.৬ রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

৭৫.৬.১ অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি

৭৫.৭ রাজ্য আইনসভার অর্থ সংক্রান্ত কার্য পদ্ধতি

৭৫.৮ সারাংশ

৭৫.৯ অনুশীলনী

৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে

(ক) রাজ্যস্তরে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা কী রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

(খ) রাজ্য আইনসভা কীভাবে গঠন করা হয় তা স্পষ্ট হবে।

(গ) রাজ্যস্তরে আইন প্রণয়ন বিভাগে কারা সদস্য হতে পারেন সে সম্পর্কে জানা যাবে।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার পরিচালনা কে করেন এবং তাঁর হাতে কী ক্ষমতা থাকে তাও জানা যাবে।

(ঙ) আইনসভার কার্যপদ্ধতির ধারা সম্পর্কে বোঝা যাবে।

৭৫.১ প্রস্তাবনা

ভারতের সংবিধানে যেহেতু দ্বিবিধ শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেমন দেখা যায়, রাজ্যের শাসনস্তরেও আইন প্রণয়ন করার জন্য একটি আইনসভার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আইনসভা সেই সকল বিষয় নিয়ে আইন প্রণয়ন করে যেগুলি রাজ্য তালিকাভুক্ত। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির যেসব ক্ষেত্রগুলি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত সেগুলিও আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। একথা প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের সব কটি অঙ্গরাজ্যের গঠন একরকম নয়। অধিকাংশ আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট হলেও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হলেও আইনসভাও কোন কোন অঙ্গরাজ্যে রয়েছে। সদস্যসংখ্যাও অঙ্গরাজ্যের আয়তনভেদে বিভিন্ন প্রকার। তবে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই অঙ্গরাজ্যগুলির সব আইনসভাতেই একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। সুতরাং কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন রাজ্যস্তরেও আইন প্রণয়ন হয় এক গণতান্ত্রিক বাতাবরণের ভিতর। অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ ও স্থানীয় আর্থসামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে সাংবিধানিক আইনকাঠামোর ভিতরে থেকে রাজ্য আইনসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। বিশেষত, দেশে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনগত ভারসাম্য রাখতে এবং রাজ্যগুলিকে আর্থসামাজিক দিক থেকে যতটা সম্ভব স্বয়ং নির্ভর করতে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়।

বর্তমান আলোচনায় অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির গঠন, কার্যাবলী, কার্যপদ্ধতি, আইনসভার সদস্যদের দায়দায়িত্ব, যোগ্যতা, আইনসভার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ভিতর দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহ সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ভিতর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

৭৫.২ রাজ্য আইনসভার গঠন

অঙ্গরাজ্যগুলির গঠন সংবিধান অনুসারে যদিও একই রকম হওয়া উচিত, তবুও রাজ্যভেদে অঙ্গ রাজ্যগুলির আইনসভার গঠন এবং আকার ভিন্ন। সংবিধানের ১৬৮ ধারা অনুসারে, প্রতিটি রাজ্যেই রাজ্যপাল আইনসভার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যদিও তিনি আইনসভার সদস্য নন। কতকগুলি রাজ্যের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। তবে অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাই এক কক্ষ বিশিষ্ট। এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে সংবিধানের ভাষায় বলা হয় বিধানসভা। যেসব অঙ্গরাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ রয়েছে, সেই দ্বিতীয় কক্ষকে বলা হয় বিধানপরিষদ। সাংবিধানিক পরিভাষায় বিধানসভাকে নিম্নকক্ষ এবং বিধানপরিষদকে উচ্চকক্ষ বলেও বর্ণনা করা হয়।

অঙ্গরাজ্যগুলির কোনগুলিতে দুটি কক্ষ থাকবে সে সম্পর্কে সংবিধানের ১৬৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ যদি কোন রাজ্যের বিধানসভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে ঐ রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন বা লোপ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তবে সংসদ

ঐ রাজ্যে সেইমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। স্বাধীন ভারতের সংসদীয় ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই পদ্ধতি মেনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন এবং লোপ করার মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ এবং জম্মুকাশ্মীর এই পাঁচটি রাজ্যে বিধান পরিষদ বহাল আছে। অনাবশ্যক এবং ব্যয়বহুল এই দুই যুক্তি উত্থাপন করে দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্ব লোপ করার কথা অনেক সময়ই আলোচিত হয়। তবে সে আলোচনার আগে আমরা অন্যান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ একে একে উত্থাপন করব।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাজ্য আইনসভার নিম্নকক্ষে অর্থাৎ বিধানসভায় প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। ৬১তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে ভোটাধিকারে বয়স ১৮ করা হয়েছে। এর আগে ন্যূনতম বয়স ২১ বছরে নির্দিষ্ট ছিল। কোন রাজ্যে কতজন প্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠানো হবে তা নির্ধারণ করা হয় জনসংখ্যার অনুপাতে। সেইভাবে অঙ্গরাজ্যগুলিকে কয়েকটি ভৌগোলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হয়। জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচন কেন্দ্র স্থির করার সূত্র সারা দেশে যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রত্যেক জনগণনার পর ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস করার কথা বলা হয়েছে। তবে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যসংখ্যা সাধারণভাবে ৫০০-র বেশি এবং ৬০-এর কম হতে পারে না। তবে কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এই সংখ্যায় ৬০ এর কম হবে তাও বলা হয়েছে। বিধানসভায় প্রয়োজন মনে করলে রাজ্যপাল যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারেন তাও ৩৩৩ ধারায় বলা হয়েছে। বিধানসভার সদস্যদের ভিতর থেকে একজন বিধানসভার অধ্যক্ষ (স্পীকার) ও একজন উপাধ্যক্ষ (ডেপুটি স্পীকার) হিসাবে নির্বাচিত হন। বিধানসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এই দুটি পদের প্রয়োজনীয়তা।

যে সব রাজ্যে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব আছে, সেইসব কক্ষের গঠন সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

বিধান পরিষদ বা উচ্চ কক্ষের সদস্যসংখ্যা ৪০-র কম এবং বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারে না। বিধান পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন বিভিন্ন উপায়ে।

(ক) এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সদস্যরা আসেন পুরসভা, জেলা বোর্ড এবং সংসদ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে।

(খ) এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি সদস্যরা নির্বাচিত হন বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা।

(গ) এক দ্বাদশাংশ নির্বাচিত হন স্নাতকদের দ্বারা।

(ঘ) এক দ্বাদশাংশ নির্বাচিত হন শিক্ষকদের দ্বারা।

(ঙ) বাকী সদস্যদের নির্বাচিত করেন রাজ্যপাল। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবী যাঁরা চারুকলা, সমাজসেবা, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ, তাঁদের মনোনীত করেন। তবে এক্ষেত্রেও রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শমতো কাজ করেন।

রাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের মতো উচ্চকক্ষকেও পরিচালনা করার জন্য সদস্যদের ভিতর থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নিযুক্ত হয়ে থাকেন। রাজ্য আইনসভার নিজস্ব সচিবালয় থাকবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকলে উভয় কক্ষেরই আলাদা সচিবালয় এবং সুনির্দিষ্ট কর্মী থাকবেন (১৮৭ ধারা)।

আইনসভার সদস্য হবার যোগ্যতা প্রসঙ্গে সংবিধান কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন ঃ

(ক) তিনি ভারতের নাগরিক হবেন।

(খ) বিধানসভার ক্ষেত্রে ২৫ বছর এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়স হতে হবে।

(গ) সংসদের বিধান কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা।

এছাড়া কোন ব্যক্তি আদালত কর্তৃক অসুস্থ মস্তিষ্ক বলে ঘোষিত হন বা তাঁকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয়, সেক্ষেত্রেও তিনি আইনসভার সদস্য হবার যোগ্যতা হারাবেন। কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনও তাঁকে সদস্য হবার যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করবে। সর্বোপরি ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনও লাভজনক পদ গ্রহণ করলেও তিনি আইনসভার সদস্য হতে পারবেন না।

আইনসভার কোন সদস্য যদি তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। বিধানসভার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ-র কাছে এবং বিধান পরিষদের ক্ষেত্রে পরিষদের সভাপতির কাছে এই চিঠি পেশ করতে হবে। তবে ৩৩তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে সভাপতি বা অধ্যক্ষ অনুসন্ধান করে দেখবেন যে ঐ পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছাকৃত বা প্রকৃত কিনা। পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছাকৃত না হলে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে না। এছাড়া ৫২ তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোন সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দলবিরোধী আইন অনুসারে হয়েছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বিধানসভার মেয়াদ সাধারণত পাঁচ বছর। প্রয়োজন হলে কার্যকাল উত্তীর্ণ হবার আগে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যায়। আবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে রাষ্ট্রপতি এর সময়কাল প্রতিবার এক বছর করে বাড়িয়ে দিতে পারেন (১৭২/১ ধারা)।

বিধানসভা ও বিধান পরিষদ উভয়ের ক্ষেত্রেই সভা শুরুর জন্য সদস্যসংখ্যার, এক দশমাংশের উপস্থিতি বা ১০ জন সদস্য যে সংখ্যাটি বেশি, অন্ততপক্ষে প্রয়োজন।

৭৫.৩ রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী

আমরা এর আগেই দেখেছি যে ২৯টি রাজ্য আইনসভার মধ্যে মাত্র পাঁচটি রাজ্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। বাকী ২৪টি অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলি এক কক্ষ বিশিষ্ট। সুতরাং এই পাঁচটি আইনসভা বাদে বাকী সকল এককক্ষবিশিষ্ট

অঙ্গরাজ্যের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভাগুলিই আইনসভার যাবতীয় কাজ করে থাকে। স্বভাবত এই সকল ক্ষেত্রে আইনসভার কর্মপ্রক্রিয়া অনেক সহজ। যেসব আইনসভায় বিধান পরিষদ রয়েছে, সেখানে কর্মপ্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। রাজ্য আইনসভার দায়িত্ব মূলত তিন প্রকার। (ক) আইন প্রণয়ন (খ) অর্থ বিষয়ক কাজ ও (গ) শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ।

ক. আইন প্রণয়ন

সংবিধান অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এছাড়াও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলিও রাজ্য আইনসভার এক্তিয়ারভুক্ত। সাধারণ আইন পাস করার জন্য রাজ্য আইনসভার উভয় কক্ষ (যদি থাকে) এবং রাজ্যপালের সম্মতি প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে বিধানসভার ক্ষমতা বেশি। যদি উভয় কক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দেয়, বিধানসভার ইচ্ছাই সেখানে চূড়ান্ত। ১৯৭ ধারায় এ সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়া আছে। বলা হয়েছে, উভয় কক্ষের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বিল নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহলে যদিও বিধান পরিষদ বিলটিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, সংশোধন কবতে পারে এমনকি তিনি মাসের জন্য বিলটি ধরেও রাখতে পারে, কিন্তু এরপরেও যদি বিলটি বিধান পরিষদে আবার উত্থাপিত হয়, সেক্ষেত্রে বিধান পরিষদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। বড়জোর একমাস পর্যন্ত পরিষদে বিলটি আটকে রাখা যেতে পারে। এই সময় অতিবাহিত হলে বিলটি পাস হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বিলটি আইনে পরিণত হতে আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। সুতরাং কোন বিল আইনে পরিণত হতে গেলে বড় জোর চার মাস পর্যন্ত বিধান পরিষদ আটকে রাখতে পারে। দুটি কক্ষে পাস হলে বিলটি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য যায়। আমরা পূর্ববর্তী এককে দেখেছি এক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিলটিকে সম্মতি না দিয়ে আবার বিধানসভায় ফেরত পাঠাতে বা রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন। তবে রাজ্যপাল যদি বিধানসভায় বিলটি ফেরত পাঠান এবং পুনর্বিবেচিত হয়ে যদি তা রাজ্যপালের কাছে আবার ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে রাজ্যপালের সম্মতি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া মেনে নির্দিষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

তবে রাজ্য আইনসভার হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা বিচার করলে বোঝা যায় যে রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়নের সুযোগ নানান নিয়মের দ্বারা বাঁধা। যেমন, রাজ্য আইন যদি কোনও কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হয়ে পড়ে, তাহলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হবে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপাল যদি কোনও আইনে সম্মতি না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে মতামতের জন্য পাঠান এবং রাষ্ট্রপতি সেক্ষেত্রে অনুমোদন না দেন, সেই বিল আইনে পরিণত হতে পারে না। তৃতীয়ত, দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি মনে করে যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সংসদকে অনুরোধ করবে, সেক্ষেত্রে সংসদের হাতে ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা চলে যায়। চতুর্থত, যদি সংসদ মনে করে জাতীয় স্বার্থে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে রাজ্যের হাতে আইন তৈরির ভার না দিয়ে সংসদের নিজের হাতে নেওয়া উচিত, সেক্ষেত্রে

বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হলেও তা আর রাজ্যের হাতে থাকবে না। সর্বোপরি সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করতেই পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গরাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় প্রাধান্য থাকার ফলে অঙ্গরাজ্যের আইনসভা অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েন।

সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মানা হয়, অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট এবং মৌলিক। যেমন, অর্থবিল বিধান পরিষদে উত্থাপিত হবে না। দ্বিতীয়ত, বিধান পরিষদ অর্থবিলের উপর কিছু প্রস্তাব দিলেও কোনও সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। তৃতীয়ত, বিধান পরিষদ যদি অর্থবিল পাস না করে বা ১৪ দিনের মধ্যে বিধানসভায় ফেরত না পাঠায়, সেক্ষেত্রেও আইনসভা বিলটিকে পাস হয়েছে ধরে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে অনুমতির জন্য পাঠাবে।

এই আলোচনা থেকে একথা মোটামুটি স্পষ্ট যে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদের ক্ষমতা একেবারেই গৌণ। তাছাড়া বিধানসভার ক্ষমতাও অনেকটাই সীমিত।

খ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজ্যবিধানমণ্ডলীর হাতে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বিধানসভার অনুমোদন ব্যতীত রাজ্য সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ বা কোনরকম অর্থব্যয় করতে পারে না। এর আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে অর্থবিল কেবল বিধানসভাতেই উত্থাপন করা যায়। এমনকি বিধানসভা থেকে পাঠানো অর্থবিল ১৪ দিনের বেশি বিধানপরিষদ আটকে রাখতে পারে না। রাজ্যপালের সম্মতি পেলে অর্থবিল আইনে পরিণত হয়। এছাড়া সরকারি ব্যয়মঞ্জুরীর ক্ষেত্রেও বিধানসভার ক্ষমতা অনন্য। রাজ্য বিধানসভা যে অর্থ ব্যয় করার জন্য মঞ্জুর করেন, সেই অর্থ মন্ত্রীসভা যথাযথ ব্যয় করছেন কিনা বিধানসভাকে তাও পর্যালোচনা করে দেখতে হয়।

তবে রাজ্য বিধানসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতারও সীমাবদ্ধতা আছে। কিছু ব্যয় আছে যা এর অনুমোদন সাপেক্ষ নয়। আবার রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যয়বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় উত্থাপন করা যায় না। কর ধার্য করা বা আদায়কৃত করের কোন অংশ রাজ্য পাবে এ সব কিছুই সংবিধান নিয়ন্ত্রিত এবং কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্ক আলোচনার সময় (প্রথম এককে) আপনারা দেখেছেন এ সব ক্ষমতাই কেন্দ্রের হাতে দেওয়া আছে। এমনকি করের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে। জরুরী অবস্থার সময়, আর্থিক ক্ষমতাও কেন্দ্রের হাতে থাকে। সুতরাং আইনসভার হাতে অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাও সীমিত।

গ. শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ

রাজ্য আইনসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা। সংবিধানে স্পষ্টত বলা আছে যে মন্ত্রীসভা যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। সুতরাং রাজ্য আইনসভা যতদিন পর্যন্ত

সন্তুষ্ট থাকে, মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বও ততোদিনই থাকে। মন্ত্রীর কাছে সংশ্লিষ্ট দফতর নিয়ে প্রশ্ন করা, রাজ্য প্রশাসনের কোন কাজে গাফিলতি দেখলে তার সমালোচনা করা এবং জবাবদিহি চাওয়া ইত্যাদি নানানভাবে বিধানসভা সর্বদা রাজ্যপ্রশাসনকে চাপের মধ্যে রাখে। বিশেষত বিরোধী দলের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধানসভার বিতর্ক, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি মন্ত্রীমণ্ডলী তথা শাসনবিভাগকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। এমনকি কোনসময় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এলে অধ্যক্ষর অনুমতিসাপেক্ষে ভোট নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যদি অনাস্থা প্রস্তাবের সপক্ষে বেশি ভোট পড়ে, তাহলে মন্ত্রীসভার পতনও ঘটতে পারে। তবে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় এই ধরনের সম্ভাবনা আপাতভাবে না থাকলেও যেভাবে জোটরাজনীতি ক্রমবর্ধমান, সেখানে শরিক দলগুলি তুচ্ছ কোন কারণে সঙ্গ ত্যাগ করলেই এই চিত্র বদলে যেতে পারে। কাজেই মন্ত্রীসভাকেও সব সময়ই বিধানসভার সমর্থন রাখার জন্য বিভিন্ন শরিক এবং দলের অভ্যন্তরীণ উপদলগুলির মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে হয়।

ঘ. রাজ্য আইনসভার অন্যান্য কাজ

আলোচিত তিনটি বিষয় ছাড়া অরও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় আইনসভার উপর বর্তায়।

প্রথমত, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদের ভূমিকা মুখ্য হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভার গুরুত্ব যথেষ্ট। ৩৬৮ ধারায় এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে যেগুলির ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের উভয়সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়াও রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের সমর্থন প্রয়োজন। এই সব বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট সম্পর্কিত কিছু ক্ষেত্র এবং কেন্দ্ররাজ্য সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার জন্য যে নির্বাচক সংস্থা গঠন করা হয়, বিধানসভার সদস্যরা সেই নির্বাচক সংস্থার সদস্য হন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে।

তৃতীয়ত, রাজ্যসভায় যাঁরা সদস্য হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাঁদের নির্বাচন করেন বিধানসভার সদস্যরা।

চতুর্থত, রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যেমন, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের বার্ষিক প্রতিবেদনে পেশ করা হয়। বিধানসভার সদস্যরা সেই বিষয়ে বিধানসভায় মতামত দিয়ে থাকেন।

পঞ্চমত, রাজ্যের আইনসভায় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, বিরোধ বিতর্ক চলে বা আইনসভার সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেগুলি সংবাদপত্র বা অন্যান্য প্রচারমাধ্যম মারফত জনমানসে ছাপ ফেলে। এইভাবে কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে জনমতও গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক বাতাবরণের পক্ষে এই ধরনের আলাপ আলোচনা সর্বদাই মঙ্গলজনক।

সর্বোপরি, রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনেই সভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করেন।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারা পর্যবেক্ষণ করে আমরা শেষ পর্যন্ত একথা বলতে পারি যে বিধান পরিষদের অস্তিত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও বিধানসভা তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যথাসম্ভব দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রীসভা যেহেতু বিধানসভার কাছে তাঁর সব কাজের জন্য দায়িত্বশীল থাকে এবং বিধানসভা যেহেতু গঠিত হয় সরাসরি জনগণের দ্বারা তাই আইনসভা সমগ্রভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। জনগণের প্রতি এই দায়বদ্ধতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে গণতন্ত্রের বীজ। তাই আইনসভা তা কেন্দ্র বা রাজ্য যে স্তরেরই হোক না কেন, তার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম।

৭৫.৪ রাজ্য আইনসভার গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী বৃন্দ ঃ কার্যাবলী ও ভূমিকা

রাজ্য আইনসভা পরিচালনা করার জন্য কয়েকজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদাধিকারীর সৃষ্টি করা হয়েছে। বিধানসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে সভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন সভা পরিচালককে মনোনীত করেন। তিনি অধ্যক্ষ বা স্পীকার নামে পরিচিত হন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে বিধানসভায় অধ্যক্ষের যাবতীয় দায়দায়িত্ব যিনি পালন করেন, তিনি উপাধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পীকার। অনুরূপভাবে বিধান পরিষদের পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হন সভাপতি বা চেয়ারম্যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন বিধান পরিষদের সহসভাপতি। এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে পালন করেন।

৭৫.৪.১ অধ্যক্ষ

বিধানসভার পরিচালক হিসাবে অধ্যক্ষের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিচালিত হয়, সেটা দেখাই অধ্যক্ষের কাজ। সুতরাং নতুন বিধানসভা গঠিত হলেই তার অধ্যক্ষ নির্বাচনের কাজ যথাসম্ভব দ্রুত সেরে ফেলতে হয়। তাই বিধানসভার প্রথম অধিবেশনেই অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের কাজটি করা হয়। এই নির্বাচন ঘটে ভোটের মাধ্যমে। তাই সঙ্গতভাবেই যে দল বা জোট সরকার গড়েন, সেই পক্ষের কোন সদস্যকেই অধ্যক্ষের পদে নির্বাচনের জন্য পাঠানো হয়। এবং তিনিই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ সরকার যাঁরা গড়েন, অধ্যক্ষ সেই দলের বা জোটের টিকিটে নির্বাচনে লড়াই করে সদস্যপদ লাভ করলেও অধ্যক্ষপদে আসীন হবার পর সভার সভাপতি হিসাবে এক নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার গুরুভার তাঁর ওপর বর্তায়। তাই এই জনপ্রিয় কক্ষের মর্যাদা ও সুনাম এই সব কিছুই অধ্যক্ষের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপর নির্ভর করে।

বিধানসভার অধ্যক্ষের ভূমিকা যে খুবই দায়িত্বপূর্ণ তা তাঁর কাজকর্ম লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বিশেষত, অধ্যক্ষ নিজে কোন বিশেষ এলাকার জনপ্রতিনিধি হয়ে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের টিকিটে

নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয় তা দুরূহ। নিরপেক্ষতার প্রশ্ন সংবিধানে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমত, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বেতনও ভাতা রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, বিধানসভার তর্কবিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। তৃতীয়ত, কোন বিষয়ে বিধানসভায় যদি ভোট হয়, সেক্ষেত্রে তিনি ভোটদান করেন না। তবে পক্ষে ও বিপক্ষে যদি সমসংখ্যক ভোট পড়ে, সেক্ষেত্রে কেবল সমাধান করার জন্য তিনি ভোট দেবেন। চতুর্থত, অধ্যক্ষের অপসারণের কোন প্রস্তাব সভায় বিবেচিত হলে অধ্যক্ষ সেই সভার সভাপতি থাকেন না। সেক্ষেত্রে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বা অন্য কোন সদস্য কাজ পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য অধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় বক্তব্য রাখতে পারেন। পঞ্চমত, অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হবার পর যতদিন বিধানসভার মেয়াদ থাকে, তিনি তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তবে তিনি ইচ্ছা করলে পদত্যাগ করতে পারেন। তাঁকে অপসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ১৪ দিনের নোটিশ দিয়ে বিধানসভার সদস্যদের এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

তবে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সংবিধানে এই সব নির্দেশ দেওয়া হলেও বিভিন্ন সময় নানান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষগণ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে চিহ্নিত হয়েছেন। যেমন ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজয় সিং নাহার, ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিধানসভায় যোগীন্দর সিং মান, ১৯৭১ সালে তামিলনাড়ুতে মাথিয়ালগনের কার্যকলাপ। আবার ১৯৮৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের বিধানসভার অধ্যক্ষ ওয়ালি মহম্মদ ইটোকে জোর করে তাঁর পদ থেকে অপসারণ সংসদীয় প্রথার বিরোধী ছবিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর পক্ষপাতপূর্ণ আচরণও সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর বিরাট আঘাত। কোন কোন সময় রাজ্যের অধ্যক্ষ যে আবার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন না তার উদাহরণও আছে। যেমন ১৯৮২ সালে কেরল ইউ ডি এফ মন্ত্রীসভা রক্ষা পায় অধ্যক্ষের নির্ণায়ক ভোটের ফলে যা রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তোলপাড় করে।

নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হন, তাঁকে নানান দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর দায়দায়িত্ব সবই লোকসভার অধ্যক্ষের সমতুল। তবে উভয়ের কার্যক্ষেত্র ভিন্ন। বিধানসভার অধ্যক্ষের কার্যাবলী আমরা কয়েকটি ভাগে আলোচনা করতে পারি।

(ক) বিধানসভার অধিবেশনগুলির সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ। সভায় আলোচনা, বিতর্ক ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অধ্যক্ষের মূল কাজ। সভায় যাতে সংসদীয় রীতিনীতি মেনে আলোচনা হয়, প্রত্যেক সদস্য বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেদিকে অধ্যক্ষ লক্ষ্য রাখেন। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, সংখ্যালঘু অংশের মতামতও যাতে সমান গুরুত্ব পায় সেদিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হয়। সভার কাজে যাতে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে তাঁর নজরদারি রাখতে হয়। এইসব দিক খেয়াল রাখতে গিয়ে অধ্যক্ষকে অনেক সময়ই অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেমন, কোন সদস্য যদি অশালীন মন্তব্য বা অসংসদীয় কথাবার্তা বলেন সেক্ষেত্রে তাঁকে সতর্ক করা এমনকি সভা থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তও তাঁকে নিতে হতে পারে। কোন সদস্য যদি

ক্রমাগত সভার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন বা অধ্যক্ষের বারণ না মানেন, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ সভার বাকী সময়ের জন্য সদস্যদের নামোল্লেখ করতে পারেন। অর্থাৎ ঐ সদস্য আর অধিবেশন চলাকালীন সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না। বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে মনে করলে তিনি অধিবেশন মুলতুবি রাখতে পারেন।

(খ) বিধানসভার কার্যক্রম স্থির করার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। বিধানসভার আলোচ্য বিষয় স্থির করা, বক্তৃতার সময় নির্দিষ্ট করা, যে কোন প্রশ্নের বা প্রস্তাবের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা তাঁরই উপর। অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন বিলের সংশোধনী প্রস্তাব বা বিলটি গ্রহণ না করার প্রস্তাব বিধানসভায় আনা যায় না। কোন বিরোধ বিতর্কের নিষ্পত্তি করার জন্য ভোট নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা এবং থাকলে তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত। সভায় বক্তৃতা চলাকালীন সদস্য বক্তার বক্তব্য যদি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় তাহলে সে আলোচনা বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

(গ) কোনও বিল বিধানসভায় পেশ করার আগে তা অর্থবিল কিনা সে ছাড়পত্র দেন অধ্যক্ষ স্বয়ং (১৯৯ (৩) ধারা)। ১৯৯(৪) ধারা অনুসারে বিধান পরিষদে পাঠানোর সুযোগ থাকলে বা রাজ্যপালের কাছে সম্মতি চাইবার জন্য পাঠাতে হলে অধ্যক্ষকে প্রত্যেক অর্থবিল সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

(ঘ) কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি বিধানসভার অবমাননা করেন, তাহলে বিধানসভার তরফ থেকে অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে শাস্তি দিতে পারেন।

(ঙ) রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার দায়িত্বও অধ্যক্ষের উপর। সদস্যদের বিশেষ অধিকারগুলি যাতে তাঁরা ভোগ করতে পারেন, সে দিকে অধ্যক্ষ বিশেষভাবে নজর রাখেন।

(চ) কোনও ব্যক্তি কোন দলের প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হবার পর যদি দলত্যাগ করেন বা দল থেকে বহিষ্কৃত হন, তাহলে দলবিরোধী আইন অনুসারে তাঁকে দলত্যাগী বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরী। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপর নির্ভর করে ঐ বিশেষ ব্যক্তি বিধানসভার সদস্য হিসাবে অধিকারগুলি ভোগ করতে পারেন কিনা। সংবিধানের ৫২তম সংশোধন অনুসারে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ স্বয়ং।

(ছ) সংসদীয় রীতি অনুসারে বিধানসভার বিভিন্ন কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখার জন্য বিধানসভার অনেকগুলি কমিটি তৈরি করা হয়। যেমন, আবেদন কমিটি, অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, সভার কাজ পরিচালনার জন্য পরামর্শদান কমিটি ইত্যাদি। এইসব কমিটি তৈরি এবং এইসব কমিটির সভাপতিগণ অধ্যক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। এইসব কমিটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁরই উপর থাকে।

(জ) বিধানসভার সঙ্গে রাজ্যপালের সংযোগের মাধ্যম হলেন অধ্যক্ষ। রাজ্যপাল বিধানসভায় কোন বিশেষ কারণে বাণী পাঠালে অধ্যক্ষ তা পাঠ করে বিধানসভার সদস্যদের শোনান।

বিধানসভার অধ্যক্ষের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে রাজ্যরাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তাঁর ভূমিকা কতোটা স্পর্শকাতর। দলমত নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা না পেলে অধ্যক্ষের পক্ষে নিরপেক্ষ থেকে তাঁর গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। তাঁর কার্যাবলীই প্রমাণ করে যে তাঁর স্থান দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে। অথচ তিনি প্রাথমিকভাবে তিনি বিধানসভার সদস্যপদ লাভ করেন কোনও একটি রাজনৈতিক দলের টিকিটে। আবার সংসদীয় রীতি অনুসারে তাঁর নির্বাচন যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতার সূত্র ধরে, তাই তাঁর নির্বাচন যে ক্ষমতাসীন দলের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে তা বলা যায়। তাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধানসভায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধী দল বারবার অনাস্থা প্রস্তাব আনলেও এই অনাস্থা প্রস্তাব কোন সময়েই পাস করানো যায়নি সংখ্যার কারণে। বিধানসভার অধ্যক্ষের পদটিকে এই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তোলা কোন সময়ই সম্ভব হয়নি। বস্তুত বিধানসভা তথা লোকসভার অধ্যক্ষের পদটিকে দলীয় রাজনীতি বিমুক্ত করে তোলার চেষ্টা সেভাবে এখনও হয়নি যা অনিবার্যভাবে প্রয়োজন।

৭৫.৪.২ উপাধ্যক্ষ

অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের কাজ চালাবার জন্য উপাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি। তাঁর বেতন, সুযোগ সুবিধা সবই অধ্যক্ষের অনুসারী। কোন কারণে যদি পদত্যাগ করেন, সেক্ষেত্রে তিনি উপাধ্যাক্ষকে সম্বোধন করে লিখতে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাঁর কাজের স্থায়িত্বও বিধানসভার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত।

৭৫.৪.৩ বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতি

বিধান পরিষদের সভাপতির কাজ মুখ্যত বিধানসভার অধ্যক্ষের মতোই। তবে যেহেতু বিধান পরিষদের ক্ষমতা বিধানসভার ক্ষমতার থেকে অনেকাংশ কম তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর ক্ষমতাও সুনির্দিষ্ট এবং অনেকটাই সীমিত। বিধান পরিষদের সহসভাপতির কাজ বিধানসভার উপাধ্যক্ষর মতোই। তবে এ ক্ষেত্রেও সহসভাপতির কাজকর্মও সীমিত ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিধান পরিষদের সভাপতি ও সহসভাপতির মেয়াদও সুনির্দিষ্ট সময়ের পর উত্তরসূরি নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকে। তাঁদের অপসারণও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এবং এক্ষেত্রেও ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

৭৫.৫ রাজ্য আইনসভার সদস্যদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার

ব্যক্তিগতভাবে বেতন, ভাতা ইত্যাদি যেমন সংবিধানে বিধায়কদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তেমনি আইনসভা ও তার সদস্যদের জন্য কিছু সুযোগসুবিধাও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেগুলি ছাড়া আইনসভার সদস্যরা তাঁদের দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না। এইসব সুযোগসুবিধা আইনসভার সদস্যদের বিশেষাধিকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই বিশেষাধিকার দু ধরনের। এর মধ্যে কিছু অধিকার আছে যা প্রতিটি সদস্য ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করেন। এছাড়াও রয়েছে আরও কিছু অধিকার যা সদস্যরা সমবেতভাবে ভোগ করেন। ভারতীয় সংবিধানের

১৯৪ ধারায় রাজ্য আইনসভা ও তার সদস্যদের এইসব বিশেষাধিকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এই ধারা অনুসারে, রাজ্য আইনসভার সদস্যদের মূলত দুটি অধিকার দেওয়া হয়েছে ঃ

(ক) বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ও (খ) কাগজপত্র প্রকাশের অধিকার। উভয় ক্ষেত্রেই আইনসভার সদস্যরা আদালতে অভিযুক্ত হবেন না। তবে এই অধিকার দুটি প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন সদস্য যদি আইনসভার নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাহলে অধ্যক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আইনসভার নিয়ম মেনে তিনি আইনসভার অভ্যন্তরে বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করবেন। যদি আইনসভার অভ্যন্তরে কোন সদস্য অন্য কোন সদস্যর বিরুদ্ধে মর্যাদা হানিকর কোন মন্তব্য করেন, সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ সেই সদস্যর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনও শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, রাজ্য আইনসভার কাজকর্ম সম্পর্কিত রিপোর্ট বা কাগজপত্র প্রকাশ করার স্বাধীনতা সদস্যদের আছে। কিন্তু এই অধিকার অবাধ নয়। অধ্যক্ষ যদি বিতর্ক থেকে কোন অংশ বাদ দেন বা তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন অথচ কোন সদস্য যদি ঐ অংশ প্রকাশ করেন, সেক্ষেত্রে ঐ সদস্য আইনসভার অবমাননার দায়ে পড়বেন।

তৃতীয়ত, আইনসভার সদস্যরা অধিবেশনের ৪০ দিন আগে এবং অধিবেশন শেষ হবার ৪০ দিন পর পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু এই বিশেষাধিকার ফৌজদারি মামলা ও নিবর্তনমূলক আটক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রেও কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতিগত নিয়মের কথা বলা হয়েছে। যেমন (ক) আইনসভার সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতির অনুমতি ছাড়া আইনসভার সীমানার মধ্যে কোনও ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার নোটিশ দেওয়া যায়। (খ) রাজ্য আইনসভার সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেফতার করা যায় না। (গ) রাজ্য আইনসভার সদস্যদের গ্রেফতার করতে হলে অধ্যক্ষকে জানাতে হয়। (ঘ) কোন সদস্যকে গ্রেফতার করার পর মুক্তি দিলেও সেই সংবাদ অধ্যক্ষকে জানাতে হবে। (ঙ) আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন সদস্যকে আদালতে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকা যাবে না।

আইনসভার প্রতিটি কক্ষ বা তাঁর সদস্যরা যৌথভাবে কিছু সুযোগসুবিধা লাভ করেন। সমষ্টিগতভাবে যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ঃ

(ক) রাজ্য আইনসভার অভ্যন্তরে যে সব তর্কবিতর্ক হয় সেগুলি প্রকাশ করা বা না করার অধিকার আইনসভার প্রতিটি কক্ষেরই রয়েছে।

(খ) রাজ্য আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন বহিরাগত দর্শকদের প্রবেশের অধিকার থাকলেও প্রয়োজনে তা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

(গ) রাজ্য আইনসভার অভ্যন্তরে যে সমস্ত আলোচনা করা হয়, তা আইনসভার সদস্যদের নিজস্ব

এক্তিয়ার। আইনসভায় কীভাবে কাজ চলবে, কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে সেগুলি নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার অন্য কারও এমনকি আদালতেরও নেই।

(ঘ) রাজ্য আইনসভার প্রতিটি কক্ষ কোন সদস্য বা অন্য যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে যদি দেখা যায় ঐ ব্যক্তি তার অধিকার ভঙ্গ করেছে। অধিকার ভঙ্গের অর্থ সভার অবমাননা। এই ধরনের অবমাননার ঘটনা ঘটলে এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য বিশেষ কমিটি আছে। এই কমিটি তিন ধরনের শাস্তির কথা বলতে পারে। যেমন, (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনসভায় হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া এবং তাকে তিরস্কার বা ভৎর্সনা করা (২) ঐ ব্যক্তিকে আইনসভায় হাজির হতে বাধ্য করা ও তীব্র ভৎর্সনা করা (৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো যদি অভিযোগ আরও তীব্র হয়।

আইনসভার এই সকল ব্যক্তিগত ও যৌথ অধিকারসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়। আইনসভার মর্যাদা রক্ষার জন্য যেমন এইসব সুযোগসুবিধা থাকা দরকার, তেমনি এগুলি থাকার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং জনসাধারণও তাঁদের আইনসভার কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা থাকে বিরত থাকতে পারে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল নয়। আইনসভার বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকার জনসাধারণের না থাকলে সমস্যা বাড়তে পারে। এই কারণেই ১৯৫৪ সালে ভারতের প্রেস কমিশন এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তুলে, আইনসভার বিশেষাধিকার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার অভিমত দিয়েছে।

৭৫.৬ রাজ্য আইনসভার আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

আইনসভায় কোন আইন পাস করতে হলে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। এইসব আইন কখনও বা পুরনো আইন বাতিল করে, কখনও বা সংশোধন করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের চাহিদা মেনে নতুন আইনকানুন তৈরিও করতে হয়। তাই সব আইনসভাতেই আইন প্রণয়নের কাজ সর্বদাই চলতে থাকে।

আমরা এর আগে (৭৫.৫.১ ক অংশে) রাজ্য আইনসভায় আইন প্রণয়নের বিষয় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছি। এখানে আইন প্রণয়নের জন্য যে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

আইনসভায় যে আইন প্রণয়ন করা হয়, তা উপস্থাপিত করার জন্য একটি প্রাথমিক খসড়া করা হয় এবং লিখিতভাবে তা পেশ করা হয়। এই লিখিত খসড়াটিকে বলা হয় বিল বা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে আইনে পরিণত হয়। এই বিল মূলত দুধরনের : সরকারি ও বেসরকারি বিল। সরকারি বিল বলতে বোঝায় সেইসব বিল যা কোন মন্ত্রী আইনসভায় উত্থাপন করেন।

অপরপক্ষে বেসরকারি বিল বলতে বোঝায় সে রাজ্য আইনসভার কোন সাধারণ সদস্য উত্থাপন করেন। এই সরকারি বিল আবার দু'ধরনের ঃ (ক) সাধারণ বিল এবং (খ) অর্থ বিল। সাধারণ বিল এবং অর্থ বিল বিধানসভায় পাস করার প্রক্রিয়া আলাদা। সংবিধান অনুসারে যে কোন সাধারণ বিল পাস করতে হলে ক্রমান্বয়ে সাতটি পর্যায় পেরোতে হয়। অর্থবিল পাসের ক্ষেত্রে অবশ্য পর্যায় সংখ্যা অনেক কম। রাজ্য আইনসভায় বিল পাসের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম অনুসরণ করা হয় সেগুলি আমরা একে একে আলোচনা করব।

সংবিধান অনুসারে, অর্থবিল বা অর্থসংক্রান্ত বিল ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় বিল আইনসভার যে কোন কক্ষেই উত্থাপন করা যায়। কোন বিল রাজ্য আইনসভার দুটি কক্ষে (যদি থাকে) গৃহীত না হলে বিলটি আইনসভায় পাস হয়েছে বলে ধরা হবে না। এ ব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন বিল অসিদ্ধ হবে কিনা সে সম্পর্কেও সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রয়েছে। বলা হয়েছে যে আইনসভার উপর কক্ষের অধিবেশন বন্ধ হওয়ার জন্য কোন বিবেচনাধীন বিল নাকচ হবে না। এছাড়া বিধানসভা পাস করেনি এমন কোন বিল বিধান পরিষদের বিবেচনাধীন থাকলে, বিধানসভা ভেঙে গেলেও তা বাতিল হবে না। কিন্তু যদি কোন বিল বিধানসভায় বিবেচনাধীন আছে, সেক্ষেত্রে বিধানসভা যদি ভেঙে যায়, সেই বিলও অসিদ্ধ বলে গণ্য হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি কোন বিল রাজ্যপালের সম্মতির জন্য বিধানসভা থেকে পাঠানো হয় তাহলে সেই বিল বিধানসভায় ভেঙে গেলেও অসিদ্ধ হবে না।

এখন আমরা দেখব রাজ্য আইনসভায় কোন বিল কিভাবে আনা হয় এবং পর্যায়ক্রমে তা আইনে পরিণত হয়। প্রথমে আমরা সরকারি বিল সম্পর্কে আলোচনা করব।

(১) <u>বিল উত্থাপন</u> ঃ কোন কোন বিষয়ে বিল পাস করা হবে সে সম্পর্কে ক্যাবিনেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেইভাবে সাধারণত বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করেন। উত্থাপনের পর বিলটি জনসাধারণকে জানাবার জন্য সরকারি গেজেট প্রকাশ করা হয়। তবে এই পর্যায়ে বিলের ওপর কোন বিতর্ক বা আলোচনা হয় না। একে বলা হয় বিলের প্রথম পাঠ।

(২) <u>দ্বিতীয় পাঠ</u> ঃ বিলের দ্বিতীয় পাঠে আলোচনা ও বিতর্কর সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ উত্থাপনের পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তিনটির মধ্যে যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ঃ (ক) বিষয়টি বিবেচনা করা হোক (খ) বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক এবং (গ) জনমত যাচাই করার জন্য প্রচার করা হোক। বিলটি বিবেচনার জন্য মন্ত্রীমহাশয় বিলের নীতি ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং বিলটির বিচার বিবেচনা করা হয়।

(৩) <u>কমিটি পর্যায়</u> ঃ বিলটি সম্বন্ধে সদস্যদের মতামত জানাবার পর মন্ত্রীমহাশয় বিলটিকে কোন সিলেক্ট

কমিটিতে পাঠান। কমিটি বিলটির খুঁটিনাটি বিচার বিবেচনা করে তার মতামত প্রদান করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। বিলটি প্রচলিত কোন আইনের বিরোধী কিনা বা কোনও সংশোধন করা প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কেও মন্তব্য করে।

(৪) রিপোর্ট পর্যায় ঃ কমিটির বিচার বিবেচনা শেষ হবার পর কমিটির চেয়ারম্যান তাঁদের বক্তব্য রিপোর্ট আকারে রাজ্য আইনসভার সংশ্লিষ্ট কক্ষে পাঠানো হয়। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর বিধানসভায় পুনরায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যাতে সদস্যগণ বিলটির বিভিন্ন ধারার আলোচনা বা সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারেন এবং রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশের উপর বিতর্ক চলতে পারে।

(৫) উত্থাপনের কক্ষে বিলটি গৃহীত হওয়া ঃ এই পর্যায়ে বিলটি গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তবে এই সময় শব্দগত সংশোধন ছাড়া অন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিসাপেক্ষে এই পর্যায়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়।

(৬) অন্য কক্ষে বিল প্রেরণ করা ঃ একটি কক্ষে গৃহীত হলে বিলটি অপর কক্ষে গ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়। তবে যেখানে রাজ্য আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সেক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন ওঠে।

(৭) রাজ্যপালের সম্মতি ঃ আইনসভার বিল পাস হবার পর রাজ্যপালের সম্মতির জন্য বিলটিকে পাঠানো হয়। রাজ্যপালের সম্মতি পেলে তবেই বিলটি আইনে পরিণত হয়। তবে রাজ্যপাল সম্মতি না দিয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরত পাঠাতে পারেন। তবে দ্বিতীয়বার বিলটি রাজ্যপালের কাছে পাঠালে রাজ্যপালের সম্মতি বাধ্যতামূলক (২০০ ধারা)। তবে রাজ্যপাল যদি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠান, তাহলে রাষ্ট্রপতির বিবেচনাই বিলটির ভাগ্য নির্ধারণ করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় (২০১ ধারা)।

বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে বিল পাশের পদ্ধতি অনুরূপ। কেবল বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে এক মাসের নোটিশ দিতে হয়। তবে অধ্যক্ষ অনুমতি দিলে এক মাসের কম সময়ও বিল উত্থাপনের সুযোগ থাকে। বেসরকারি বিল আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয়।

৭৫.৬.১ অর্থ বিল পাসের পদ্ধতি ঃ

বিল পাসের জন্য যে পদ্ধতি আলোচনা করা হল, তা অর্থ বিল পাসের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, বিধানসভা ছাড়া বিধান পরিষদে অর্থসংক্রান্ত কোন বিল উত্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয়ত, রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থ বিল বিধানসভায় উত্থাপন করা যাবে না। তৃতীয়ত, যেসব রাজ্যে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ আছে, সেখানে সুপারিশের জন্য অর্থ বিল যদিও পাঠাতে হয়, তবু বিধান পরিষদ সুপারিশ পাঠালেও অর্থ বিল সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান করার কোন ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই। এই বিলটি বিধান

পরিষদকে পাঠাতে হয় ১৪ দিনের মধ্যে। আর ঐ সময়ের মধ্যে না পাঠালে ধরে নিতে হবে যে বিলটি উভয় কক্ষের সম্মতি লাভ করেছে। চতুর্থত, বিধানসভাতে যে অর্থবিল গ্রহণ করা হবে সেই বিলটি অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে বিলটির যোগ্যতাপত্র দেবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।

কোন বিল অর্থবিল সে সম্পর্কে অধ্যক্ষ যে যোগ্যতাপত্র দেন তার ভিত্তি সংবিধানের ১৯৯ ধারা। বলা হয়েছে কোন করস্থাপন, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল অর্থ বিল। এছাড়া রাজ্যসরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা গ্যারান্টি প্রদানের নিয়ন্ত্রণ অথবা রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গ্রহণীয় কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন, রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিকতা তহবিলের জিম্মা, অর্থপ্রদান বা অর্থ উঠিয়ে নেওয়া, কোন ব্যয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য বলে ঘোষণা বা ব্যয়ের বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল বা সরকারি গণিতক খাতে অর্থপ্রাপ্তি ঃ এইসব বিষয়ের উপর আনীত বিল অর্থবিল বলে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য, জরিমানা ব আর্থিক দণ্ড, লাইসেন্সের জন্য ফী বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন দর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন ইত্যাদি অর্থবিলের আওতায় পড়ে না।

৭৫.৭ রাজ্য আইনসভার অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি

সংবিধানের ২০২ থেকে ২০৭ ধারায় রাজ্য আইনসভার অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে রাজ্য আইনসভার উপর রাজ্যের অর্থসংক্রান্ত নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে করধার্য বা বৃদ্ধির প্রস্তাব কেবল মন্ত্রীরাই করতে পারেন। তবে অন্যান্য সদস্যরা কোন কর কমাতে বা স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। সংবিধানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে আইনসভার অনুমোদন ছাড়া কোন কর বসানো হবে না। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে আইন ছাড়া সরকার কোন অর্থ তুলতে পারবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে আইনের অনুমোদন দরকার। এছাড়া রাজ্যপালের সুপারিশ ছাড়া ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করা যাবে না। এছাড়া আমরা এর আগেই দেখেছি যে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কেবল বিধানসভার এক্তিয়ার রয়েছে।

সংবিধানে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বছরের আয়ব্যয়ের হিসাব রাজ্য আইনসভায় উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা করবেন। আয়ব্যয়ের এই বার্ষিক আনুমানিক হিসাব বা বাজেট রাজ্য আইনসভায় সাধারণত পেশ করেন অর্থমন্ত্রী। এই আনুমানিক ব্যয়ের দুটি অংশ আছে। (ক) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় এবং (খ) অনুমোদন সাপেক্ষ ব্যয়। সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলতে বোঝায় রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা এবং দপ্তরের জন্য অন্যান্য ব্যয় এবং এই অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সভাপতি, সহসভাপতির বেতন ও ভাতা, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা, সরকারি ঋণজনিত ব্যয় ইত্যাদি। এছাড়া আইনসভা আইন করে যে কোন ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা করতে

পারেন। এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় প্রতি বছর বিধানসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। আইনসভায় অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার পর বাজেটের সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। এই পর্বে বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম ও রাজ্যসরকারের নীতিসমূহ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে সরকারি আয়ব্যয়ের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ আইনসভার পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। তাই সরকারি আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আইনসভাকে সহায়তা করার জন্য তিন ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি হল (ক) ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক যার মূলকাজ আইনসভার পক্ষ থেকে সরকারি ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে দেখা এবং রাজ্যপালের কাছে সেই রিপোর্ট পেশ করা। রাজ্যপাল আবার ঐ রিপোর্ট রাজ্য আইনসভায় পাঠিয়ে দেন। (খ) সরকারি গাণিতিক কমিটি যার প্রধান কাজ সরকারের বিনিয়োগে হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখা। এবং (গ) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি যার মূল কাজ সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবের কাজে সাহায্য করা।

৭৫.৮ সারাংশ

ভারতের সংবিধানে রাজ্যস্তরে যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে রাজ্য আইনসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় রীতিনীতি মেনে নিয়মকানুন প্রবর্তনা করতে গিয়ে আইন পাস করার পদ্ধতি যথেষ্ট জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছে। অর্থবিল পাস করার ক্ষেত্রে আবার কিছুটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। যেসব রাজ্যে আইনসভার দুটি কক্ষ থাকে, সেখানে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

রাজ্য আইনসভার পরিচালনার দায়িত্ব অধ্যক্ষের। বিধানসভায় অধ্যক্ষের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হয়। অধ্যক্ষের যথাযথ ভূমিকা পালন কার্যপদ্ধতিকে সহজ ও সুন্দর করে তোলে।

৭৫.৯ অনুশীলনী

১। রাজ্য আইনসভার গঠন পদ্ধতি কী প্রকার?

২। রাজ্য আইনসভার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। বিধানসভায় অধ্যক্ষের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৪। রাজ্য আইনসভার সদস্যদের অধিকার ও অব্যাহতি বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা রয়েছে?

৫। রাজ্য বিধানসভায় কীভাবে আইন পাস করা হয়?

৬। অর্থবিল পাশের পদ্ধতি কী?

৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India.* Wadhawand Company. Nagpur, August 1999.

২। নির্মলকান্তি ঘোষ : পূর্বোল্লিখিত

৩। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র : পূর্বোল্লিখিত

৪। S. L. Sikri : *Indian Government and Politics* (1989)

একক ৭৬ ❐ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

গঠন

৭৬.০ উদ্দেশ্য

৭৬.১ প্রস্তাবনা

৭৬.২ সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি

৭৬.৩ সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকার

৭৬.৪ উপসংহার

৭৬.৫ সারাংশ

৭৬.৬ অনুশীলনী

৭৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতের সংবিধান কতো সহজে অথবা কী ধরনের সতর্কতা সাপেক্ষে পরিবর্তন করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- সংবিধান সংশোধন করতে হলে কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে মৌলিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিরোধবিতর্ক বিষয়ে জানতে পারবেন।

৭৬.১ প্রস্তাবনা

যে কোন দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয়। সুতরাং কোন রাষ্ট্রের সংবিধান পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি কোন প্রেক্ষাপটে সেই দেশের শাসনসংক্রান্ত নিয়মকানুন তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাই। কিন্তু সময় থেমে থাকে না। পরিস্থিতিও বদলায়। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার চরিত্রও বদলাতে থাকে। স্বভাবত এইসব বদলের হাত ধরে মাঝে মাঝে এমন কিছু সঙ্কট এসে দাঁড়ায় যে

দেশের শাসকগোষ্ঠী মনে করেন যে দেশের নিয়মকানুনের কিছু বদল ঘটানো প্রয়োজন। তখনই প্রশ্ন ওঠে সংবিধান সংশোধনের। কিন্তু সংবিধান যেহেতু রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত মৌলিক আইনের সংকলন, তাই সেই পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সঙ্গতভাবেই নানান প্রশ্ন ওঠে। যেমন কোন সুনির্দিষ্ট সংবিধান সংশোধন রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত পরিকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কিনা অথবা কোন সংশোধনের ফল কোন ক্ষতিসাধন করছে কিনা। তাছাড়া কোন ক্ষতিসাধন করছে কিনা। তাছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকার সুবাদে বিশেষ কোনও সুবিধা করে নিচ্ছে কিনা যা শেষ পর্যন্ত জনহিতকর নয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে তাই কোন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করার পদ্ধতি সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক বাস্তবিক, সব দেশের সংশোধন পদ্ধতি এক রকম নয়। রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো, আদর্শগত অবস্থান ভেদে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিও 'বদলায়'। ভারতীয় সংবিধানেও তার সংশোধন পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো অনুসারে নির্মিত হয়েছে।

একক ১-এ ভারতীয় সংবিধানের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রীয় বহু বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাজনৈতিকভাবে এককেন্দ্রিক শাসনের প্রতি ঝোঁক থাকার কারণে ভারতের সংবিধান লিখিত হলেও সুপরিবর্তনীয় নয়। তাই এর থেকে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি একটু জটিল। এর পরে আমরা ভারতের সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

৭৬.২ ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি

ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে গেলে কী ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, এ সম্পর্কে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা নানান ধরনের মতামত দেন। এ নিয়ে গণপরিষদে নানা তর্কবিতর্ক চলে। যুগোপযোগী হয়ে ওঠার জন্য অনেকে সংশোধন পদ্ধতিকে যেমন সহজ করতে চেয়েছেন, তেমনি অনেকে রাষ্ট্রের মৌলিক নিয়মকানুনের দ্রুত পরিবর্তন করতে চাননি। তবে সকলেই চেয়েছিলেন সংবিধানকে গতিশীল রাখতে। সেই কারণে সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঋজুতা না রেখে আইনসমূহের চরিত্র অনুসারে পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সংবিধানের সব আইনই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একই রকম অনুসরণ করবে, সেকথা বলা হয়নি। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই মূলত তিন ধরনের পদ্ধতির কথা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির সাহায্যে সংবিধানের সংশোধন ঘটানো যেতে পারে।

প্রথমত, সংবিধানের কিছু বিষয় রয়েছে, যার পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কোনও বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়গুলির সংশোধনের জন্য সংসদের যে কোন কক্ষেই বিল উত্থাপন করা যায়। প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত এবং ভোট প্রদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি বিষয়টিকে সমর্থন করেন তাহলে বিলটি সংসদে অনুমোদন পেয়েছে বলে মনে করা হয়। এইভাবে অনুমোদন লাভ করার পর

নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুসারে, সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে এই পরিবর্তনকে সংবিধান সংশোধন বলে অভিহিত করা হয় না। নতুন রাজ্যের সৃষ্টি বা রাজ্য পুনর্গঠন, পুরনো রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তন, অঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের সৃষ্টি ও বিলোপসাধন, সংসদের সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা নির্ধারণ, সাংসদদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ, ভারতের সরকারি ভাষা, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, তফশীলভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসন ও তফশীলভুক্ত উপজাতিদের বিষয়, সংবিধানের দ্বিতীয় তফশীলের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের সংশোধনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে সংবিধানের এই বিষয়ের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংবিধান খুবই নমনীয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আছে যেগুলি পরিবর্তন করতে হলে কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় স্তরের আইনসভার প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা উচিত। কারণ এইসব বিষয়ের সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের স্বার্থই জড়িত। এই ধরনের সংশোধন কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে থাকলে রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। অপরপক্ষে রাজ্য আইনসভার হাতে বিষয়গুলির সংশোধনের এক্তিয়ার থাকলে, তা কেন্দ্রের স্বার্থবিরোধী হতে পারে। সেই কারণে বিশেষ কিছু বিষয় সম্পর্কে সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং রাজ্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও নির্বাচন পদ্ধতি, কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসনবিভাগের এক্তিয়ার, কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য হাইকোর্ট গঠন, সপ্তম তফশীলে বর্ণিত কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ইত্যাদি। এইসব বিষয়ের যে কোন অংশ সংশোধন করতে হলে সংসদের যে কোন কক্ষে বিলটি উত্থাপন করা হয়। বিল অনুমোদনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ঐ সংখ্যাটি সংসদের উভয় কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত অর্ধেক হতে হবে। এইভাবে সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদন পেলে ঐ বিলটি অঙ্গরাজ্যগুলিতে পাঠাতে হবে। রাষ্ট্রের মোট অঙ্গরাজ্যের অর্ধেক আইনসভার অনুমোদন পেলে ঐ বিল রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্যে পাঠাতে হবে। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করলে ঐ বিল আইনে পরিণত হবে। বোঝা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে সংশোধন পদ্ধতিটি যথেষ্ট জটিল। সুতরাং বোঝা গেল সংবিধানের এই সব অংশ দুষ্পরিবর্তনীয়।

তৃতীয়তঃ, ভারতের সংবিধানের আবার এমন কিছু বিষয় আছে, যার সংশোধনের জন্য রাজ্য আইনসভায় প্রেরণ করতে না হলেও পরিবর্তন যথেষ্ট জটিল। এই অংশগুলি সংসদে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে এককভাবে সংশোধন করা যায়। সংবিধান সংশোধন করতে হলে এক্ষেত্রেও সংসদের যে কোন কক্ষে সংশোধনী বিল উত্থাপন করা যায়। ঐ বিল উভয় কক্ষে পৃথকভাবে মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেক এবং উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী এই তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। তবে ভোট প্রদানকারী সদস্যদের এই

দুই তৃতীয়াংশকে মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমান হতে হবে। অন্য দুটি পদ্ধতির মতো এক্ষেত্রেও উভয় কক্ষের অনুমোদন পেলে বিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো নয়। সম্মতি পেলে ঐ বিল আইনে পরিণত হয়।

সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কোন একটি বিশেষ রাস্তায় চলেনি। যার ফলে ভারতের সংবিধান যেমন অতিমাত্রায় সুপরিবর্তনীয় করা হয়নি তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সংশোধন যথেষ্ট নমনীয়। আসলে এই দুইয়ের ভিতর সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আসলে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই সব থেকে গুরুত্ব দেয়, তাই সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলিতে কোন কোন রাজনৈতিক দল কতোটা ক্ষমতাসম্পন্ন, তারই উপর নির্ভর করে সংবিধান সংশোধন কতোটা নমনীয় হবে। বিশেষত সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কোন সাংবিধানিক সভার কথা বলা হয়নি এবং এই ক্ষমতা কেবল সংসদের হাতে তুলে দেওয়ায় এ বিষয়ে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তারই। এই অবস্থায় তাই ক্ষমতাসীন দলের প্রাধান্য থাকলে সংশোধনের কোন সমস্যাই থাকে না।

৭৬.৩ সংবিধান সংশোধন ও মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮ ও ৩৬৮ ধারায় সংসদের হাতে সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব যেমন তুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনি কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে সংবিধানের কোন কোন অংশের পরিবর্তন করা যাবে, সে সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংসদের হাতে তুলে দেওয়া এই অধিকার অবাধ কিনা সে সম্পর্কে নানান ভাবনাচিন্তা লক্ষ্য করা যায়। মূলত যে বিষয়কে কেন্দ্র করে নানান প্রশ্ন বার বার উঠেছে, তা হল সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় সংশোধন সম্পর্কে। অর্থাৎ সংবিধান কি তার মৌলিক অধিকার পর্যন্ত সংশোধন করার এক্তিয়ার সংসদের হাতে তুলে দিয়েছে? এই প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া যথেষ্ট সঙ্গত। কারণ আমরা জানি যে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মনে করা হয়েছে সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে সাদা কালো অক্ষরে লেখার অর্থ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকে ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা প্রদান করা যা যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত। আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগ যাতে এই অধিকারগুলি খর্ব করতে না পারে, সংবিধানে সে সম্পর্কে যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি বিচারবিভাগের হাতে এই অধিকারগুলি রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই প্রশ্ন উঠেছে যে সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে পারে কিনা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে বিচার বিভাগকে এই অধিকারগুলি রক্ষা করতে বলা হয়েছে, সেই বিচার বিভাগের নানান সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য প্রসঙ্গটিকে জটিল করে তুলেছে। যেমন ১৯৫১ সালে শঙ্করী প্রসাদ মামলা এবং ১৯৬৫ সালে সজ্জন সিং মামলার রায় দেওয়ার সময় প্রধান ধর্মাধিকরণ এই মন্তব্য করেন যে সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারে। এরই দুই বছর পর ১৯৬৭ সালে

গোলোকনাথ এবং অন্যান্য বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায় প্রধান ধর্মাধিকরণ বলেন যে মৌলিক অধিকার সংশোধন করার কোন ক্ষমতা সংসদের নেই। অর্থাৎ এই মামলার রায়ে দেখা গেল যে এরপর থেকে সংবিধান সংশোধন করে সংসদ কোনভাবেই মৌলিক অধিকারের কোন পরিবর্তন করতে পারবে না। সুতরাং এই রায়কে সংশোধন করার জন্য ১৯৭১ সালে সংবিধানের ২৪ ও ২৫ তম সংশোধন করা হল।

২৪তম সংশোধনে বলা হল যে সংসদ প্রয়োজনে মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য যে কোন অংশের সংশোধন করতে পারবে এবং সংসদের উভয় কক্ষে এই সংশোধনী বিল একবার গৃহীত হয়, তাহলে সেই বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকবেন। এবং এই সংশোধনী গৃহীত হবার পর বিলটি আইনে পরিণত হয় এবং এরই অব্যবহিত পরে ২৫তম সংশোধনীতে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ৩১ (২) ধারাকে সংশোধন করা হয় এবং ঐ ধারা থেকে 'ক্ষতিপূরণ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে এই কথাও সংশোধনীতে বলা হল যে নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করবার জন্য যদি রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইন যদি মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত ৪, ১৯ বা ৩১ ধারাকে খর্বও করে তবু সেই সংশোধন গৃহীত হবে। অর্থাৎ কোনক্রমেই সেই সংশোধনী বিল বাতিল করা যাবে না। আদালতেও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যাবে না। সুতরাং বোঝা গেছে সংবিধানের ২৪ ও ২৫ তম সংশোধন সংসদের সংশোধনী ক্ষমতাকে আরও দৃঢ় করে তুলল। এর কিছুদিন পরে ১৯৭৩ সালে প্রধান ধর্মাধিকরণ কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য মামলায় রায় দেন যে সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুসারে সংবিধানের যে কোন অংশ এমনকি মৌলিক অধিকারেরও সংশোধন করতে পারবে। তবে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করার কোন এক্তিয়ার নেই, কিন্তু মৌলিক কাঠামো বলতে ঠিক কি বোঝানো হচ্ছে তা মামলার রায়ে সুস্পষ্ট নয়। সুতরাং এরই অব্যবহিত পরে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বিশাল পরিবর্তন আনা হয়। এই সংশোধনে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে বলা হয় যে সংসদের কোন সংশোধন সম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না।

১৯৮০ সালে আর একটি মামলায় প্রধান ধর্মাধিকরণ (সুপ্রীম কোর্ট) স্বীকার করেন যে মৌলিক অধিকার সংশোধনযোগ্য। মিনার্ভা অয়েল মিলস্ মামলায় রায় দেওয়া হয় যে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কার্যকর করতে রাষ্ট্র যে মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ করতে পারবে এবং সংবিধান সংশোধনকে আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না এই বিষয়গুলি সংবিধান-বহির্ভূত বলে বাতিল করে দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে মনে হয় যে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংশোধন প্রসঙ্গে আইনবিভাগ ও বিচার বিভাগের যে টানাপোড়েন চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত যে অবস্থায় বিষয়টি এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সংবিধানকে প্রাথমিক বিচারে যতটা দুষ্পরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিগত ৫১

বছরে সংবিধান সংশোধন হয়েছে প্রায় নব্বই বার। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুশ বছরের ইতিহাস সংশোধন হয়েছে ২৭ বার মাত্র। সুতরাং সংখ্যার বিচারে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলে মনে করার তেমন কোনও কারণ নেই।

৭৬.৪ উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানকে বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান। তার অসংখ্য অধ্যায়-ধারা-উপধারা তফশীলে ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিচিত্র ও ব্যাপক সমস্যার সমাধান করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন সংবিধান প্রণেতারা। কেন্দ্রমুখী দ্বিবিধ শাসন ব্যবস্থার চাহিদা মেনে সংবিধান রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়। তবে সমস্যা এতোই জটিল এবং বিচিত্র যে সব সমস্যা মেটাবার মতো ব্যবস্থা এই সংবিধান দিতে পারেনি। সেই সঙ্গে সদাপরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে বারবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সংবিধান সংশোধন করার। কিন্তু সংশোধন পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছু ফাঁক থেকে যাওয়ায় অনেকেই মনে করেছেন যে এই পদ্ধতিগুলির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। যেমন সংসদের হাতে এই সংশোধনী ব্যবস্থা মূলত থাকার ফলে এবং অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করার কোন সুযোগ না থাকার ফলে, অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতি এক্ষেত্রে সুবিচার করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকার ফলে ক্ষমতাসীন দল কতোটা ক্ষমতাসম্পন্ন, তার উপরই নির্ভর করে সংবিধান সংশোধন কতোটা অবাধ হবে। বিশেষত মৌলিক অধিকার পরিবর্তন করা যাবে কিনা এবং আদৌ সেটা কাম্য কিনা সে প্রশ্ন বারবার উঠেছে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে। সংবিধান চালু হবার পর থেকে ১৯৬৭ সালে গোলোকনাথ মামলার রায় দানের পূর্ব পর্যন্ত বারবারই সংসদের ক্ষমতাই যে চূড়ান্ত সে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গোলোকনাথ মামলা থেকে মিনার্ভা মিলস্ মামলা পর্যন্ত আদালত বারবারই সংসদের এই অবাধ ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং বাধাদান করার চেষ্টাও করেছে। বাস্তবিক ৪২তম সংবিধান সংশোধন যে সংসদকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়ার জন্যই করা হয়েছিল, তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। আইনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের মধ্যে সংবিধান সংশোধনকে কেন্দ্র করে যে টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যে আইনসভার দিকেই পাল্লা ভারী হয়েছে তা সুস্পষ্ট।

৭৬.৫ সারাংশ

ভারতের সংবিধান কতোটা সুপরিবর্তনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে জানা প্রয়োজন ভারতের সংবিধান সংশোধন কীভাবে করা যায়। দেখা গেলে ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। মূলত, তিন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন সংশোধনের সময় প্রয়োগ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে সহজেই পরিবর্তন ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য উভয় স্তরের

সরকারেরই সম্মতি প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন যথেষ্ট জটিল। এতদসত্ত্বেও নানান কারণে ভারতের সংবিধানে প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে।

৭৬.৬ অনুশীলনী

১। সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা কী?

২। ভারতের সংবিধান সংশোধন করার পদ্ধতিগুলি কী কী?

৩। ভারতের সংবিধান কি দুষ্পরিবর্তনীয়? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। মৌলিক অধিকারগুলি কি সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য?

৫। সংবিধান সংশোধনে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির কোনো ভূমিকা আছে কি?

৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। নির্মলকান্তি ঘোষ ঃ *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।*

২। সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র : *"ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।*

৪। Durga Das Basu : *Introduction to the Constitution of India* (1999)।

সংবিধান সংশোধনের সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সংবিধান চালু হবার পর থেকে ১৯৯২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৭৬ বার সংশোধিত হয়েছে। সংশোধনের সংক্ষিপ্তসার এখানে আলোচনা করা হল।

প্রথম সংশোধন : ১৯৫১। ভূ-সম্পত্তি ও মধ্যসত্ত্বভোগী সম্পর্কে রাজ্য আইনসভার আইনকে বৈধতা দান।

দ্বিতীয় সংশোধন : ১৯৫২। সংসদে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে পরিবর্তন করা হয়।

তৃতীয় সংশোধন : ১৯৫৪। রাজ্য, কেন্দ্র এবং যুগ্ম তালিকা সংশোধন করা হয়।

চতুর্থ সংশোধন : ১৯৫৬। জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয় আদালতের বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার বহির্ভূত রাখা হয়।

পঞ্চম সংশোধন : ১৯৫৫। রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয় রাজ্যের মতামত জানানোর একটি সময়-সীমা নির্ধারণ করার জন্য এই সংশোধন প্রয়োজন হয়েছিল।

ষষ্ঠ সংশোধন : ১৯৫৬। পণ্য বিক্রয়ের উপর কর-সংক্রান্ত বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য ২৬৯ এবং ২৮৬ নং ধারা সংশোধন করা হয়।

সপ্তম সংশোধন : ১৯৫৬। রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয় সরকারি সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য এই সংশোধন প্রয়োজন ছিল।

অষ্টম সংশোধন : ১৯৫৯। তফশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায় ও ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা দশ বছরের পরিবর্তে কুড়ি বছর করা হয়।

নবম সংশোধন : ১৯৬০। বেরুবাড়ি হস্তান্তর সম্পর্কে ভারত সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তিকে কার্যকর করা হয়।

দশম সংশোধন : ১৯৬১। পূর্বতন পর্তুগীজ অধিকৃত দাদরা ও নগর হাভেলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মর্যাদা দেওয়া হয়।

একাদশ সংশোধন : ১৯৬১। নির্বাচনী সংস্থায় কোন প্রকার শূন্যতার ফলে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন যাতে উত্থাপিত হতে না পারে তার ব্যবস্থার জন্যই এই সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছি।

দ্বাদশ সংশোধন : ১৯৬১। গোয়া, দমন এবং দিউকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। তার জন্য ২৪০ নং ধারা এবং প্রথম তপশিল সংশোধন করা হয়।

ত্রয়োদশ সংশোধন : ১৯৬২। নাগাল্যান্ডের প্রশাসনের জন্য বিশেষ কয়েকটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছিল। একটি নতুন অংশ যুক্ত করে ওই রাজ্যের রাজ্যপালকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই সংশোধনে নাগাল্যান্ডের আইনসভার গঠন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়।

চতুর্দশ সংশোধন : ১৯৬২। ফরাসি-অধিকৃত পন্ডিচেরীকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধন : ১৯৬৩। ১২৪, ১২৮, ২১৭, ২২২, ২২৫-ক, ২২৬, ২৯৭, ৩১১ নং ধারা সংশোধন করা হয়।

ষোড়শ সংশোধন : ১৯৬৩। ১৯ নং ধারায় যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধের অংশকে সংশোধিত করে 'ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার' ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়। এছাড়াও ৮৪ এবং ১৭৩ নং ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছিল, রাজ্য আইনসভা এবং সংসদ নির্বাচন প্রার্থীদের সংবিধানের প্রতি এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার শপথ গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তদশ সংশোধন : ১৯৬৪ সালের জুন মাসে সপ্তদশ সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে সংশোধন করা হয়।

অষ্টাদশ সংশোধন : ১৯৬৬। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির নাম সীমানা প্রভৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা সংসদকে ন্যস্ত করা হয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মতামত গ্রহণের কোন প্রয়োজন হবে না।

ঊনবিংশ সংশোধন : ১৯৬৬। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে হাইকোর্টকে সংসদ এবং রাজ্য আইনসভায় নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করার অধিকার দেওয়া হয়।

বিংশতি সংশোধন : ১৯৬৬। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের সিদ্ধান্তের বৈধতা ঘোষিত হয়।

২১-তম সংশোধন : ১৯৬৭। সিন্ধি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২২-তম সংশোধন : ১৯৬৯। অসম রাজ্যের পুনর্গঠন।

২৩-তম সংশোধন : ১৯৭০। লোকসভা এবং রাজ্য আইনসভায় তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২৪-তম সংশোধন : ১৯৭১। সংশোধনের মাধ্যমে ১৩ এবং ৩৬৮ নং ধারা সংশোধন করে উল্লেখ করা হয় যে, সংসদ মৌলিক অধিকার সংশোধন করতে পারবে। মৌলিক অধিকার সংশোধন করে কোন বিল সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দানে বাধ্য।

২৫-তম সংশোধন : ১৯৭১। সরকারি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এই সংশোধন করা হয়।

২৬-তম সংশোধন : ১৯৭১। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের শাসকদের রাজন্যভাতা বিলোপ করা হয়।

২৭-তম সংশোধন : ১৯৭১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুনর্বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়।

২৮-তম সংশোধন : ১৯৭১। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত কর্মচারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটানো হয়।

২৯-তম সংশোধন : ১৯৭২। কেরালার দুটি ভূমি-সংস্কার আইন সংবিধানের নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩০-তম সংশোধন : ১৯৭২। দেওয়ানি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য যে অর্থের পরিমাণের বিষয় উল্লেখ ছিল, তা বাতিল করা হয়।

৩২-তম সংশোধন : ১৯৭৩। লোকসভার সদস্যসংখ্যা ৫২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৪৫ করা হয়।

৩২-তম সংশোধন : ১৯৭৪। অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩৩-তম সংশোধন : ১৯৭৪। আইনসভার সদস্যকে যাতে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদত্যাগে বাধ্য করা না যায় তার জন্য ১০১ এবং ১৯০ নং ধারা সংশোধন করে পদত্যাগের কার্যকারিতা সংশ্লিষ্ট কক্ষের অধ্যক্ষের পদত্যাগের গ্রহণের উপর নির্ভর করবে বলে স্থির করা হয়।

৩৪-তম সংশোধন : ১৯৭৪। ২০টি রাজ্য বিলকে সংবিধানের নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সংশোধনের ফলে আদালতে ওই আইনগুলির সাংবিধানিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাবে না।

৩৫-তম সংশোধন : ১৯৭৪। সিকিমকে ভারতের 'সহযোগী' রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২-ক নং ধারা এবং দশম তফশিল সংযোজন করা হয়।

৩৬-তম সংশোধন : ১৯৭৫। সিকিমকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়।

৩৭-তম সংশোধন : ১৯৭৫। লক্ষ্য ছিল অরুণাচল প্রদেশে একটি বিধানসভা এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা।

৩৮-তম সংশোধন : ১৯৭৫। কতকগুলি বিষয়কে আদালতের পর্যালোচনা-বহির্ভূত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সংশোধন অনুসারে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের প্রশাসক কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারির ব্যাপারে তাঁদের সন্তুষ্টি ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

৩৯-তম সংশোধন : ১৯৭৫। ৩৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় আইনকে নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার অধ্যক্ষের নির্বাচন-সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির দায়িত্ব হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের হাত থেকে প্রত্যাহার এবং একটি কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হয়।

৪০-তম সংশোধন : ১৯৭৬। ভূমি-সংস্কার, জমির ঊর্ধ্বতম সীমা, চোরা চালানকারীদের সম্পত্তি

বাজেয়াপ্তকরণ সম্পর্কিত কয়েকটি আইনকে নবম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪১-তম সংশোধন : ১৯৬১। রাজ্য রাষ্ট্র-কৃত্যকের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬২ বছর করা হয়।

৪২-তম সংশোধন : ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

৪২-তম সংশোধনে প্রস্তাবনার সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্ম নিরপেক্ষ' শব্দদ্বয় যুক্ত করে ভারতকে একটি 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তা ছাড়া 'ঐক্যের' পর 'সংহতি' শব্দটি সংযোজন করা হয়েছিল।

এই সংশোধনের মাধ্যমে নির্দেশমূলক নীতির আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি করা হয়। নির্দেশমূলক নীতির সঙ্গে আরও নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। এই নতুন বিষয়সমূহ হল : শিশুরা যেন সুস্থ, স্বাধীন এবং মর্যাদার সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য সুযোগ-সুবিধার সমান ব্যবস্থা, সুযোগের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করা, শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা, প্রকৃতির পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং দেশের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী রক্ষা করা। এই সংশোধনে যে কেবল ওই অংশসমূহ সংযোজনের জন্য ৩৯ নং ধারা সংশোধন করা হয়েছে তাই নয়, এই সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের উপর নির্দেশমূলক নীতির প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মূল সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিল না। ৪২-তম সংশোধনের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের দশটি কর্তব্যের বিষয় উল্লেখ করা হয়।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও পরিচালন ক্ষমতা-সংক্রান্ত বিষয়ের গুণগত পরিবর্তন করা হয়। মূল সংবিধানে উল্লেখিত ছিল, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য এবং পরামর্শদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য, এমন কোন নির্দেশ সেখানে ছিল না। ৪২-তম সংশোধনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীপরিষদের সাহায্য এবং পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য।

লোকসভা এবং রাজ্যসভার কার্যকাল ছ বছর করা হয়। ২০০০ সালের জনগণনার হিসেব পাওয়ার আগে পর্যন্ত আসন বণ্টনের বিষয়টি রাষ্ট্রপতির আদেশের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

রাষ্ট্রপতিকে দেশের কোন অংশের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তা ছাড়া ৩৫৬ নং ধারা সংশোধন করে উল্লেখ করা হয়, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা-সংক্রান্ত কোন ঘোষণাকে সংসদের অনুমোদনের অন্য পেশ করলে এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ওই ঘোষণা এক বছর বলবৎ থাকবে। মোট তিন বছর পর্যন্ত ওই ঘোষণা বলবৎ থাকতে পারে।

আদালত কোন সংবিধান সংশোধন আইনের বৈধতা বিচার করতে পারবে না। সংবিধান সংশোধনের

ক্ষেত্রে সংবিধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা, আদালত কেবল সেই বিষয়টিই বিবেচনা করতে পারে।

৪২-তম সংশোধনে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এই সংশোধনের মাধ্যমে নতুন ধারা সংযোজন করে বলা হয় কোন রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যাহত হলে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সশস্ত্রবাহিনী পাঠাতে পারে এবং ওই সশস্ত্রবাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে।

সংবিধানের সপ্তম তফশিলের অন্তর্গত যুগ্ম তালিকা সংশোধন করে শিক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে দেশের যে কোন অংশে সশস্ত্রবাহিনী পাঠানো, বিচার পরিচালনা, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া অন্যান্য আদালত গঠন, বন্যপ্রাণী এবং পাখি সংরক্ষণ, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা, শ্রমিকদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণকে ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪৩-তম সংশোধন : ১৯৭৭। এই সংশোধনের মাধ্যমে ৪২-তম সংশোধন দ্বারা সংযোজিত জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ এবং সংগঠন সম্পর্কে যে বক্তব্য যুক্ত করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দেওয়া।

সুপ্রীম কোর্টকে ৪১-তম সংশোধনের পূর্বের অবস্থার মতো রাজ্য আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা হয়। একইভাবে হাইকোর্টকে কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা হয়।

৪৪-তম সংশোধন : ১৯৭৮। ৪২-তম সংশোধনের কতকগুলি অংশকে বাতিল করা হয়।

৪৫-তম সংশোধন : ১৯৮০। তফশিলি সম্প্রদায়, তফশিলি উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের মেয়াদ আরও দশ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে।

৪৬-তম সংশোধন : ১৯৮৩। রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিক্রয়করের ত্রুটি সংশোধনের জন্য এই সংশোধন করা হয়।

৪৮-তম সংশোধন : ১৯৮৪। পাঞ্জাবে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ দুবছর করা হয়।

৪৯-তম সংশোধন : ১৯৮৪। ত্রিপুরায় স্বায়ত্তশাসিত উপজাতীয় জেলার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য এই সংশোধন অপরিহার্য ছিল।

৫০-তম সংশোধন : ১৯৮৪। গোয়েন্দাগিরি অথবা গোয়েন্দাগিরি প্রতিরোধের জন্য গঠিত কোন ব্যুরো বা প্রতিষ্ঠান কর্মরত ব্যক্তি এবং কোন বাহিনীর জন্য গঠিত টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা বা তার সঙ্গে জড়িত কোন সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালন এবং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে সংবিধানের তৃতীয় অংশে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার বাতিল ও সীমিতকরণের বিষয় যুক্ত করা হয়েছে।

৫১-তম সংশোধন : ১৯৮৪। এই সংশোধন আইনে ৩৩০ নং ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে, একমাত্র অসমের স্বয়ং-শাসিত জেলা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে তফশিলি সম্প্রদায় এবং তফশিলি উপজাতিদের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৫২-তম সংশোধন : ১৯৮৫। এই সংশোধনের মাধ্যমে দলত্যাগের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়।

৫৩-তম সংশোধন : ১৯৮৬ সালের আগস্ট। এই সংশোধনে উল্লেখ করা হয় মিজোদের সামাজিক নিয়মকানুন, দেওয়ানি এবং প্রথাগত আইন, ভূমি হস্তান্তরের আইন অব্যাহত থাকবে।

একমাত্র মিজোরামের বিধানসভা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। মিজোরাম চুক্তির পূর্বে মিজোরামে যে আইন অব্যাহত ছিল, সেই ক্ষেত্রে সংসদপ্রণীত আইন কার্যকর হবে না। মিজোরামের বিধানসভা ৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

৫৪-তম সংশোধন : ১৯৮৬। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হয়।

৫৫-তম সংশোধন : ১৯৮৬-র ডিসেম্বর। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল অরুণাচলকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। অরুণাচল বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ৪০ জন স্থির করা হয়।

৫৬-তম সংশোধন : ১৯৮৬। পুনর্গঠন আইন ১৯৮৭, অনুযায়ী গোয়াকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা এবং দমন ও দিউ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে। গোয়ার রাজ্য বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৪০ স্থির করা হয়।

৫৭-তম সংশোধন : ১৯৮৭। ভারতের সংবিধানের হিন্দি অনুবাদ প্রকাশের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়।

৫৮-তম সংশোধন : ১৯৮৭। সংবিধানের ৩৩২ নং ধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ের বিধানসভায় তফশিলি জাতি এবং উপজাতিভুক্ত নাগরিকদের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

৫৯-তম সংশোধন : ১৯৮৮। এই আইনের মাধ্যমে ৩৫২(১), ৩৫৯ এবং ৩৫৬(৫) নং ধারা সংশোধন করা হয়। ৩৫২(১) নং ধারার প্রথম অংশটি সংশোধন করে বলা হয় যে, 'রাষ্ট্রপতি যদি সন্তুষ্ট হন যে, এমন একটি গুরুতর জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যখন যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা সশস্ত্র বিদ্রোহের দরুন ভারত বা তার কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন, তখন সমগ্র পাঞ্জাব অথবা দেশের যে কোন অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।'

৬০-তম সংশোধন : ১৯৮৮। বৃত্তিকরের পরিমাণ বার্ষিক ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,৫০০ টাকা করা হয়।

৬১-তম সংশোধন : ১৯৮৮। ৩২৬ নং ধারা সংশোধন করা হয়। ওই সংশোধনের দ্বারা লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার ভোটদাতাদের বয়ঃসীমা ২১ থেকে ১৮ বছর করা হয়।

৬২-তম সংশোধন : ১৯৮৯। রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভায় তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের মেয়াদ আরও দশ বছর অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মনোনীত করার ব্যবস্থাও আরও দশ বছর সম্প্রসারিত করা হয়।

৬৩-তম সংশোধন : ১৯৮৯। ১৯৮৮ সালে প্রণীত ৫৯-তম সংবিধান সংশোধন আইন বাতিল করা হয়।

৬৪-তম সংশোধন : ১৯৯০। পাঞ্জাব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর ৬ মাস পর্যন্ত করা হল।

৬৫-তম সংশোধন : ১৯৯০। সংবিধানের স্বীকৃত তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার তদারকি এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় জমিশন গঠন করা।

৬৬-তম সংশোধন : ১৯৯০। বিভিন্ন রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত ৬৪টি ভূমি-সংস্কার আইনকে আদালতের এক্তিয়ার-বহির্ভূত রাখা এবং নবম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য ওই সংশোধন বিল উত্থাপিত হয়।

৬৭-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯০। পাঞ্জাব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ ৪ বছর করা হল।

৬৮-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯১। পাঞ্জাবে পরিস্থিতির সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেযাদ ৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৬৯-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯১। এই সংবিধান সংশোধন আইন অনুসারে পূর্বতন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল দিল্লিকে নতুন মর্যাদা দেওয়া হয়। তার প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করে তাকে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। দিল্লির জন্য একটি আইনসভা ও মন্ত্রীপরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা হয়।

৭০-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯২। সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ নং ধারা সংশোধন করে 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল' দিল্লি এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলরূপে পণ্ডিচেরী বিধানসভার সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়।

৭১-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯২। মণিপুরি, কোঙ্কনি এবং নেপালি ভাষা অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭২-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯২। ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চলের শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৮ সালের ১২ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ত্রিপুরার জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি মেমোর‍্যান্ডাম অব্ আর্টিকল স্বাক্ষরিত হয়। ওই চুক্তির শর্তাদি কার্যকর করার জন্য ৭২-তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে সংবিধানের ৩৩২ নং ধারা সংশোধন করে ত্রিপুরার বিধানসভায় তপশিলভুক্ত উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা নির্ধারণে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯২। ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ওই আইনের মাধ্যমে সর্ব-ভারতীয় স্তরে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিরূপে পঞ্চায়েত গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অংশে নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিরূপে পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ ছিল। কিন্তু সংবিধানের কোথাও পঞ্চায়েতের গঠন, কার্যাবলী সম্পর্কে কোন বিস্তৃত কোন বিস্তৃত উল্লেখ ছিল না। ৭৩-তম সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের গঠন, তার কার্যকাল, সদস্যসংখ্যা, নির্বাচন, অর্থ-কমিশন গঠন, পঞ্চায়েতের অর্থ-বিষয়ক অবস্থার পুনঃনিরীক্ষা এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য বিষয় সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে। তা ছাড়া সংবিধানে ১১নং তপশিল নামে একটি নতুন তপশিল যুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারভুক্ত ২৯টি বিষয়কে ওই তালিকার এক্তিয়ারভুক্ত করা হয়েছে (২৪৩ নং ধারা)। সংবিধানের ২৪৩ নং ধারায় পঞ্চায়েতের গঠন ও কার্যাবলির বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। এ ছাড়াও ২৪৩-এর সঙ্গে (ক-ণ) উপধারা যোগ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উপরোক্ত দুটি সংবিধান সংশোধন আইন অঙ্গরাজ্যের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। সমস্ত অঙ্গরাজ্যের আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত হবার পর ১৯৯৪ সালের ২৩ এপ্রিল তা কার্যকর হয়। ২৪ এপ্রিল থেকে ওই আইন অনুযায়ী কাজ শুরু হয়। সমস্ত অঙ্গরাজ্যকে ওই সংশোধন আইন অনুসারে নিজেদের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবর্তন করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং কয়েকটি তপশিলভুক্ত এলাকায় এই আইনটি কার্যকর হবে না।

৭৪-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯২। এই আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পুরসভার গঠন, কার্যাবলি, মেয়াদ, ওয়ার্ড কমিটি, তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, জেলা পরিকল্পনা কমিটি, মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা কমিটিসহ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা। এ ছাড়াও দ্বাদশ তফশিলে ও সংবিধানের ২৪৩-ডব্লিউ ধারায় পুরসভার ১৮টি কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৭৫-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯৪। এই আইনে রাজ্যস্তরে বাড়ি ভাড়া ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এ সম্পর্কিত মামলার নিষ্পত্তি দ্রুততর করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এ সম্পর্কিত মামলার আপিল সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যত্র নিষিদ্ধ হয়।

৭৬-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯৪। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী জয়ললিতা তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর অংশের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষায়তনে ৬৯% আসন সংরক্ষণের একটি বিল তামিলনাড়ু বিধানসভায় উত্থাপন করেন।

সভার অনুমোদনের পর বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো স্থগিত রাখা স্থির করে। প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় নেতাদের কাছে সংরক্ষণের বিষয়টি পেশ করলে সকলেই ৬৯% সংরক্ষণের পক্ষে মত দেন।

এরপর বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৯ জুলাই রাষ্টপতি ওই বিলে সম্মতি দেন। কিন্তু কে এম বিজয়ন প্রশ্ন উত্থাপন করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত বিলটিকে সংবিধানের নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংসদে একটি সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপন করে।

১৯৯৪-র ২৪ আগস্ট ১৪৮-২ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়। ২৫ আগস্ট লোকসভায় উপস্থিত ৩৪৮ জন সদস্য সর্বসম্মতভাবে বিলটি অনুমোদন করেন।

৭৭-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯৪। তফশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের জন্য চাকরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ বজায় রাখার জন্য এই আইন করা হয়।

৭৮-তম সংবিধান সংশোধন আইন : ১৯৯৫। ভূমি সংস্কার আইনকে সংবিধানের নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি প্রধান আইনসহ বেশ কিছু সংশোধিত আইনও নবম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে নবম তফশিলের বিষয়গুলি নিয়ে কেউ কোনও আদালত মামলা করতে না পারে।

সর্বশেষ সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব

১৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ ভারত সরকার এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যার ফলে সংবিধানের ৯৩তম সংশোধন বিলটি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে উত্থাপিত হতে যাচ্ছে।

এর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের আওতায় আসবে। সেইসঙ্গ শিশুদের (ছয় বৎসর পর্যন্ত) পারিবারিক যত্ন ও শিক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে অভিভাবকদের উপর।

একক ৭৭ ❐ ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি

গঠন

৭৭.০ উদ্দেশ্য

৭৭.১ ভূমিকা বা প্রস্তাবনা

৭৭.২ তফশিলি জাতির ভূমিকা

৭৭.২.১ ভারতে জাতপাতের উদ্ভব

৭৭.২.২ স্বাধীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা ঃ সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ

৭৭.২.৩ তফশিলি জাতিদের বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধাপ্রদান এবং বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা

৭৭.৩ তফশিলি উপজাতির ভূমিকা

৭৭.৩.১ তফশিলি উপজাতিদের জন্য স্বাধীন ভারতে বিশেষ ব্যবস্থা

৭৭.৩.২ মূল্যায়ন

৭৭.৪ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ভূমিকা

৭৭.৪.১ মূল্যায়ন

৭৭.৫ ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠীর ভূমিকা

৭৭.৬ সারাংশ

৭৭.৭ অনুশীলনী

৭৭.৮ উত্তরমালা

৭৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তির সঙ্গে আপনার পরিচয়স্থাপন। এককটি পাঠ করলে আপনি আয়ও করবেন

- তফশিলি/জাতির ভূমিকা এবং তাদের বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধা ও বাস্তব সমস্যা
- তফশিলি উপজাতির ভূমিকা ও স্বাধীন ভারতে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা
- অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ভূমিকা
- ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য।

৭৭.১ প্রস্তাবনা

রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে এক এক ধরনের কর্মপদ্ধতি বেছে নেয়। যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই হল রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু, সেই কারণে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

ভারতীয় রাজনীতিতেও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি আবার বিভিন্ন সামাজিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। ভারত যে একটি বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। বস্তুত. ভারতের মতো এত ভাষা, জাতি ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত কোনো রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে বিরল। এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাত-পাত বা Caste যা ভারতীয় রাজনীতির শুধু অন্যতম সামাজিক ভিত্তিই নয়—এটি ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তিকে বুঝতে হলে জাত-পাত ছাড়াও আদিবাসী বা উপজাতি (tribe) সম্প্রদায়, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (other Backward Classes) এবং ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠী (Anglo-Indian Community) — এদেরও আলোচনা প্রয়োজন। আলোচনার পরবর্তী অংশে ভারতীয় রাজনীতিতে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের কী ভূমিকা তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

৭৭.২ তফশিলি জাতির (Scheduled Caste) ভূমিকা

ভারতীয় সমাজের গঠন-বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তা হল জাতি বা Caste এর অস্তিত্ব। Caste বা জাতি কাকে বলে এ প্রশ্ন করলে প্রথমেই বলা দরকার যে Caste শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন পর্তুগীজরা এবং সংস্কৃতভাষায় Caste কে জাতি বলা হয়। হিন্দী বা বাংলায় Caste কে জাত বা জাতি বলা হয়। সমাজতাত্ত্বিক আঁন্দ্রে বেতের মতে Caste বা জাত হল একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী যার সদস্যরা নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট পেশা থাকে এবং গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত সচলতার কোনো সুযোগ থাকে না; উপরন্তু জাতভুক্ত ব্যক্তিদের মর্যাদা জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে স্তরবিন্যস্ত হিন্দু সমাজে প্রত্যেকটি জাত বা Caste এরই একটি নির্দিষ্ট অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এবং প্রত্যেকটি জাতেরই নিজস্ব সামাজিক প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠান থাকে।

Caste বা জাত শুধুমাত্র একটি সামাজিক গোষ্ঠী নয় বা এটি কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর একটি উপাদান মাত্র নয়। ক্ষমতার অসম বন্টনের সঙ্গে এটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত; প্রভাব এবং আনুগত্য, সামাজিক মান এবং অসম্মান, সুযোগ-সুবিধা পাওয়া এবং তার থেকে বঞ্চনা—এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে জাতের অবস্থান বিশেষভাবে জড়িত।

ভারতীয় রাজনীতির একটি অতি-বিশিষ্ট দিক হল জাত-পাতের রাজনীতি বা Caste Politics. জাত এবং রাজনীতি—এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি সঠিকভাবে বুঝতে গেলে ভারতের সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কীভাবে এবং কবে থেকে জাতপাত রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে শুরু করল, স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা কি—ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা প্রয়োজন।

অনুশীলনী—১

ক) জাত কাকে বলে? সমাজতাত্ত্বিকেরা জাতকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

৭৭.২.১ ভারতে জাত-পাতের উদ্ভব

ভারতে জাতিভেদ-প্রথার উদ্ভব সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজ চারটি বৃহৎ স্তরে বিভক্ত ছিল। এই স্তরগুলিকে বর্ণ বলা হোত। সামাজিক মর্যাদা, আচার-অনুষ্ঠানগত পার্থক্য, বৈবাহিক রীতি-নীতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রতিটি বর্ণ অপর বর্ণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই চারটি বর্ণ হল ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই প্রতিটি বর্ণের পেশা বা কাজকর্ম সুনির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণেরা শিক্ষা এবং পূজো-আর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ পণ্ডিত, শিক্ষক বা পুরোহিত হিসাবেই তাঁরা কাজ করতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা হিসেবে এবং বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত থাকতেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শূদ্রদের স্থান ছিল সবচেয়ে নীচে—কায়িক শ্রমের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। ওল

এই বর্ণভেদপ্রথাই কালক্রমে জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকেরা একমত নন। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে হিন্দুসমাজের সাবেকী বর্ণভেদপ্রথার মধ্যে জাতিভেদপ্রথার বীজ নিহিত আছে। পক্ষান্তর অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তনের ফলেই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটেছে। তবে আমরা একথা বলতে পারি যে কোনো একটি-দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতের উদ্ভব ঘটে নি। কৃষি-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার, নতুন উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ এবং বর্ণভেদ-প্রথা—এই সবকিছুর সংমিশ্রণে ভারতীয় সমাজে জাতপাতের ভেদাভেদ শুরু হয়।

ভারতে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ভাঙন ধরার পর উপজাতি-প্রধান বর্ণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইধরনের সমাজব্যবস্থাতে পশ্চিমী দাসসমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আর্যরা বর্ণভেদপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং বেদের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য বৈধতা পায়। সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষে জাতিভেদ-প্রথা চলে আসছে যদিও প্রাচীন বা মধ্যযুগে রাজনৈতিক ব্যবস্থা জাতপাতের দ্বারা পরিচালিত হত না।

ইংরেজ শাসিত ভারতে জাতিভেদ-প্রথা তৎকালীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ছিল। জাতিভেদ-প্রথা বংশানুক্রমিক পেশার কঠোরতার দ্বারা আবদ্ধ ছিল। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে গেছেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব হয় নি। বস্তুত, স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতির জন্যে নিম্নবর্গের মানুষদের আন্দোলন এবং জাত-পাত ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা জাতিভেদ-প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

অনুশীলনী—২

ক) বর্ণভেদ-প্রথা কাকে বলে? এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

খ) ভারতে জাতিভেদ-প্রথার উদ্ভব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য লিখুন।

৭৭.২.২ স্বাধীন ভারতে জাতিভেদ-প্রথা ঃ সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতপাতের সমস্যাকে দু'টি স্তরে মোকাবিলার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, ১৭নং ধারার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা এবং জাত-পাতের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ওপরও জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অংশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিষয়টি সংযোজিত হয়। দ্বিতীয়ত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধানে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এর মূল লক্ষ্য অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়কে সমাজের উন্নত অংশের সম-পর্যায়ে উন্নীত করা। সংবিধানের প্রণেতাগণ প্রস্তাবনায়, মৌলিক অধিকারের কোনো কোনো অংশে এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেছেন তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করেই সমাজের পশ্চাদ্‌পদ অংশের জন্য এই বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণী বলতে প্রণেতাগণ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কথা বলেননি—পশ্চাদ্‌পদ অংশ বলতে বিশেষভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ অংশ বা শ্রেণীসমূহকেই বোঝান হয়েছে।

অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তফশিলি জাতি বা Scheduled Caste. সংবিধানের ৩৬৬(২৪) নং ধারায় তফশিলি জাতির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তফশিলি জাতি বলতে এমন জাতি, বর্ণ বা উপজাতি অথবা ঐসব জাতি, বর্ণ বা উপজাতির কোনো অংশ বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যেগুলিকে সংবিধানের ৩৪১ নং ধারা তফশিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান-প্রণেতাগণ তফশিলি জতির কোনো স্থায়ী তালিকা প্রণয়ন করেন নি। ভবিষ্যতে অন্য কোনো জাতি বিষয়ে সরকারের পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই নমনীয় নীতি গৃহীত হয়েছিল। ৩৪১(১) নং ধারা অনুসারে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে বসবাসকারী কোনো জাতি, বর্ণ বা উপজাতির কোনো গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঐ রাজ্যে বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে তফশিলি জাতি রূপে স্বীকৃতি দিতে পারেন। তবে

রাজ্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সাথে আলোচনা করে নেবেন। ৩৪১(২) নং ধারা অনুসারে সংসদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তফশিলি জাতির তালিকায় নতুন জাতি, বর্ণ, উপজাতি অথবা তাদের কোনো অংশ বা গোষ্ঠীর নাম সংযুক্ত বা বিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিকে নতুন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না।

গণ-পরিষদে ড. আম্বেদকর সংরক্ষণের সপক্ষে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে এই নীতি একদিকে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব স্বীকার করবে এবং অপরদিকে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মিলনের পথ প্রশস্ত করবে। সংবিধানের ৩০০-৩৪২ নং ধারায় পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে। এই সংরক্ষণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া সংবিধানের ১৫(৪), ১৬(৪) এবং ৪৬নং ধারায় ঐ বিষয়ে উল্লেখ আছে।

সংবিধানে তফশিলি জাতিদের জন্য রাজ্য বিধানসভায় এবং লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মূল সংবিধানে এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মূল সংবিধানে এই সংরক্ষণের মেয়াদ দশ বছরের জন্য স্থির করা হলেও, পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে তফশিলি জাতিদের জন্য লোকসভায় ৭৯টি এবং বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় মোট ৫৫৭টি আসন সংরক্ষিত আছে।

সংবিধানের ১৬নং ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সকল ভারতীয় নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া হলেও বলা আছে যে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের চাকরির সুবিধার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং সেই আইন সমতার আদর্শের বিরোধী হিসাবে পরিগণিত হবে না। কারণ অনুন্নত শ্রেণীসমূহের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার জন্য এই ধরনের সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ধরনের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তফশিলি জাতিদের জন্য ১৫.৫ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে এই সংরক্ষণ প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা প্রয়োজন বলে সংবিধানে উল্লেখ আছে। এছাড়া চাকরির ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নয়। এ বিষয়ে সরকারের স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা আছে।

চাকরি ছাড়াও সরকারি শিক্ষায়তনেও তফশিলি জাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। এছাড়া ৩৩৮ নং ধারা অনুযায়ী তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংবিধান স্বীকৃত সংরক্ষণের ব্যবস্থা কতটা কার্যকর করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি প্রতি বছর রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন। সংবিধানের ৩৪০ নং ধারায় অনুন্নত শ্রেণীসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য রাষ্ট্রপতিকে কমিশন গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। স্পেশাল অফিসারের প্রতিবেদন এবং কমিশনের প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করেন।

অনুশীলনী—৩

ক) জাতপাতের সমস্যাকে ভারতীয় সংবিধানে কীভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

খ) তফশিলি জাতি বলতে কী বোঝানে? এদের জন্য সংবিধানে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষেপে লিখুন।

৭৭.২.৩ তফশিলি জাতিদের বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধা প্রদান এবং বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা

৭৭.২.২. অংশে আপনারা দেখেছেন যে ভারতীয় সংবিধানে তফশিলি জাতিদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী অংশগুলিতে আপনারা দেখবেন যে তফশিলি জাতি ছাড়াও তফশিলি উপজাতি Scheduled tribe) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের (other backward classes) জন্যও বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্যও আইনসভাগুলিতে কিছু আসন সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদতা নির্ধারণের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে কিন্তু ধর্মকে কোনো ক্ষেত্রেই পশ্চাদ্‌পদতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হয় নি। সংবিধানের প্রণেতাগণ বিশেষ সংরক্ষণের মাধ্যমে ঐ শ্রেণীসমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার অবসানের চেষ্টা করেছেন।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমস্যা কতটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে এবারে তা দেখা যাক। একুশ শতকে প্রবেশ করার পরও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি অবজ্ঞা এবং বিদ্বেষের মনোভাব নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন সম্প্রদায়ের উপর উচ্চবর্ণ হিন্দুদের আক্রমণ এরই জ্বলন্ত প্রমাণ। এর প্রবল প্রতিক্রিয়া হিসাবে হরিজন - সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ধর্মান্তরিত হবার ক্ষেত্রেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এইসব ঘটনা ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধই সূচিত করেছে। এই অভাববোধ থেকেই অনুন্নত শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ একদিকে যেমন তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ চেতনার সঞ্চার ঘটিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের মধ্যে এমন এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি করেছে যা ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং ঐক্যের বিরোধী। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে সংবিধান-স্বীকৃত বিশেষ সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেও তফশিলি জাতির প্রত্যাশিত সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হয়নি। অনুন্নত জাতির উন্নতির দাবিকে একটি সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

পশ্চাদ্‌পদতার কোনো সংজ্ঞা সংবিধানে দেওয়া হয়নি। সুপ্রীম কোর্টও এ বিষয়ে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে নি। বর্তমানে সংরক্ষণ নীতির ভিত্তি সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সংরক্ষণের সুযোগে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাধান্যবিস্তারকারী অংশ বা elite শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে। তফশিলি

জাতির মধ্যে যারা যথার্থই অনগ্রসর বা দরিদ্র, তারা সংরক্ষণের সুযোগ নিতে পারছে না। এর মূল কারণ হল পশ্চাদ্‌পদতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একমাত্র ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। ফলস্বরূপ গুজরাটের প্যাটেল, অন্ধ্রপ্রদেশের রেড্ডি এবং কাম্মা, পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে অনেকেই গরীব হলেও তাদের পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীরূপে গণ্য করা হয় না। অপরদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের কোমারস, কুর্ম্মারিস, ভেদ্দারাস প্রভৃতি জাতিগুলি পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্যদের চেয়ে উন্নত। সেই কারণে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন দুই প্রধান বিচারপতি ওয়াই, ভি. চন্দ্রচূড় এবং জগমোহন রেড্ডি এবং বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি জাতির পরিবর্তে দারিদ্রকেই পশ্চাদ্‌পদতার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার পক্ষে মত দেয়।

অপরদিকে একথা ঠিক যে সংরক্ষণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহ সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে এখনও পর্যন্ত অক্ষম। উদারহণ হিসাবে বলা যায় যে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কর্মরত ১,৫৭১,৬৩৮ সংখ্যক কর্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র ১৮.৭২ শতাংশ তফশিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাছাড়া একথাও অনস্বীকার্য যে ভারতে দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত মানুষের মধ্যে বেশিরভাগই পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীভুক্ত। ভারতের বিভিন্ন অংশে এইসকল মানুষদের উপর নিপীড়নের মূলে আছে অনুন্নত সামাজিক মর্যাদা এবং সম-মর্যাদার অস্বীকৃত। সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিছক ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

এছাড়া অনুন্নত জাতিগোষ্ঠী। কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পায় বলে, ভারতীয় রাজনীতি বর্তমানে অত্যধিক মাত্রায় জাত-পাতের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। একদিকে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্ন অনগ্রসর জাতিগুলিকে নিজেদের সমর্থনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় অনেক অনায্য দাবিও মেনে নিতে প্রস্তুত, আর অপরদিকে রয়েছে বিভিন্ন জাত-ভিত্তিক সংগঠন যারা নিজেদের কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এই দুইয়ের ফলে দেশ হিসাবে ভারতের যেমন কোনো উন্নতি হচ্ছে না, অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত, প্রকৃত পশ্চাদ্‌পদ ব্যক্তিদেরও কোনো উন্নতি হচ্ছে না।

বস্তুত, ভারতের স্তর-বিন্যস্ত সমাজের মূল ভিত্তির পরিবর্তন ব্যতীত জাত-পাতের প্রভাব এবং সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। এই সমাজে যে বৈষম্যপীড়িত এবং শোষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই অর্থনৈতিক ভিত্তির সমূলে উৎপাটন প্রয়োজন। সংরক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর জাতির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে যে সংরক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করে বা নতুন কিছু পশ্চাদ্‌পদ জাতিকে সংরক্ষণের সুবিধা

দিয়ে অনগ্রসর জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হয় নি। বরং এসবের ফলে ভারতীয় সমাজে নতুন ধরনের স্তর-বিন্যাসের সূচনা হচ্ছে যার ফলে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণী এবং উচ্চবর্ণযুক্ত হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া, মনে রাখা দরকার যে, যে অবস্থার জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন তার নির্মূলীকরণই হল সংরক্ষণের প্রয়োজন তার নির্মূলকরণই হল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য। সংরক্ষণের দাবিকে সংরক্ষিত রাখা এবং তাকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য সংরক্ষণ নয়।

সেই কারণে, অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন, সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার, মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে পশ্চাদ্‌পদ অংশের মানুষের সমস্যার মোকাবিলা করা উচিত।

অনুশীলনী—৪

ক) তফশিলি জাতির উন্নতির জন্য সাংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে কি আপনি সমর্থন করেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

৭৭.৩ তফশিলি উপজাতির (Scheduled Tribe) ভূমিকা

বহুজাতিক রাষ্ট্র ভারতে আদিবাসী বা উপজাতি সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক, উপজাতি বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং উপজাতিদের সঙ্গে উপজাতি নয় এবং জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের যে টানাপোড়েন তার উপর ভিত্তি করেই ভারতের রাজনৈতিক ধারা আবর্তিত।

উপজাতি বলতে কাদের বোঝানো হয়, বা উপজাতি কারা, সে বিষয়ে প্রথম আলোচনা দরকার। উপজাতি বা আদিবাসী তাদেরই বলা হয় যারা আদিকাল থেকে ভারতের অদিবাসী। খ্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার শতকে আর্যরা ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন এবং আর্য সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। আর্যরা তাঁদের উন্নত সভ্যতা ও জীবনধারার মাধ্যমে অনার্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন এবং অনার্যরা ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

যদিও পরবর্তীকালে বহু বছর ধরে আর্য এবং অনার্য সভ্যতার মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে, তবুও আর্যরা ক্রমশ প্রাধান্যকারী হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং ভারতের অনার্য আদিবাসীরা প্রান্তিক উপজাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়েকটি উপজাতি গোষ্ঠী জাত-ভিত্তিক হিন্দু সমাজে গৃহীত হলেও অধিকাংশ গোষ্ঠীই নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা, ধর্ম ও সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে জঙ্গল বা পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করেছে।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানেরা এবং তারও পরে ইংরেজ শাসকেরা—কেউই এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন নি। ফলে আদিবাসী সম্প্রদায় বরাবরই তাদের নিজস্বতা নিয়ে ভারতীয় মূলসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জীবনধারণ করেছে।

স্বাধীনতার পর এই উপজাতিদের কোনো কোনা গোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ভারত-বিরোধী মানসিকতা দেখা যায়। নাগা, মিজো প্রভৃতি উপজাতিসমূহ গোপন আন্দোলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য সচেষ্ট হ'য়ে পড়ে। মণিপুর এবং ত্রিপুরার উপজাতিসমূহের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন প্রসার লাভ করে। একদিকে উপজাতিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, আর অপরদিকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তাদের ভারতীয় মূলসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

৭৭.৩.১ তফশিলি উপজাতিদের জন্য স্বাধীন ভারতে বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় আট শতাংশ হল উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। বিভিন্ন ছোট এবং বড় জনগোষ্ঠীতে এই আদিবাসী সম্প্রদায় বিভক্ত। এদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার ধারক এবং আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী ওহবা, জোড়ায়া প্রভৃতিরা তেমন আবার অপরিদেক উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে নাগা, মিজো, খাসি, ডাফ্‌লা, কুকি প্রভৃতিরা। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যেও বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা আছেন।

এই ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির সমস্যা বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন মাত্রার। এদের সমস্যার সমাধানের জন্য সংবিধানে বিশেষ কিছু সুবিধা দানের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৩৬৬(২৫) নং ধারা অনুযায়ী তফশিলি উপজাতি বলতে সেই সব উপজাতি, উপজাতীয় সম্প্রদায় অথবা ঐসব উপজাতি ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কোনো অংশ বা গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা ৩৪২ নং ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত। তফশিলি জাতির মতো তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও সংবিধান প্রণেতাগণ কোনো স্থায়ী তালিকা প্রণয়ন করেন নি। ৩৪২(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোনো রাজ্য বা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের কোনো উপজাতি বা উপজাতীয় সম্প্রদায় অথবা তাদের কোনো অংশ বা তাদের অন্তর্ভুক্ত কোনো গোষ্ঠীকে ঐ রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তফশিলি উপজাতি রূপে ঘোষণার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারেন। ৩৪২(২) নং ধারা অনুসারে সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত নতুন তফশিলি উপজাতির নাম তালিকার অন্তর্ভুক্ত অথবা ঐ তালিকা থেকে কোনো নাম বাদ দিতে পারে। কিন্তু নতুন বিজ্ঞাপ্তির মাধ্যমে পুরোনো তালিকা সংশোধন করা যায় না।

তফশিলি জাতির মতো তফশিলি উপজাতির জন্যও সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রথমত রাজ্য বিধানসভায় তফশিলি উপজাতির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। অসমের স্বয়ংশাসিত জেলায় বসবাসকারী তফশিলি উপজাতির জন্যও আসন সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে লোকসভায় তফশিলি উপজাতিদের জন্য ৪০টি এবং রাজ্য বিধানসভাসমূহে ৩১৫টি আসন সংরক্ষিত আছে। ১৬৪(১) ধারা অনুযায়ী বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রাদেশের মন্ত্রী-পরিষদে তফশিলি উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একজন মন্ত্রী থাকবেন। দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তফশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

১৬নং ধারায় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া হলেও সংবিধানে উল্লেখ করা আছে যে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য চাকরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে পারেন। তবে সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রশাসনিক নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই আসন সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারের স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা আছে অর্থাৎ আসন সংরক্ষণ করতে কোনো সরকারকে বাধ্য করা যায় না। বর্তমানে তফশিলি উপজাতিদের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৮.৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত আছে। তৃতীয়ত, সরকারি শিক্ষায়তনেও তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতি কেন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করতে পারেন। এ বিষয়ে সংবিধানের ১২.৩ অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চমত সংবিধান কার্যকর হবার দশ বছর পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তফশিলভুক্ত উপজাতিদের কল্যাণের জন্য একটি কমিশন গঠন করার কথা বলা হয়েছে। উপরন্তু, তফশিলি উপজাতিসমূহের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার সমূহকে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং রূপায়ণের নির্দেশ পারেন।

৭৭.৩.২ মূল্যায়ন

ভারতের উপজাতি সম্প্রদায় অত্যন্ত অনগ্রসর। কয়েক শতাব্দীর বঞ্চনার উত্তরাধিকার এখনও তাদের অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ। বিশেষ কিছু সুবিধা তাদের নিঃসন্দেহে দেওয়া উচিত। তবে একথাও ঠিক যে কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বা সরকারি চাকরি ও শিক্ষায়তনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানোন্নয়ন, তাদের ওপর থেকে দীর্ঘ বঞ্চনার দাগ মুছে ফেলবার জন্য প্রয়োজন উৎপাদনমুখী দারিদ্র-দূরীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার এবং ন্যূনতম নিরাপত্তা ও মানবিক জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

অনুশীলনী—৫

ক) ভারতে উপজাতি কাদের বলা হয়? ভারতীয় মূল সমাজ থেকে তারা কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

খ) তপশিলী উপজাতিদের জন্য স্বাধীন ভারতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।

৭৭.৪ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (Other Backward Classes) ভূমিকা

৭৭.২.১ অংশে দেখেছেন যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা জাত-পাতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই জাত-

ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় একদিকে রয়েছে উন্নত কতকগুলি জাতি যেমন ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, রাজপুত প্রমুখেরা আর অপর প্রান্তে রয়েছে অত্যন্ত অনগ্রসর কতকগুলি জাতি যেমন মুচি, বাউরি, মেথর প্রমুখেরা যারা তফশিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সংবিধানিক সংরক্ষণের আওতাভুক্ত। সংরক্ষণের ফলে এই জাতিগুলি কতটা উন্নত হয়েছে, সেটি অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য বিতর্ক। কিন্তু অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে এই দুই জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উন্নত কতকগুলি জাতি এবং অনুন্নত কতকগুলি জাতি—এই দু'য়ের মধ্যবর্তী অনেক জাতি আছে যারা গ্রাম্য সামাজিক স্তরবিন্যাসের যথেষ্ট নীচে অবস্থিত এবং যথেষ্ট দরিদ্র বা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। এদেরও সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা উচিত।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৪) নং ধারা অনুযায়ী তফশিলি জাতি ও উপজাতি ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসর অংশের উন্নতির জন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ১৬(৪) নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব না থাকলে কোনো কোনো পদ তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা যায়।

৭৭.২.২ অংশে আপনারা দেখেছেন যে অনগ্রসরতার কোনো মানদণ্ডের কথা সংবিধানে উল্লিখিত নেই। তপশিলী জাতির ক্ষেত্রে সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতাকেই অনগ্রসরতার প্রধান মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর ক্ষেত্রে সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার কথা সংবিধানে বলা হলেও, এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কোনো আলোচনা সংবিধানে নেই। সংবিধানের ৩৪০ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সামাজিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিশন গঠন করতে পারেন। এই কমিশন একদিকে যেমন কাদের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বলা হবে তা ঠিক করবে আবার তাদের উন্নতির জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শও দেবে।

এই ৩৪০ নং ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি ১৯৫৩ সালে তফশিলি জাতি এবং উপজাতি ছাড়া, অন্যান্য অনগ্রসর অংশের জন্য কারা কালেল্‌করকে চেয়ারম্যান করে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে কমিশন তার প্রতিবেদনে ২,৩৯৯ জাতিকে অনগ্রসর এবং তার মধ্যে ৮৩৭ টিকে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর বলে চিহ্নিত করে। কালেল্‌কর্ কমিশন কয়েকটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে অনগ্রসরতা নির্ধারণ করেছে। সেগুলি হল প্রথমত, হিন্দু সমাজের জাতি-ব্যবস্থার স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে যাদের অবস্থান সকলের নীচে, দ্বিতীয়ত, যে জাতির বৃহৎ অংশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর; তৃতীয়ত, যে সম্প্রদায়ের সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত নয়; এবং চতুর্থত, যে সম্প্রদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনগ্রসর। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কালেল্‌কর্ কমিশন প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে ২৫%, দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে ৩৩.৬৬% এবং তৃতীয় শ্রেণীর চাকরিতে ৪০% সংরক্ষণের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার চাকরিতে সংরক্ষণের বিষয়ে একমত ছিল না বলেই কালেল্‌কর কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে নি।

১৯৭৯ সালে ১লা জানুয়ারি কেন্দ্রের জনতা সরকার তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের বিষয় বিবেচনা এবং সুপারিশের জন্য বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি. পি. মণ্ডলের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সরকারি নাম ছিল "অনগ্রসর বা পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণীসমূহের কমিশন (backward Classes Commission)। মণ্ডল কমিশন তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের সংরক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য ২৭% সংরক্ষণের সুপারিশ করে। এই সংরক্ষণ দু'টি স্তরে হওয়া উচিত বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র এবং রাজ্যের অধীনস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারি ক্ষেত্রে চাকরিতে সংরক্ষণ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে কমিশন মনে করে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষে কমিশন মত দেয়।

মণ্ডল কমিশন 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী' কারা তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তথ্যনির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপদ্ধতি গ্রহণ করে নি। তাছাড়া কমিশন 'শ্রেণীর' কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করেনি। বস্তুত 'শ্রেণী' এবং জাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ না করায় 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী' কথাটি প্রথম থেকেই ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। মণ্ডল কমিশন তার প্রতিবেদনে সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদ্‌পদতা নির্ধারণে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের পরিবর্তে জাতভিত্তিক মানদণ্ডকেই প্রাধান্য দিয়েছিল।

১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কমিশন তার প্রতিবেদন পেশ করলেও ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রকাশিত জনতা দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে মন্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। ১৯৯০ সালের অগষ্ট মাসে লোকসভা ও রাজ্যসভায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং ঘোষণা করেন যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তাঁর সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অধীনস্থ রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছাড়াও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য ২৭ শতাংশ চাকরি সংরক্ষিত রাখবে।

জনতা দলের সরকার মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে সংরক্ষণের বিরোধী মনোভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে। আবার বেশ কিছু অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিকগণ তফশিলি জাতি, উপজাতি পশ্চাদ্‌পদ সম্প্রদায় এবং সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর অংশের মধ্যে খ্রীষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি পেশ করেন।

৭৭.৪.১ মূল্যায়ন

একথা সত্য যে ভারতীয় জাত-পাত নির্ভর সমাজে অন্ত্যজ তফশিলি জাতি ছাড়া এমন অনেক জাতি আছে যারা সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক—সমস্ত দিক থেকেই অনগ্রসর। এদের মধ্যে গ্রামে

বসবাসকারী গরীব কৃষক, ছোট বর্গাদার, ভাগচাষী, এবং জাত-পাত ভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত ধোপা, নাপিত, মিস্ত্রী, গোয়ালা প্রভৃতিরা আছে। সংরক্ষণের কোনো সুবিধা না পাওয়ায় এদেরকে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ফলস্বরূপ এরা অনেক ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হতে পারছে না।

কিন্তু এই প্রশ্ন করাও সমীচীন যে সংরক্ষণের মাধ্যমে কি কোনো গোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নতি সম্ভব? তা' যদি হোত তাহলে গত দশকে সংরক্ষণের সুবিধা নিয়ে তফশিলি জাতিরা সম্পূর্ণভাবে উন্নত হয়ে উঠত। তাছাড়া সংরক্ষণের নীতি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকেই যায় যে কত শতাংশ সংরক্ষণের আওতায় আনা সমীচীন। সুপ্রীম কোর্ট বালাজী বনাম মহীশূর রাজ্য মামলায় (১৯৬৩) ৫০ শতাংশ এর বেশি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। তৃতীয়ত, পশ্চাদ্‌পদতা নির্ধারণে জাতিগত মানদণ্ডকেই কেবলমাত্রই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু অনগ্রসরতা নির্ধারণে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তা নাহলে অনেক দরিদ্র উচ্চবর্ণ হিন্দু গোষ্ঠী কোন ভাবেই উন্নত হবে না। অপরদিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থাকা কোনো কোনো তফশিলি জাতি চিরকাল সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করবে।

ভারতীয় সমাজে জাত-পাতের সমস্যা সমাধানে সংরক্ষণ একটি সামাজিক পদক্ষেপ মাত্র। এই সমস্যা দূর করার জন্য চাই কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি, মানসিকতার পরিবর্তন এবং এক সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন।

অনুশীলনী—৬

ক) কালেল্‌কর কমিশন কাদের অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল? এই কমিশনের সুপারিশগুলো উল্লেখ করে সেগুলির যথার্থতা আলোচনা করুন।

খ) অন্যান্য শ্রেণীর জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলো উল্লেখ করে সেগুলির যাথার্থ্য আলোচনা করুন।

৭৭.৫ ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠীর (Anglo Indian Community) ভূমিকা

ইঙ্গ-ভারতীয়গণ ভারতের একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রশাসনিক এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য বহু ইউরোপীয় ব্যক্তি ভারতে আসেন। তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ভারতীয় মহিলাদের বিবাহ করেন এবং স্থায়ীভাবে ভারতেই বসবাস করেন। এঁদের সন্তানাদি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র রক্ষা করলেও ভারতকেই তারা তাদের স্বদেশভূমি হিসাবে গণ্য করেন। এরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম এবং রাজনীতিতে এঁদের প্রভাব খুবই কম। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন এরা গঠন করেননি। স্বাধীন ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাদের বিকাশ যাতে ব্যাহত না হয়, সেই ব্যাপারে সংবিধান প্রণেতাগণ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। সংবিধান রচয়িতারা বুঝেছিলেন যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক

থেকে বিশেষ সাংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হলে তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

সংবিধানের ৩৬৬(২) ধারা অনুযায়ী ইঙ্গ-ভারতীয় বলতে তাঁকেই বোঝান হয়েছে যাঁর পিতা বা পিতার দিকের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ একজন ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এবং তাঁর পিতামাতারা স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করেন।

সংবিধানে এই সম্প্রদায়ের জন্য রাজ্য বিধানসভা এবং লোকসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩১ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির যদি মনে হয় যে, লোকসভায় ইঙ্গ-ভারতীয়দের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই, তাহলে তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত দুজন সদস্যকে লোকসভায় মনোনীত করতে পারেন। ৩৩৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যপালের মতে রাজ্য বিধানসভায় যদি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের অভাব থাকে, তাহলে তিনি নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যা সঙ্গত মনে করবেন সেই সংখ্যক ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য রাজ্য বিধানসভায় মনোনীত করতে পারেন। মূল সংবিধানে এই সংরক্ষণ দশ বছরের জন্য করা হলেও পরিবর্তনকালে এই মেয়াদকাল সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে যার ফলে এখনও এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

মূল সংবিধানে চাকরি ক্ষেত্রেও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৩৩৬ নং ধারায় উল্লিখিত আছে যে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ রেল, বহিঃশুল্ক, ডাক ও তার বিভাগে যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকরী ছিল তা সংবিধান চালু হবার পর দশ বছর কার্যকর থাকবে। ১৯৬০ সালে এই সংরক্ষণের মেয়াদকাল আর বৃদ্ধি করা হয় নি সেহেতু চাকরিক্ষেত্রে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বর্তমানে কোনো সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এছাড়া ৩৩৭ নং ধারায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষামূলক অনুদানের কথা উল্লেখ করা আছে। এই অনুদানের ব্যবস্থাও দশ বছরের জন্য কার্যকর ছিল এবং ১৯৬০ সালে এই অনুদানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

সংবিধানের ৩৩৮(৩) নং ধারায় বলা হয়েছে যে তফশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য যে বিশেষ পদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হবেন, তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সংবিধানগত দিক সম্পর্কেও তদন্ত করে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

অনুশীলনী—৭

ক) ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় বলতে কি বোঝেন? সংবিধানে ইঙ্গ-ভারতীয় বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

খ) ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য কী ধরনের সাংবিধানিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৭৭.৬ সারংশ

একক ৭৭.১.১ থেকে আপনারা ভারতীয় রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি হিসাবে—জাতি (Caste), উপজাতি

(Tribe), অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (Other Backward Classes) এবং ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠী (Anglo Indian Community) – এদের কথা জেনেছেন। আপনারা ৭৭.১.২ অংশে ভারতীয় রাজনীতিতে জাত-পাতের প্রভাব এবং তফশিলি জাতিদের বিশেষ সাংবিধানিক সুবিধার কথা জেনেছেন। তফশিলি উপজাতিদের সম্পর্কে ৭৭.৩ অংশ থেকে আপনারা জেনেছেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সম্পর্কে কালেলকর কমিশন এবং মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার ৭৭.৪ অংশ থাকে জেনেছেন। ৭৭.৫ অংশে ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠী সম্পর্কে জেনেছেন।

৭৭.৭ অনুশীলনী

ক) ভারতীয় সংবিধানে তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে?

খ) সংরক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর জাতিগুলির উন্নতি সম্ভব বলে কি আপনি মনে করেন? এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য লিখুন।

৭৭.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

ক) ৭৭.২ অংশের সাহায্যে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী—২

ক) ৭৭.২.১ অংশের প্রথমার্ধে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

খ) ঐ একই অংশের অর্থাৎ ৭৭.২.১ অংশের দ্বিতীয়ার্ধে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৩

ক) ৭৭.২.২ অংশে এর উত্তর পাবেন।

খ) এই অংশটির উত্তরও ৭৭.২.২ অংশে পাবেন। অনুশীলনী ৩ এর (ক) এবং (খ) প্রশ্ন দু'টি একই ধাঁচের। প্রশ্ন দু'টি ভালো করে পড়ে উত্তর লিখবেন।

অনুশীলনী—৪

ক) ৭৭.২.৩ অংশে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৫

ক) ১১.৩ অংশে এর উত্তর পাবেন।

খ) ১১.৩.২ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

অনুশীলনী—৬

ক) ১১.৪ অংশের প্রথমার্ধে এর উত্তর পাবেন।

খ) ১১.৪ অংশের দ্বিতীয়ার্ধে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৭

ক) ১১.৫ অংশের প্রথমার্ধে এর উত্তর পাবেন।

খ) ১১.৫ অংশের দ্বিতীয়ার্ধে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী

ক) ১১.২.২ এবং ১১.৩.১ অংশের সাহায্যে এর উত্তর দিন।

খ) ১১.২.৩, ১১.৩.১ এবং ১১.৩.২ অংশের সাহায্যে এর উত্তর দিন।

১১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Johari J. C — Indian Govt. and Politics, Vishal Publications, Delhi, Jalandhar, 1989.
2. দুর্গাদাস বসু — ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী।
3. অনাদিকুমার মহাপাত্র—ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলিকাতা।
4. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাইসাধন প্রামাণিক—ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, কোলকাতা।
5. নিমাইসাধন প্রামাণিক—ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, কোলকাতা।

একক ৭৮ ☐ ভারতের রাজনৈতিক দল

গঠন

৭৮.০ উদ্দেশ্য

৭৮.১ প্রস্তাবনা

৭৮.২ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক দল

৭৮.৩ স্বাধীন ভারতে দলীয় ব্যবস্থা

৭৮.৩.১ ১৯৫২-১৯৬৭ প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থা

৭৮.৩.২ ১৯৬৭-১৯৭৭ প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার পতন এবং আঞ্চলিক দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব।

৭৮.৩.৩ ১৯৭৭-১৯৭৯ কোয়ালিশনের পর্যায়

৭৮.৩.৪ ১৯৮০-১৯৮৯ প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন

৭৮.৩.৫ ১৯৮৯ সালের পরবর্তী সময় আঞ্চলিক দল-নির্ভর কোয়ালিশনের পর্যায়

৭৮.৪ ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৭৮.৫ আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের কারণ

৭৮.৬ সারাংশ

৭৮.৭ অনুশীলনী

৭৮.৮ উত্তরমালা

৭৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল ভারতীয় রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা। এককটি পড়লে আপনি আয়ও করতে পারবেন?

- স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক দল
- স্বাধীন ভারতে দলীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়
- ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
- আঞ্চলিক দল উদ্ভবের কারণ।

৭৮.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি.ও.কী. রাজনৈতিক দলকে গণতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদন হিসেবে গণ্য করেছেন। বস্তুত, রাজনৈতিক দল এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পারস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা হল ৮৪, ৩৯, ৩০, ৮৬১। ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচনের সময়ে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬০, ৫৮, ৮৪, ১০৩। স্বভাবতই প্রত্যাশিত যে, রাজনৈতিক দল ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি প্রাধান্যকারী ও প্রভাবশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

৭৮.২ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক দল

ভারতবর্ষে আধুনিক দলীয় ব্যবস্থার সূচনাকাল হিসেবে ১৮৮৫ সালকে ধরা হয় কারণ ঐ বছরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সেই সময়ে অবশ্য একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবেই কাজ করছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিষয়টি কংগ্রেসের কাছে তখনও গুরুত্ব পায় নি। মূলত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা গঠিত কংগ্রেস দু'টি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিল। প্রথমত, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উঁচুতলার চাকরিগুলো ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি কংগ্রেস জানিয়েছিল; এবং দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ সরকারের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের দাবি কংগ্রেস জানিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থী রাজনীতির প্রভাবে এবং চরমপন্থীদের 'স্বরাজ' এর দাবিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দলের মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এরপর ভারতীয় রাজনীতিতে তথা জাতীয় কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর আগমনের ফলে কংগ্রেস দলে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা প্রভাবিত একটি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থেকে প্রকৃত অর্থে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে কংগ্রেস দল একটি মঞ্চ হিসাবে কাজ করে —যে মঞ্চে দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী সব ধরনের চিন্তা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কংগ্রেস ছাড়া সেই সময়ে আর তিনটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছিল যার মধ্যে দু'টি ছিল মৌলবাদী এবং একটি সাম্যবাদী। মৌলবাদী দলগুলির মধ্যে একটি ছিল মুসলিম লিগ। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এবং অচিরেই এটি মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হয়। অপর মৌলবাদী দল হিন্দু মহাসভা ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়। এই দলটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের হিন্দু শক্তিগুলিকে একত্রিত করা।

এছাড়া ১৯২৫ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি অফ্ ইন্ডিয়া (CPI) গঠিত হয়। এই দল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং একটি শোষণহীন সাম্যবাদী ভারতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

অনুশীলনী—১ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক) ঊনবিংশ শতকে কংগ্রেস দল কী ধরনের কাজ করত?

খ) কী কী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীতে কংগ্রেস দলে পরিবর্তন ঘটে?

গ) স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস দল ছাড়া আর কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল ছিল?

৭৮.৩ স্বাধীন ভারতে দলীয় ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হয় স্বাধীনোত্তর যুগে। ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের সময়ে ৫১টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত শতাধিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এইসব দলের প্রভাবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমাগত রূপান্তর ঘটেছে।

এই সময়টিকে দলীয় ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

৭৮.৩.১ ১৯৫২-১৯৬৭ প্রাধান্যকারী দলের ব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দল ইংরেজদের থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসের এই ক্ষমতা বৈধতা পায়। প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনেই কংগ্রেস সারা দেশে তার একাধিপত্য বজায় রাখে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় স্তরেই নয়, সবগুলি রাজ্যতেও (১৯৫৪ সালে অল্প সময়ের জন্য ত্রিবাঙ্কুর কোচিনকে বাদ দিলে) কংগ্রেস তার একাধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সময়টিতে আটটি রাজনৈতিক দল থাকলেও লোকসভায় তাদের উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। নীচের সারণীটির থেকে বিষয়টি পরিষ্কার। হবে।

প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের আসনসংখ্যা ঃ

	প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২)	দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন (১৯৫৭)	তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন (১৯৬২)
কংগ্রেস	৩৬৪	৩৭১	৩৬১
অন্যান্য সমস্ত দল এবং নির্দল	১২৫	১২৩	১৩৩

এই সময়ের দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'টি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমত, ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসেরই কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা যেমন সি. রাজগোপালাচারী প্রমুখের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় যেটি তৃতীয় এবং চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে বেশ কিছু আসনে জয়লাভ করে। বিভিন্ন কংগ্রেসী কর্মসূচীর বিরোধিতার মাধ্যমে এই নতুন রাজনৈতিক দল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

৭৮.৩.২ ১৯৬৭-১৯৭৭ প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার অবসান এবং আঞ্চলিক দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন থেকেই কংগ্রেস দলের প্রাধান্য কমতে থাকে। লোকসভাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও কংগ্রেসের আসনসংখ্যা কমে ২৮৩তে দাঁড়ায়। একদিকে যেমন বামপন্থী দলগুলির আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেমনি দক্ষিণপন্থী দলগুলিও নির্বাচনে ভাল ফল করে।

১৯৬৭ সালের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন কংগ্রেস দলের পক্ষে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারণ ন'টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়। একদিকে তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবে যথাক্রমে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘাম (DMK) এবং অকালি দল আঞ্চলিক দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়; অপরদিকে কেরল পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস দলেই ভাঙনের ফলে যথাক্রমে কেরালা কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস এবং ভারতীয় ক্রান্তি দল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা দেয়।

১৯৬৯ সালে বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্বর্তী বিধানসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জোট ক্ষমতায় আসে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে জোট-রাজনীতির সূত্রপাত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি দুর্বল জোটের রূপ নেয় এবং একই সঙ্গে 'দলত্যাগ' নামে একটি নতুন উপাদান ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হয় যা পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত কুপ্রভাব বিস্তার করে।

জাতীয় কংগ্রেস দলেও ১৯৬৯ সালে ভাঙন দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (আর) দল অন্যান্য কিছু দলের সমর্থনে ক্ষমতায় থাকে; অপরদিকে নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ ও মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস (ও) দল গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র ও জনসংঘের জোট ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (আর) দলকে পরাস্ত করতে পারে না এবং ৫১৮ আসনবিশিষ্ট লোকসভায় কংগ্রেস (আর) ৩৫২টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের স্বীকৃতি পায়।

ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে ১৯৭৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সময়টি অত্যন্ত অস্বস্তিকর। জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে এই সময়ে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়। গণতান্ত্রিক দলীয় ব্যবস্থাও এই সময়ে প্রায় ভেঙে পড়ে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলনেতারা কারারুদ্ধ হন এবং একটি প্রায়-স্বৈরচারী শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়।

৭৮.৩.৩ ১৯৭৭-১৯৭৯ কোয়ালিশনের পর্যায়

১৯৭৭ সালটি ভারতের দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ১৯৭৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় এবং বহু রাজ্য বিধানসভাতেও কংগ্রেস তার প্রাধান্য হারায়। কেন্দ্রে এবং বেশিরভাগ রাজ্যে জনতাপার্টি সরকার গঠন করে। কিন্তু জনতা পার্টি প্রকৃত অর্থে একটি রাজনৈতিক দল ছিল না। এটি বস্তুত কতকগুলো অকম্যুনিস্ট বামপন্থী দল এবং কতকগুলো দক্ষিণপন্থী দলের যুক্তফ্রন্ট ছিল যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেস দলকে পরাজিত করা।

১৯৭৮ সালে কংগ্রেস দলে আঁবার ভাঙন ঘটে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস (ই) গঠন করেন এবং অন্যান্য নেতারা যেমন দেবরাজ আর্স তাঁদের নিজস্ব সংগঠন কংগ্রেস (ইউ) তৈরি করেন। কেন্দ্রে জনতা দল অবশ্য বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে নি। অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কোন্দলের ফলে ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে জনতা দল ভেঙে যায়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং ভারতীয় লোকদলের কিছু সমর্থককে নিয়ে জনতা (এস) দল গঠন করেন এবং ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস (ই) দলের সমর্থক নিয়ে মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন।

৭৮.৩.৪ ১৯৮০-১৯৮৯ প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন

১৯৮০ সালের মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। যে সমস্ত কংগ্রেস সদস্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজস্ব সংগঠন তৈরি করেছিলেন তাঁরা নির্বাচনে চূড়ান্ত অসফল হন এবং দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখতে পারেন না। দেবরাজ আর্সের কংগ্রেস (ইউ) জগজীবন রামের কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসির (সি.এফ.ডি.) সঙ্গে মিলিত হয়ে কংগ্রেস (জ) গঠন করে। আবার কংগ্রেস (জ) মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কংগ্রেস (এস) গঠন করে। কংগ্রেস দল প্রথমে ইন্দিরা গান্ধী এবং পরে তাঁর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও ১৯৮৪ সাল থেকে অধিকাংশ রাজ্যগুলি কংগ্রেসের হাতছাড়া হয় এবং আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান এই সময় থেকেই শুরু হয়।

৭৮.৩.৫ ১৯৮৯ সালের পরবর্তী সময় — আঞ্চলিক দল-নির্ভর কোয়ালিশনের পর্যায়

১৯৮৯ সালে ভি. পি. সিংয়ের নেতৃত্বে জনতা দল কংগ্রেস (ও), তেলুগু দেশম, ডি. এম. কে. এবং অসম গণ পরিষদকে নিয়ে অকংগ্রেসী রাষ্ট্রীয় মোর্চা গঠন করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বামফ্রন্টের সাহায্যে সরকার গঠন করে। কংগ্রেস লোকসভায় সর্ববৃহৎ দল হওয়া সত্ত্বেও সরকার গঠন করতে পারে না এবং এই সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে ত্রিশঙ্কু সংসদ এবং জোট রাজনীতির সূচনা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ার ফলে ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকারের পতন ঘটে। এরপর চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বাধীন সরকার কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে চারমাস ক্ষমতায়

থাকে এবং ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার ফলে ঐ সরকারেরও পতন হয় এবং দশম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৯ সালের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ১৯৯১ সালের নির্বাচনেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯১ সালে নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রথমে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করে এবং পরে লোকদল (অজিত সিং) এর সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারে পরিণত হয়। এই সরকার পুরো পাঁচবছর ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয়।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আবার একটি ত্রিশঙ্কু সংসদ গঠন করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ১৬৪টি আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভাজপা, কংগ্রেস, জনতা দল, সি. পি. আই. (এম) এবং সি. পি. আই. ছাড়া বাকী আসন ২২টি আঞ্চলিক দল লাভ করে। ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র এই সময় থেকে আমূল পরিবর্তিত হতে থাকে। আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পায় এবং এদের সাহায্য ছাড়া সরকার গঠন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৩টি আঞ্চলিক ছোটো দলের সাহায্যে এবং কংগ্রেস ও সি. পি. আই. (এম) এর সমর্থনে জনতা দল সরকার গঠন করে যদিও প্রথম থেকেই এটি একটি দুর্বল জোট হিসাবে কাজ করে। এই অবস্থাকে প্রান্তিক-বহুদলীয় ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এই জোট সরকারের অবশ্যম্ভাবী পতনের পর ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে আর একট জোট সরকার গঠিত হয়। তেরো মাস ক্ষমতায় থাকার পর ১৯৯৯ এ এই সরকারের পতন ঘটে। একই বছরে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনেও একই ধারা বজায় থাকে। কোন রাজনৈতিক দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পুনরায় একটি জোট সরকার গঠিত হয়।

অনুশীলনী—২ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন

ক) জোট সরকার

খ) ত্রিশঙ্কু সংসদ

গ) প্রান্তিক বহুদলীয় ব্যবস্থা

৭৮.৪ ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

বৈচিত্রময় দেশ ভারতবর্ষের দলীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত আকর্ষক একটি বিষয়। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সাংবিধানিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, জাতপাতের রাজনীতি প্রভৃতি ভারতের দলীয় রাজনীতিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট করে তুলেছে।

প্রথমত, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। ভারতের সাংবিধান প্রণেতারা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বীজটি সংবিধানের মাধ্যমে বপন করেছিলেন, যার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। তবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকলেও নির্বাচন কমিশনের দ্বারা রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা আছে। কোন্ দলকে জাতীয় দল এবং কোন্ দলকে আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, তা স্থির করে নির্বাচন কমিশন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের দলীয় ব্যবস্থাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত করা যায়। জাতীয় দলগুলি ছাড়াও এদেশে বহু আঞ্চলিক দল আছে। বস্তুত, ভারতের রাজনীতিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হচ্ছে।

তৃতীয়ত, ভারতের দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রভাব এবং প্রাধান্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপাদান। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলগুলির অন্তর্কলহ, কোন্দল, বিভাজন এবং ভাঙন ভারতের দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দলগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অনেক সময়ে দলীয় ভাঙন ত্বরান্বিত করে।

পঞ্চমত, জাত-পাত, উপজাতি, ধর্ম এবং ভাষাকে ভিত্তি করে অনেক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে।

ষষ্ঠত, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সাথে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক জাতীয় দলের স্বার্থেই শ্রমিক, কৃষক, যুব এবং মহিলা সংগঠনের যোগ রয়েছে।

সপ্তমত, রাজনৈতিক দলত্যাগ ১৯৬৭ সালের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দলত্যাগ একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণে হ্রাস পেলেও ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত ছিল। ১৯৮৫ সালে দলত্যাগ-বিরোধী আইন প্রণীত হওয়ার পর দলত্যাগের প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলেও পুরোপুরি বন্ধ হয় নি।

অষ্টমত, জোট-সরকার এবং জোট-রাজনীতি ভারতের দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৭ সাল থেকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে জোট-সরকার গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় স্তরে ১৯৮৯ সাল থেকে জোট সরকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হচ্ছে। বর্তমান রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করলে আগামী দিনগুলিতেও জোট-সরকার গঠন করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না বলে মনে হয়।

৭৮.৫ আঞ্চলিক দলের উদ্ভবের কারণ

আশির দশক থেকে ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত বিষয় হল রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ। ভাষা, জাতপাত, সম্প্রদায়গত মর্যাদারক্ষা, স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের দাবি, আঞ্চলিক বৈষম্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আঞ্চলিকতাবাদ বর্তমান ভারতের উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রাথমিকভাবে

বহুক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব সংগঠনগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্যোগে পরিণত হয়। আবার রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় অনেকসময়েই জাতীয় দলগুলি এই আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন আঞ্চলিকতা প্রশ্রয় পায় অপরদিকে ছোট বড় বিভিন্ন কারণকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ-জাতের মানুষের আধিপত্যের বিরোধিতা করে ডি, এম. কে., এ. ডি. আই. এম. কে. প্রভৃতি দক্ষিণী আঞ্চলিক দলগুলির সৃষ্টি। তীব্র হিন্দি ভাষা-বিরোধী কর্মসূচী এই দলগুলিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বহুজন সমাজ পার্টির মত দলগুলি গঠিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রাধান্যের বিরোধিতা, নিম্নবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এই দলগুলি তাদের কাজকর্ম চালায়। সম্প্রদায়গত মর্যাদারক্ষা তেলুগু দেশমের ভিত্তিগত উপাদান। তেলেগু দেশম নেতৃত্বের এই মনোভাব এতই প্রবল যে ১৯৯১ সালের লোকসভা উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পি. ভি. নরসিংহ রাওয়ের বিরুদ্ধে তেলুগু দেশম কোনো প্রার্থী দেয় নি। কারণ প্রথম তেলুগু প্রধানমন্ত্রীকে তেলুগু দেশম বিব্রত করতে চায় নি। ঝাড়খণ্ড পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, গোর্খা লীগ প্রভৃতি দলগুলি আদিবাসী বা উপজাতিদের জন্য ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সুরক্ষিত করা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ অসম গণ পরিষদের প্রধান কর্মসূচী ছিল। অকালি এবং শিবসেনা—এই দুটি দল ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে এই আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে কোনো জাতীয় দলই লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় প্রায়শই বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলে সমর্থনে সরকার গঠিত হচ্ছে। ফলত, ডি. এম. কে, এ. আই. এ. ডি. এম. কে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, তেলুগু দেশম, অকালি দল প্রভৃতি দলগুলি জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে এটিকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তবে আঞ্চলিক দলগুলি তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনেকসময়েই অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে যা' ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এ প্রসঙ্গে সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে চার ঝাড়খণ্ডী সাংসদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেবার অভিযোগ, বাজপেয়ী সরকারের উপর থেকে এ. আই. এ. ডি. এম. কে'র বারবার সমর্থন তুলে নেবার হুমকি এবং শেষপর্যন্ত সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় দলের পাসাপাশি আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব স্বাভাবিক। বিশেষ করে ভারতের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটা একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তবে আঞ্চলিক দলগুলির সংকীর্ণ

আঞ্চলিকতাবোধের উর্ধ্বে উঠে কাজকর্ম করা উচিত। তাছাড়া প্রত্যেকটি দলীয় নেতৃত্বকেই ব্যক্তিস্বার্থ এবং দলীয় স্বার্থকে আলাদা করে দেখা উচিত। অপরদিকে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলকে জাতীয় জীবনের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করার কর্মসূচী জাতীয় দলগুলিকেও নিতে হবে।

অনুশীলনী—৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

ক) ভারতবর্ষে আঞ্চলিক দলগুলির বৃদ্ধির কারণ কি?

খ) অঞ্চলিক দলগুলির বৃদ্ধি কি ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে হানিকর? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য লিখুন।

আসুন, এবার আমরা সংক্ষেপে দেখে নিই ভারতের দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা কী কী জানলাম।

৭৮.৬ সারাংশ

এই এককটি থেকে ভারতবর্ষের দলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা পরিচিত হলেন। ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কীভাবে সৃষ্টি হল সে সম্পর্কে অপনারা জেনেছেন। এরপর স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থান-পতন আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষের দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার পর সবশেষে দলীয় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ও তার কারণগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

৭৮.৭ অনুশীলনী—৪

১। ১৯৫১ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের দলীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মূল ঘটনা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। ভারতবর্ষের দলীয় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

৭৮.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

ক) ৭৮.২ অংশে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

খ) ৭৮.২ অংশের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

গ) এই প্রশ্নের উত্তরও ৭৮.২ অংশের শেষার্ধে পেয়ে যাবেন।

অনুশীলনী—২

ক) যখন কোনো রাজনৈতিক দলই সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তখন বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এই ধরনের সরকারকে জোট সরকার বা যুক্তফ্রন্ট সরকার বা Coalition Government বলে। সাধারণত, এক আদর্শে বিশ্বাসী, সমমনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলিই এই ধরনের জোট সরকার গঠন করে। ভারতের একটি সফল জোট সরকারের উদাহরণ হল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, যেটি ১৯৭৭ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় রয়েছে। ন্ট

জোট সরকারে অংগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময়ে নির্বাচনে আগেই নিজের মধ্যে সমঝোতা করে নেয় এবং সেই সমঝোতার ভিত্তিতেই নির্বাচনের একটি জোট হিসাবে অংশগ্রহণ করে। একে বলে নির্বাচন-পূর্ব আঁতাত বা pre-poll alliance. আবার অনেক সময়ে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবার পর কিছু দল নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে একজোট হয় এবং একটি সরকার গঠন করে। একে বলে নির্বাচনোত্তর সমঝোতা বা post-poll alliance.

জোট সরকার মাত্রেই যে সেটি একটি দুর্বল সরকার হবে তা নয়। সরকারের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে জোট সরকারে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা, একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা প্রভৃতির উপর।

খ) যখন কোনো রাজনৈতিক দলই সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না, তখন সেই সংসদকে ত্রিশঙ্কু সংসদ (বা hung parliament) বলে। ভারতে ১৯৮৯ সালের নবম জাতীয় নির্বাচন থেকে ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ নির্বাচন পর্যন্ত প্রত্যেক বারই সংসদ ত্রিশঙ্কু থেকেছে।

ত্রিশঙ্কু সংসদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সাধারণত জোট সরকারকে দেখা হলেও ১৯৯১ সালে এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়েও এককভাবেই সরকার গঠন করেছিল এবং কিছু ছোট দলের সমর্থন পেয়ে শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগুরু সরকারে পরিণত হয়েছিল।

ত্রিশঙ্কু সংসদীয় অবস্থাকে অনেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিরোধী বলে মনে করেন। ভারতের সাম্প্রতিককালের জোট সরকার গঠন এবং ঘন ঘন সরকার পতন এবং নির্বাচন ঐ বক্তব্যকেই সমর্থন করে। তবে অনেকের মতে ভারত যেহেতু একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং বহু ভাষার, ধর্মের, জাতের উপজাতির মিলনক্ষেত্র সেহেতু একটি দলের পক্ষে সর্বভারতীয় সমর্থন পাওয়া অসম্ভব। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে এই ধরনের সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়েছিল কারণ সেই সময়ে আত্মসচেতনতা বা রাজনৈতিক অভিজ্ঞান যথেষ্ট পরিমানে গড়ে ওঠে নি। বস্তুত, সাম্প্রতিককালে ত্রিশঙ্কু সংসদ ভারতীয় অধিবাসীদের রাজনৈতিক সাবালকত্ব নির্দেশ করে।

গ) ৭৮.৩.৫ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

অনুশীলনী—৩

ক) ৭৭.২.২ অংশে এর উত্তর পাবেন।

খ) ৭৮.৫ অংশটির শেষার্ধের সাহায্যে এই প্রশ্নটির উত্তর দিন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১) ৭৮.৩ অংশটিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

৭৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Johari, J. C. *Indian Govt. & Politics, Vishal Publications, Delhi-Jalandhar, 1989.*
2. Pylee, M.V. – *Constitutional Govt. in India, Asia Publishing House, Bombay-Calcutta-New Delhi - Lucknow - Madras - Bangalore - London - New York.*
3. দুর্গাদাস বসু — *ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অফ্ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী*
4. অনাদিকুমার মহাপাত্র — *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা*
5. নিমাইসাধন প্রামাণিক—*ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা।*

একক ৭৯ ☐ অঞ্চলিকতাবাদ

গঠন

৭৯.০ উদ্দেশ্য

৭৯.১ প্রস্তাবনা

৭৯.২ ভারতবর্ষের আঞ্চলিকতাবাদের উৎস

- ৭৯.২.১ প্রাচীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ
- ৭৯.২.২. মধ্যযুগীয় ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ
- ৭৯.২.৩ আধুনিক ইংরেজ শাসিত ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ
- ৭৯.২.৪ স্বাধীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ

৭৯.৩ আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান

- ৭৯.৩.১ ভৌগোলিক উপাদান
- ৭৯.৩.২ ঐতিহাসিক উপাদান
- ৭৯.৩.৩ জাত-পাত
- ৭৯.৩.৪ ধর্ম
- ৭৯.৩.৫ ভাষাগত উপাদান
- ৭৯.৩.৬ এথ্‌নিসিটি
- ৭৯.৩.৭ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উপাদান
- ৭৯.৩.৮ অর্থনৈতিক উপাদান
- ৭৯.৩.৯ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

৭৯.৪ আঞ্চলিকতাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

- ৭৯.৪.১ কোর-পেরিফেরি-অ্যাপ্রোচ
- ৭৯.৪.২ নেটিভিস্টিক অ্যাপ্রোচ
- ৭৯.৪.৩ ম্যার্ক্সিস্ট অ্যাপ্রোচ

৭৯.৫ আঞ্চলিকতাবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

- ৭৯.৫.১ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন
- ৭৯.৫.২ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন
- ৭৯.৫.৩ বোড়োল্যান্ড আন্দোলন

৭৯.৬ সারাংশ

৭৯.৭ অনুশীলনী

৭৯.৮ উত্তরমালা

৭৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন?

- ভারতবর্ষের আঞ্চলিকতাবাদ
- আঞ্চলিকতাবাদের উপাদানসমূহ
- আঞ্চলিকতাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও
- আঞ্চলিকতাবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

৭৯.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ। অঞ্চল বলতে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত একটি সামাজিক সমষ্টিকে বোঝায়। কি কি উপাদান দিয়ে সমষ্টিটি গঠিত হবে তা পূর্বনির্ধারিত নয়। উপাদাাাানগুলি ভৌগোলিক, ধর্মীয়, ভাষাগত, আর্থ-সামাজিক, আচার-বিচারগত বা ঐতিহ্যগত যে কোনো একটি বা একাধিক হতে পারে। উপাদানগুলি যাই হোক না কেন একটি অঞ্চল আর একটি অঞ্চলের থেকে পৃথক হয় মূলত 'আমরা', 'আমাদের' এবং 'তোমরা', 'তোমাদের' এই দুই ধরনের মানসিকতার মাধ্যমে।

আঞ্চলিকতাবাদকে তাত্ত্বিক দিক থেকে সেই কারণে আত্মপরিচয় প্রকাশের একটি রূপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রাচীন তত্ত্বগুলি আঞ্চলিকতাবাদকে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আঞ্চলিকতাবাদকে কেবল ত্রুটিপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখেন না। স্থানীয়তাবাদ এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যবর্তী একটি প্রক্রিয়া হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদকে ধরা হয়।

৭৯.২ ভারতবর্ষে আঞ্চলিকতাবাদের উৎস

বর্তমানে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আঞ্চলিকতাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক নেতা, আঞ্চলিক আন্দোলন প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। আসুন, ভারতবর্ষে আঞ্চলিকতাবাদ কবে থেকে এবং কীভাবে এসেছে তা' এবার আমরা দেখি।

৭৯.২.১ প্রাচীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতবর্ষ নামক একটি রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতনতা চিরকালই ভারতবাসীদের মধ্যে ছিল। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থান এই ধরনের সচেতনতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ঐতিহাসিক রচনাগুলির থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক দেশ

হিসাবে থাকলেও অসংখ্য ছোটো ছোটো অঞ্চল এবং প্রদেশে বিভিক্ত ছিল। এছাড়া প্রাচীনযুগে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিভাজন ছিল যা ভারতীয় মনোভাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন ভারতের মূল্যবান রচনা 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'তে বিদেহর সম্রাট জনকের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সম্রাট' অর্থাৎ বিশাল অঞ্চলের রাজা হিসাবে জনকের উল্লেখ থাকলেও সেই সময়ে উত্তর ভারতে অন্ততপক্ষে নয়টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। বৌদ্ধ রচনা 'অঙ্কুত্তর নিকায়' থেকে ষোলটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকে ষোড়শ মহাজনপদ বলা হয়।

তবে একথাও সত্য যে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য একজন রাজার অধীনস্থ থাকবার ইচ্ছা এবং প্রবণতা সেই সময়ে মানুষের মধ্যে ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোকের সময়ে আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে 'চক্রবর্তী-ক্ষেত্র' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত প্রাচীন যুগে কেন্দ্রমুখী এবং অঞ্চলমুখী এই দুই ধরনের শক্তির সংঘর্ষ এবং সংঘাত দেখা যায়। একদিকে বিদেশী শক্তির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার এবং থাকবার চেষ্টা আর অপরদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের দরুন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকবার ফলে আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যেত।

৭৯.২.২. মধ্যযুগীয় ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ

মধ্যযুগে বিদেশী শাসকদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হবার পর মুঘল যুগে ভারতকে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার সেই সময়ে প্রভূত উন্নতি হওয়ায় দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে পরস্পর যুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর্থিক এবং ব্যবসায়িক দিক থেকেও এই সময়ে ভারত যথেষ্ট উন্নতি করেছিল যা' রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

লক্ষণীয় যে একদিকে বিভিন্ন সুলতানদের আমলে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভবপর হলেও পাসাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে আঞ্চলিক সচেতনতা ছিল। মহারাষ্ট্রে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মারাঠী ভাষা, মারাঠী সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মারাঠী সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে শিবাজীর সময়ে মারাঠীদের মধ্যে এই সচেতনতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে আফগানিস্তান, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলেও আঞ্চলিক সচেতনতার প্রতিফলন দেখা যায়।

৭৯.২.৩ আধুনিক ইংরেজ-শাসিত ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ

ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয়তাবাদী মানসিকতার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করবার জন্য সারা ভারতে পণ্যদ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা করে। সেই কারণে রেল, সড়ক প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি ভারত জুড়ে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়। এছাড়া

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে এবং কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে প্রান্তিক অঞ্চলগুলিকেও একটি ছত্রছায়ার নীচে আনা সম্ভব হয়েছিল।

এইসব কারণে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সীমাগুলিকে অতিক্রম করে ভারতীয় মানসিকতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। সেই সময়ে ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাবাদ গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তাবাদ গঠনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রথমদিকে জমিদারশ্রেণী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন হিসাবে পরিচিত হলেও বিংশ শতকে এসে কংগ্রেস একটি প্রকৃত রাজনৈতিক দলের রূপ নেয়। বিংশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের জাতীয়তাবাদকে একটি সুসংহত রূপ দেয়।

তবে জাতীয়তাবাদী শক্তির পাসাপাশি আঞ্চলিক সচেতনতাও এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ১৯১৯ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালের নেহরু প্রস্তাবেও ভারতে ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৭৯.২.৪ স্বাধীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ

স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। বস্তুত, ভারতের মতো একটি বিশাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক কাঠামো রূপে বিবেচিত হতে পারে। বিশেষ কোনো নীতি অনুসরণ করে সেই সময়ে প্রদেশগুলি গঠন করা হয়নি; মোটামুটিভাবে ব্রিটিশ আমলের বিভাজনকেই মেনে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশকেই ভাষাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতাবাদ দক্ষিণ ভারতে প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠন করতে বাধ্য হয় এবং তারপর ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশগুলি বিভাজন ও সংযোজনের ফলে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং কর্ণাটক বর্তমান ভৌগোলিক চেহারা পায়।

ষাটের দশকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রাবল্য কমে এলেও সত্তরের দশক থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে আঞ্চলিকতাবাদ বৃদ্ধি পায়। কোনো কোনো সময়ে এই প্রবণতা সমগ্র ভারতে তীব্র আকার ধারণ করে; আবার কোনো কোনো সময়ে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। একমাত্র কাশ্মীরের আঞ্চলিক সচেতনতা স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে শুরু হয়েছে যা' এখনো পর্যন্ত সমান মাত্রায় বিদ্যমান।

অনুশীলনী—১

ক) প্রাচীন ভারতের আঞ্চলিক সচেতনতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

খ) ইংরেজ শাসিত ভারতে জাতীয়তাবাদী মনোভাব কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল? এ বিষয়ে বিশদভাবে লিখুন।

গ) স্বাধীন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ল সে সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

৭৯.৩ আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান

আঞ্চলিকতাবাদ মূলত একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা' বহু উপাদান নিয়ে গঠিত। আসুন উপাদানগুলি নিয়ে এক এক করে এবার আমরা আলোচনা করি।

৭৯.৩.১ আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান

মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল একই অঞ্চলে বসবাসকারী একই সামাজিক অবস্থার লোকদের সঙ্গে সে মেলামেশা করতে পছন্দ করে। ক্রমশ এই মেলামেশা একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক একাত্মবোধের জন্ম দেয়। প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ইকবাল নারায়ণের মনে ভারতের আঞ্চলিকতাবাদের ভৌগোলিক উপাদানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পরেই পূর্বতন কিছু কিছু দেশীয় রাজ্য একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তম প্রদেশের জন্ম দেয়। এই নতুন রাজ্যগুলি অনেক সময়েই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিভক্ত মানসিকতা এও দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়।

৭৯.৩.২ ঐতিহাসিক উপাদান

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোক সাংস্কৃতি, লোকগাথা প্রভৃতির সাহায্যে ঐতিহাসিক কারণেও আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়িয় আন্দোলন এবং তার সঙ্গে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘামের (DMK) প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে কীভাবে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা আন্দোলন ও আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে ইন্ধন যোগায়।

তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়ীয় আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কীভাবে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক 'মিথকে' এই আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ঃ একটি আর্য সভ্যতার উত্তর ভারত এবং অপরটি দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার দক্ষিণ ভারত। এই দুই জনগোষ্ঠী সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ সাল নাগাদ আর্যরা যখন দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে তখন থেকে এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং মেলামেশা শুরু হয়। ক্রমেই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরা আর্য সমাজের মতো দ্রাবিড়ীয় সমাজে উচ্চ স্থান পেতে লাগল এবং ক্রমে তামিল সমাজ জাত-পাতের ওপর ভিত্তি করে বিভাজিত হয়ে গেল। কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচারের কারণ হিসাবে দেখা হতে লাগলো। ফলস্বরূপ এক তীব্র ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাব তামিল সমাজে দেখা দিল। এই মনোভাব ১৯৬০ সালে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘামের মাধ্যমে পরিস্ফুট হল।

৭৯.৩.৩ জাত-পাত

এককভাবে জাত-পাতের ধারণা আঞ্চলিকতাবাদের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। অন্যান্য কিছু উপাদান যেমন ভাষা বা অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হলে জাত্যাভিমানের জন্ম হয় এবং তা' আঞ্চরিকতাবাদের জন্ম দিতে পারে। ৭৯.৩.২-এ আলোচিত দ্রাবিড়ীয় আন্দোলন কেবলমাত্র জাত-ভিত্তিক ছিল না। ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাবের পিছনে ছিল ব্রাহ্মণদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য ও শোষণ যা দ্রাবিড়ীয়দের সাংস্কৃতিক অভিমানে ধাক্কা দিয়েছিল।

৭৯.৩.৪ ধর্ম

জাত-পাতের মতো ধর্মও আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপাদান যেমন ভাষাগত ঐক্য বা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ইত্যাদি যুক্ত হয়ে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়।

পাঞ্জাবের অকালি-শিখ আন্দোলন ধর্মকে একটি উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে। অকালিদের স্বতন্ত্র পাঞ্জাব রাজ্যের দাবির পেছনে হিন্দুদের প্রাধান্যের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালের মোতিলাল নেহেরু রিপোর্টে শিখদের আলাদা জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের গোল টেবিল বৈঠকে শিখ নেতৃত্ব স্বাধীন পাঞ্জাব গঠনের দাবি প্রথম তোলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপ মহাদেশের সমস্ত সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত বিভাজিত হয়। শিখদের সমস্যাকে সেই সময়ে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়।

দেশবিভাগের পর পাঞ্জাবের জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশ ছিল হিন্দু এবং ৩৩ শতাংশ ছিল শিখ। এছাড়া দেশবিভাগের ফলে পাঞ্জাবের ভাষাগত চরিত্রও বদলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর পাঞ্জাবের প্রধান ভাষা হয়ে দাঁড়াল হিন্দি। অপরদিকে স্বাধীনতার আগে পাঞ্জাবী ছিল তাদের প্রধান ভাষা। এছাড়া গুরমুখী ও দেবনাগরী হরফ নিয়েও শিখ এবং হিন্দুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সুতরাং ধর্মীয় উপাদান ব্যবহৃত হলেও অকালি-শিখ আন্দোলন মূলত ভাষা এবং হরফকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক ছিল তাকে ব্যবহার করে আশির দশকে তীব্র আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিয়েছিল যা প্রায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

৭৯.৩.৫ ভাষাগত উপাদান

আঞ্চলিকতাবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভাষা। ভাষা অর্থাৎ মানুষের কথা বলার মাধ্যম একদিকে যেমন মানুষকে কাছে টেনে নেয়, বন্ধুত্বের জন্ম দেয়; অপরদিকে আবার ভাষার পার্থক্যে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদের জন্ম দেয়।

১৯৫৩ সালে তেলেঙ্গানা আন্দোলন এবং তেলেগুদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন ভাষার গুরুত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়। বস্তুত ১৯৫৬ সালে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠন মূলত ভাষার উপর ভিত্তি করেই হয়।

এই ভাবে বোম্বাই রাজ্য ভেঙে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়; পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার জন্ম হয়।

৭৯.৩.৬ এথ্‌নিসিটি (Ethnicity)

ভারতবর্ষে বহু উপজাতির বাস। 'এথ্‌নিক গ্রুপ' কথাটিকে পরিভাষায় আদিবাসী গোষ্ঠী বা উপজাতি গোষ্ঠী বলে। 'আদিবাসী' শব্দটির অর্থ হল কোনো অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী। যে কোনো অঞ্চলের সম্পদের ওপর এই আদি জনগোষ্ঠীরই প্রাথমিক দাবি থাকে।

স্বাধীনতার পর শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের প্রভাবে ভারতবর্ষের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। অন্য অঞ্চল থেকে আগত অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সেই নতুন অঞ্চলে ব্যবহার করে যা' সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে 'বিদেশী' বলে মনে হয় আদিবাসীরা একদিকে এইসব মানুষদের 'বিদেশী' বা 'বহিরাগত' হিসেবে গণ্য করেছে, অপরদিকে নিজেদের সংস্কৃতি এবং স্বাতন্ত্র্য আরও সুরক্ষিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। ক্রমে এই স্বতন্ত্র সত্তা আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে সাঁওতাল, হো, মুন্ডা প্রভৃতিদের পরিচালিত ঝাড়খণ্ড আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

৭৯.৩.৭ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উপাদান

রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক 'এলিট' গোষ্ঠী নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সময়েই পরোক্ষভাবে আঞ্চলিকতাবাদকে উস্কানি দেয়। বস্তুত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময়েই তাদের সমর্থনের ভিত্তি হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদকে বেছে নেয়। আঞ্চলিক বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে, আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রচার করে, 'আমরা - তোমরা' প্রভেদ প্রভৃতিকে মদত দিয়ে, রাজনীতিবিদরা অনেক সময়েই আঞ্চলিক সমর্থন আদায় করে। এর ফলে অনেক সময়েই সুপ্ত আঞ্চলিকতাবাদ প্রকট হ'য়ে ওঠে এবং কালক্রমে আঞ্চলিক আন্দোলনের জন্ম দেয়।

আঞ্চলিক দলগুলি অধিকাংশ সময়েই এইভাবে সুপ্ত আঞ্চলিকতাবাদকে জাগিয়ে তুলে সমর্থন আদায় করে। তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে, অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু দেশম, নাগাল্যান্ডের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার আমরা বাঙালি, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, কেরালার গোপাল সেনা এবং আসামের বজরং সেনা এইরকম কতকগুলি আঞ্চলিক দলের উদাহরণ।

৭৯.৩.৮ অর্থনৈতিক উপাদান

অধ্যাপক ইকবাল নারায়ণ অর্থনৈতিক উপাদানকে আঞ্চলিকতাবাদের মূল উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ক্ষেত্রে উন্নতি করলেও ভারত মূলত একটি উন্নয়নশীল দেশ। পশ্চিম ইউরোপেব

দেশগুলির সমপর্যায়ভুক্ত হতে গেলে ভারতকে অনেক পথ পেরোতে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের মূল সমস্যাগুলি হলো বিভিন্ন অঞ্চলের অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশাল জনসংখ্যার চাপ, জনসংখ্যার তুলনায় সীমিত সম্পদ এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক।

অঞ্চলগত দিক থেকেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতের সব অঞ্চলে সমান হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে নি। কিছু কিছু অঞ্চল যেমন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলটি চিরকালই অনুন্নত এবং স্বাধীনতার পরও ভারতের অন্যান্য উন্নত অঞ্চলগুলির সমকক্ষ হতে পারে নি। আবার কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন দক্ষিণ বিহারে প্রভূত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অভাব প্রভৃতির কারণে ঐ অঞ্চল অনগ্রসর থেকে গেছে। এইসব কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এক অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল আঞ্চলিকতাবাদ।

৭৯.৩.৯ মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

আঞ্চলিকতাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। বস্তুত, মানুষের মনের মধ্যেই আঞ্চলিকতাবাদের বীজ লুকিয়ে থাকে। ৭৯.৩. এ উল্লিখিত সমস্ত উপাদানগুলি কখনই একসাথে বা আলাদাভাবে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিতে পারে না যদি না মানুষের মন আঞ্চলিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই জন্যই সমাজবিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ের মতো আঞ্চলিকতাবাদও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত, ভারতের মতো একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রে খুব সহজেই একজন ব্যক্তিকে আঞ্চলিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত করা সম্ভব। আবার একথাও ঠিক যে আঞ্চলিক পরিচয় রক্ষা করা কোনো নিন্দনীয় কাজ নয়। ভারতীয় হওয়ার অর্থ এই নয় যে আমি বাঙালি নই। এ প্রসঙ্গে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিতর্কে সাংসদ লোকনাথ মিশ্রের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

"আমার প্রথম লক্ষ্য হল ভারতমাতার উন্নতি সাধন। আমার মনের গভীরতম স্থল থেকেই আমি প্রথমে একজন ভারতীয়, শেষেও একজন ভারতীয়। কিন্তু যখন আপনি বললেন যে আপনি একজন বিহারী, তখন আমি বলব যে আমি ওড়িয়া; যখন আপনি বললেন যে আপনি লোকজন বাঙালি, তখন আমি বলব যে আমি ওড়িয়া—অন্য সব ক্ষেত্রে আমি একজন ভারতীয়।"

ভারতের আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্লেষণ করে আমরা তা'হলে দেখতে পেলাম যে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যার পেছনে বহু উপাদান কাজ করে। একটি চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরও সহজভাবে বোঝানো যেতে পারে।

৭৯.৪ আঞ্চলিকতাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হল আঞ্চলিকতাবাদ। তবে ভারতে রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯.৩ এ বর্ণিত উপাদানগুলির সাহায্যে

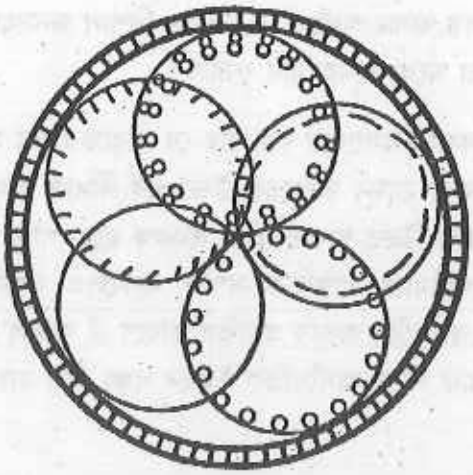

ভারতের আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান

অর্থনৈতিক উপাদান

রাজনৈতিক উপাদান

সাংস্কৃতিক উপাদান

ঐতিহাসিক উপাদান

ভৌগোলিক উপাদান

মনস্তাত্ত্বিক উপাদান

আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম। বহু ভারতীয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভারতের আঞ্চলিকতাবাদের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে ব্যাখ্যাগুলো দিয়েছেন সেগুলো নীচে বর্ণিত হল।

৭৯.৪.১ কোর-পেরিফেরি অ্যাপ্রোচ (কেন্দ্রস্থল-সীমানা দৃষ্টিভঙ্গি)

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মতে মুখ্য এবং গৌণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শোষণমূলক সম্পর্কের জন্যই ভারতে রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই একাধিক জনগোষ্ঠীর বাস। এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি রাষ্ট্রগঠনের সময়ে অধিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। কালক্রমে এই জনগোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রটির মূল বা মুখ্য জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত লাভ করে। অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের উন্নতির জন্য ক্রমেই মুখ্য গোষ্ঠীগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে কারণ তারাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

ভারতে ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ব্রিটিশ আমলেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ—যে দুটির সাহায্যে ভারতবাসীরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়—এই দুটি ব্যবস্থাই ছিল অসম। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এই দুটি ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে যার ফলে কিছু অঞ্চল এবং সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে উন্নতি করে। ফলে মূল এবং প্রান্তিক—এই ধরনের জনগোষ্ঠী তখন থেকেই দেখা যায়।

স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি বঞ্চনার স্বীকার হয় এবং মূল রাজনৈতিক জীবনস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্রমেই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন হয় এবং মূল গোষ্ঠীগুলির 'দাদাগিরি' আর সহ্য করতে চায় না। ফলে নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে তারা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় এবং আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দাবি পেশ করে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, বোড় আন্দোলন, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, উত্তরাখণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলন মূল-প্রান্তিক সম্পর্কের প্রতিফলন।

৭৯.৪.২. নেটিভিস্টিক অ্যাপ্রোচ (ভূমিপুত্র তত্ত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গি)

কিছু অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদর মতো ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রকৃত কারণ নিহিত আছে 'নেটিভ্-মাইগ্র্যান্ট' সম্পর্কের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মতে ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই বহু ধর্মের, বহু জাতের এবং বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে গোষ্ঠী যে অঞ্চলে বাস করেছে, সেই গোষ্ঠীরই সেই অঞ্চলের সম্পদের উপর প্রাথমিক দাবি থাকে। এই ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো চালু হবার আগে পর্যন্ত কার্যকরী ছিল।

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে মাইগ্রেশন বা এক অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। যে অঞ্চলগুলি প্রভূত সম্পদশালী বা যে অঞ্চলগুলিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি-নির্ভর কলকারখানা রয়েছে সেই অঞ্চলগুলিতে জনসমাগম অনেক বেশি পরিমাণে হয়। ফলে সেই সব অঞ্চলগুলিতে অঞ্চলের আদি অধিবাসী যাদের আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভূমিপুত্র বলেন, তাদের সঙ্গে মাইগ্র্যান্ট বা অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে এবং বিশেষ করে সম্পদের ওপর অধিকারকে কেন্দ্র করে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। সাংস্কৃতিক পার্থক্য এই খারাপ সম্পর্ককে আরও খারাপ করে তোলে। আসামের বাঙালি বিরোধী আন্দোলন, মহারাষ্ট্রে আন্দোলন এই ভূমিপুত্র-বহিরাগত সম্পর্কের প্রতিফলন।

৭৯.৪.৩ মার্ক্সিস্ট অ্যাপ্রোচ্ (মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ)

ম্যার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের মতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ভারতে

আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ভারতে স্বাধীনতার সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে দেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে আসে এবং শ্রমিক শ্রেণী এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনো সুবিধা পায় নি।

প্রথম থেকেই ভারতীয় পুঁজিবাদ কতকগুলি দুর্বলতা নিয়ে এগোতে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমী ইউরোপীয় দেশগুলিতে জাতি গঠন রাষ্ট্রগঠনের আগে ঘটে। ফলে আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই সেখানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, আধুনিকতা, সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সঠিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই ভারত একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফলে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণীদের কাছেই বোধগম্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রথম থেকেই সেই কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে থাকা রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীগুলি কতকগুলি সমস্যার মধ্যে কাজ করে।

একদিকে সুষ্ঠুভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় না, অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও আধুনিক প্রক্রিয়া সংগঠিত করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমলাতন্ত্র। তাদের হাতেই আধুনিক জাতি গঠনের দায়িত্ব এসে পড়ে। একটা কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই আমলাতন্ত্র এতদিন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার একটা অংশ হিসেবে কাজ করেছে। এই শ্রেণী ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু এই শ্রেণীর হাতেই প্রভূত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দিয়ে জাতি গঠনের কাজ করতে বলা হল।

এইসব কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক এলিটশ্রেণী-বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছে। মার্ক্সীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে আঞ্চলিকতাবাদ মূলত পুঁজিবাদী ও এলিট শ্রেণীবিরোধী মনোভাবেরই প্রতিফলন।

অনুশীলনী—২

ক) কোর-পেরিফেরি দৃষ্টিকোণের প্রবক্তারা ভারতের আঞ্চলিকতাবাদকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন?

খ) 'ভূমিপুত্র' কথাটি বলতে কী বোঝেন? ভূমিপুত্রদের সঙ্গে অন্য অঞ্চল থেকে আগত অধিবাসীদের সম্পর্ক কীভাবে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়? আপনার বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দিন।

৭৯.৫ আঞ্চলিকতাবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

আঞ্চলিকতাবাদের প্রভাবে ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এই আন্দোলনগুলির তীব্রতা এবং প্রভাব এক একরকম। কয়েকটি আন্দোলন পরপৃষ্ঠায় আলোচিত হ'ল।

৭৯.৫.১ ঝাড়খন্ড আন্দোলন

ঝাড়খন্ড আন্দোলন ভারতের একটি বহু প্রাচীন আন্দোলন। দক্ষিণ বিহার এবং তার সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং পশ্চিবঙ্গের মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি ঝাড়খন্ড আন্দোলনের মূল বিষয়। ঝাড়খন্ড শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল জঙ্গলের অঞ্চল। আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেমন সাঁওতাল, হো, মুন্ডা প্রভৃতি এবং কতকগুলি অনগ্রসর জাত যেমন মুচি, কামিন, রাওয়ার প্রভৃতিদের রাজনৈতিক দাবি হল রাজখন্ড রাজ্য গঠন।

একটি স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবি সর্বপ্রথম ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সামনে পেশ করা হয়। তবে সেই দাবি তখন মানা হয় নি। স্বাধীনতার পর স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যের জন্য সদ্যগঠিত ঝাড়খন্ড পার্টির নেতৃত্বে ঝাড়খন্ড আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে বিহার বিধানসভায় ঝাড়খন্ড পার্টি সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সামনে আবার স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজোর দাবি রাখা হয়। কমিশন তিনটি কারণে এই দাবি অগ্রাহ্য করে ঃ ঐ অঞ্চলে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু ছিল, দ্বিতীয়ত, ঐ অঞ্চলে বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস, কাজ চালাবার জন্যও এমন কি একটি ভাষা পাওয়া অসম্ভব, এবং তৃতীয়ত, একটি স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্য ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সিদ্ধান্ত ঝাড়খন্ড পার্টিকে আশাহত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশকে ঝাড়খণ্ড পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে। এতদিনকার নেতা জয়পাল সিং তার সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস দলে যোগ দেন। এর ফলে ঝাড়খন্ড পার্টিতে অভ্যন্তরীণ কলহ ও কোন্দল দেখা দেয়। ১৯৬৯ সালের মধ্যে ঝাড়খন্ড পার্টি তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়।

এরপর বেশ কিছুদিন ঝাড়খন্ডী রাজনীতি সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৭৩ সালে শিবু সোরেনের নেতৃত্বে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা গঠিত হবার পর ঝাড়খন্ডী রাজনীতি আবার সুসংহত রূপ পায়। সত্তরের দশকে বহু আঞ্চলিক দল ভারতীয় রাজনীতির আঙিনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে। ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থাও সেই সময়ে বিশেষ ভাল ছিল না। এই পরিস্থিতিতে ঝাড়খন্ড মুক্তিমোর্চা ঝাড়খন্ডী রাজনীতিতে এক বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে।

আশির দশকের প্রথম দিকে বিভিন্ন কারণে শিবু সোরেন তাঁর জনপ্রিয়তা হারান। কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব এবং স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চাকে ক্রমশ আবার পাদপ্রদীপের আলোয় আনে। ১৯৮৬ সালে ছাত্রদের নেতৃত্বাধীন অল ঝাড়খন্ড স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন গঠিত হয় যা একদিকে ঝাড়খন্ডী রাজনীতিতে নতুন উদ্দীপনা আনে, অপরদিকে স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবিকে আরও জোরদার করে।

৯০-এর দশক সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। কেন্দ্রীয় সংসদে এককভাবে কোনো রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আঞ্চলিক দলের সাহায্যে জোট সরকার গঠন করতে হয়। এই নতুন পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঝাড়খন্ডী দলগুলি স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে।

১৯৯৪ সালে কেন্দ্রীয় এবং বিহার সরকার দক্ষিণ বিহারের ১৮টি জেলাকে নিয়ে 'ঝাড়খন্ড এরিয়া অটোনমাস্ কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা করে। কাউন্সিল কিছুটা প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। এই কাউন্সিল অবশ্য ঝাড়খন্ডীদের খুশী করতে পারে নি। ফলে তারা স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্যের দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ বিহারে স্বতন্ত্র 'বনাঞ্চল' রাজ্য গঠনের কথা ঘোষণা করে, যদিও এখনও অবধি তা বাস্তবায়িত হয় নি।

৭৯.৫.২ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জেলা দার্জিলিং-এ সংগঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইষ্ট কোম্পানি সিকিমের রাজার কাছ থেকে দার্জিলিং জেলাটি উপহার হিসাবে পায়। জেলাটি মূলত পার্বত্য বলে এই অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া প্রভৃতি চা-চাষের বিশেষ উপযোগী ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বুঝতে পেরে ১৮৬১ সালের মধ্যে ২২টি চা বাগান স্থাপন করে। চা ছাড়াও সিঙ্কোনা ও কফি চাষের পক্ষেও এই অঞ্চল উপযোগী ছিল। চা বাগান ও কফি চাষের জন্য মূলত ছোটোনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলের অধিবাসী এবং নেপালের লুম্বিয়াম অঞ্চলের নেপালীরা কাজ করতে আসতো। সেই থেকে কিছুটা ব্রিটিশ মদতে নেপালিরা এই অঞ্চলে থেকে যায়।

১৯০৭ সালে আঞ্চলিক উচ্চবিত্ত শ্রেণী দার্জিলিংকে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক জেলা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানান। ১৯১৭ সালে 'এলিটদের' নেতৃত্বাধীন হিল্‌মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন ইংরেজ সরকারের কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করেন যেখানে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলকে নিয়ে দার্জিলিংকে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে সাইমন কমিশনের কাছেও এই দাবি জানান হয়।

৩০-এর দশকে নেপালিরা নিজেদের ভাষা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং স্বতন্ত্র ভাষার ওপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব পরিচিতি গড়ে ওঠে। ১৯৪৩ সালে নেপালিরা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে যেটি অল্ ইন্ডিয়া গোর্খা লীগ নামে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার ঠিক আগে গোর্খা লীগ দার্জিলিংয়ের জন্য আঞ্চলিক স্বাধীনতা চায় এবং তারা বাংলার চেয়ে আসামের সঙ্গে দার্জিলিং জেলাটির সংযুক্তিকরণ চায়। স্বাধীনতার পর ১৯৫৫ সালেও রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ দার্জিলিংকে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল হিসাবে গঠন করার দাবি জানানো হয়।

গোর্খা ভাষা সংক্রান্ত দাবি এবং গোর্খাদের সাংস্কৃতিক সচেতনতার প্রতি সি. পি. আই দল প্রথম থেকেই সহানুভূতিশীল ছিল। বস্তুত, পার্বত্য অঞ্চলের সরকারি ভাষা হিসাবে নেপালিকে ঘোষণা করার দাবি সর্বপ্রথম সি. পি. আই. পেশ করে। গোর্খা লীগ এই দাবিগুলোর প্রতি স্বভাবতই সমর্থন জানায়। সুতরাং স্বাধীনতার পর সত্তর দশক পর্যন্ত গোর্খাদের দাবি পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতীয় মূল জীবনস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্নতার দাবি ছিল না। বস্তুত, ১৯৬৯ সালের পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারে গোর্খা লীগ যোগ দেয়।

আশির দশকে এই আন্দোলন সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে এক নতুন মোড় নেয়। ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে গোখা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি জানিয়ে জঙ্গী আন্দোলন চালায়।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পেছনে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বা ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র কারণ ছিল না। দারিদ্র সরকারি উদাসীনতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছিল। তবে ১৯৮৬ সালে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে মেঘালয় রাজ্য থেকে নেপালি বিতাড়নের বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে কাজ করছিল। প্রায় ৫০০০ নেপালি শ্রমিককে খাসী ছাত্র ইউনিয়ন এবং অল মেঘালয় স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন মেঘালয় রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে। এই ঘটনাকে মূলধন করে সুবাস ঘিসিং দার্জিলিংয়ের নেপালি অধিবাসীদের মধ্যে উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ জাগিয়ে তোলেন।

১৯৮৬ সাল থেকে ঘিসিংয়ের নেতৃত্বাধীন জি. এন. এল. এফ স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের জন্য আন্দোলন শুরু করে। গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের মধ্যে তারা দার্জিলিং জেলা ছাড়াও জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। ২,২৫৬ বর্গ মাইল অঞ্চল বিশিষ্ট গৌর্খাল্যান্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে দেখা দিত।

১৯৮৬-৮৭ সালে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন বন্ধ ঘোষণার মাধ্যমে তাদের দাবিগুলিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার চেষ্টা করে। এর ফলে চা বাগানগুলিকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। '৮৬ সাল থেকেই এই আন্দোলন একটি জঙ্গী আন্দোলন পরিণত হয়।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সম্পর্কে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিপরীতধর্মী মনোভাব বিষয়টিকে জটিল এবং অহেতুক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। রাজ্য সরকার এই আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আন্দোলন বলে ঘোষণা করে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নেতৃত্ব বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে সাহায্যের জন্য চিঠি লেখায়।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এটিকে ভারত-বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে আন্দোলনটি স্বাধীন স্বাতন্ত্র, সার্বভৌম গোর্খাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, চায় ভারতের অভ্যন্তরে একটি পৃথক অঙ্গরাজ্য।

১৯৮৮ সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল্ কাউন্সিল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি থেকে জি. এন. এল. এফ সরে আসে। পার্বত্য দার্জিলিং জেলার অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা বিশিষ্ট কাউন্সিল তৈরি করা হয়।

৭৯.৫.১ বোড়োল্যান্ড আন্দোলন

আসাম রাজ্যের জেলাগুলিকে ভৌগোলিক দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। সমতল অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসী অধ্যুষিত, অপরদিকে সমতল অঞ্চলে উপজাতি ও সাধারণ উভয় গোষ্ঠীরই বাস। সমতল অঞ্চলের উপজাতিরা বহুকাল ধরেই কৃষিভিত্তিক জীবনধারণে অভ্যস্ত। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই সংখ্যায় কম হলেও এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতা দেখা যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর নাগাদ চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত এবং সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ বর্তমান ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এরপর ব্রহ্মপুত্র নদের কাছাকাছি উর্বর অঞ্চলে এসে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে থাকে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এদের মেখ্ বলা হয়, উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলে এরা দিম্সা নামে পরিচিত হয় এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কাছাড়ি অঞ্চলে এরা বোড়ো নামে পরিচিত হয়।

১২২৮ সাল নাগাদ থাইল্যান্ড থেকে অহম্রা আসামে প্রবেশ করে এবং ক্রমেই বোড়ো ও অহ্মদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। অহম্দের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে বোড়ো রাজত্ব হ্রাস পেতে থাকলেও ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত বোড়ো রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সাল থেকেই বোড়োরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে। প্রথমে বোড়ো সাহিত্য সভার নেতৃত্বে বোড়োরা প্রাথমিক স্কুল স্তরে বোড়ো ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে কারবার দাবি জানায়। এরপর ষাটের দশকে আসামের আন্দোলনে অসমিয়ারা অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চায়; অপরদিকে বোড়োরা অসমিয়ার সঙ্গে ইংরাজীকেও সরকারি ভাষা হিসাবে রাখতে চায়।

১৯৬৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী আসামকে

পুনর্গঠন করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই ঘোষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ বছরেই প্রথমে অল বোড়ো স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন (আব্সু) এবং পরে প্লেইনস্ ট্রাইবাল কাউন্সিল অফ আসাম (পি.টি.সি.এ.) গঠিত হয়।

পিটিসিএ প্রথম থেকেই একটি জঙ্গী সংগঠন এবং আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষাই এর প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন এই সংগঠন বয়কট করে এবং আসামের একটি অংশ নিয়ে গঠিত উদয়াচল নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি জানায়।

১৯৭৭ সালে পিটিসিএতে অভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের জন্য ভাঙন ধরে এবং দু'টি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। ১৯৭৭ সালে জনতা দলের সঙ্গে পি.টি.সি.এর একটি গোষ্ঠী আসাম সরকারে যোগ দেয়। ঐ বছরই পি.টি.সি.এর পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র উদয়াচল রাজ্যের বদলে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়।

প্রাক্তন পি.টি.সি.এর অপর গোষ্ঠী ইউ.টি.এন.এল.এফের সঙ্গে আবসু নিজেদের যুক্ত করে এবং ১৯৮০ সাল থেকে মিশিং বোড়োল্যান্ড নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি জানায়। তবে আশির দশকে 'বিদেশী' বিতাড়ন আন্দোলন আসামে এত প্রবল আকার ধারণ করে যে বোড়োল্যান্ড আন্দোলন সেই সময়ে কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৮৭ সালে আবসুর মধ্যে ভাঙন ধরে। গঙ্গাধর রামচিয়ারী তাঁর সমর্থকদের নিয়ে স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তোলেন; অপরদিকে উপেন ব্রহ্মর নেতৃত্বে আবসু'র মূল গোষ্ঠীটিও থেকে যায়। আবসুর এই গোষ্ঠীটিই আসামকে দ্বিখণ্ডিত করার আহ্বান জানায়। তারা আসামের উত্তরভাগের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উপজাতিদের জন্য রাজ্য এবং দক্ষিণভাগটি নিয়ে অসমিয়াদের জন্য রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করে।

নভেম্বর ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত বাঁশবেরিয়া সম্মেলনে আসামকে দ্বিখণ্ডিত করবার বদলে স্বতন্ত্র বোড়োল্যান্ড গঠনের দাবি করার হয়। ভবিষ্যৎ বোড়োল্যান্ড রাজ্যে কোকরাঝোড়, মাজুলি, সোদিয়া লখিমপুর জেলা এবং ধুবরি, নলবাড়ি, বরবেতা, দরণ এবং গোয়ালপাড়া জেলার বিরাট অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হয়।

বোড়োল্যান্ড আন্দোলনের প্রথম দিকে বনধ্, রাস্তা রোকো, রেল অবরোধ প্রভৃতি কর্মসূচী নেওয়া হয়। কিন্তু ক্রমেই আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে। আবসু নিজস্ব পুলিশ বাহিনী বোড়ো পুলিশ ফোর্সের সাহায্যে সমান্তরাল প্রশাসন স্থাপন করে। আন্দোলনের উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে ছ'টি উপজাতি সংগঠন একটি সম্মেলনে আবসুর কাজকর্মকে নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব আনে।

বোড়োল্যান্ড আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যথেষ্ট সমালোচিত হয় যেহেতু আবসুর কর্মপদ্ধতিকে একবারও কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্যে নিন্দা করে নি। অপরদিকে আসাম রাজ্যের সরকারও প্রয়োজনীয় কোনো

পদক্ষেপ নিতে পারে নি। বিষয়টিকে তারা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবেই দেখেছে।

বোড়োল্যান্ড আন্দোলনের তীব্রতা বর্তমানে কিছু পরিমাণে হ্রাস পেলেও এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে গঠনমূলক কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আন্দোলনটি পরবর্তীকালে একটি জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে।

অনুশীলনী—৩

ক) ঝাড়খন্ড আন্দোলনের পেছনে কী কী কারণ আছে? স্বতন্ত্র ঝাড়খন্ড রাজ্য কি ঐ অঞ্চলের উপজাতিদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?

খ) স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্য স্থাপন আপনার মতে কতটা যুক্তিযুক্ত? যেভাবে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে মোকাবিলা করা হয়েছে তা কি আপনার মতে সঠিক?

গ) বোড়োল্যান্ড আন্দোলনে হিংসার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মতামত সংক্ষেপে জানান।

আসুন, এবার আমরা সংক্ষেপে দেখি যে আঞ্চলিকতাবাদ বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি।

৭৯.৬ সারাংশ

এই এককটি থেকে ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ বা ভারতের রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ বিষয়টি সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। আঞ্চলিকতাবাদ কাকে বলে সে সম্পর্কে জানার পর ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের উৎস সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। প্রাচীন ভারতে, মধ্যযুগে এবং ইংরেজ-শাসিত ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। সবশেষে স্বাধীন ভারতে রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন।

আঞ্চলিকতাবাদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক জাতপাত নির্ভর, ধর্মীয়, ভাষাগত, উপজাতিগত, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি আলোচিত হয়েছে। তিনটি দৃষ্টিকোণ—কোর-পেরিফেরি, নেটিভিস্টিক এবং মার্ক্সীয়—থেকে আঞ্চলিকতাবাদকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবশেষে ঝাড়খন্ড, গোর্খাল্যান্ড এবং বোড়োল্যান্ড আন্দোলন—এই তিনটি আন্দোলনকে আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭৯.৭ অনুশীলনী

১। আঞ্চলিকতাবাদের উপাদান কি কি? যে কোনো দু'টি উপাদান সম্পর্কে বিশদভাবে লিখুন।

২। আঞ্চলিকতাবাদকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? কোর-পেরিফেরী দৃষ্টিকোণ এবং

নেটিভিস্টিক্ দৃষ্টিকোণের মধ্যে কি কোনো মিল আপনি খুঁজে পান?

৭৯.৮ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

ক) ৭৯.২.১ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

খ) ৭৯.২.৩ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

(গ) প্রাক-স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশকেই ভাষাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিকতাবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। প্রথমে তেলুগুভাষীদের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হয় এবং তারপরে ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক তাদের ভৌগোলিক চেহারা পায়।

ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের একটা দিক। এছাড়াও স্বায়ত্তশাসনের দাবির মাধ্যমেও আঞ্চলিকতাবাদ প্রকাশ পেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপেক্ষিত, শোষিত গোষ্ঠী রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের দাবি জানায়। দক্ষিণ বিহারের ঝাড়খন্ড আন্দোলন, আসামের উত্তরভাগে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বোড়োল্যান্ড আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন যথাক্রমে দক্ষিণ বিহারের নিপীড়িত আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর, উত্তর আসামের উপজাতিদের এবং পশ্চিমবঙ্গের গোর্খাদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি।

আঞ্চলিকতাবাদের তৃতীয় একটি দিক হল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। আঞ্চলিকতাবাদের বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি গরে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনগুলি কখনও স্বতন্ত্র রাজ্যগঠনের কখনও বা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়। পাঞ্জাবের খালিস্তানি আন্দোলন, উত্তর-পূর্ব ভারতে মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরায় উপজাতিদের কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী—২

ক) ৭৯.৪.১ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

খ) ৭৯.৪.২ অংশের সাহায্যে উত্তর তৈরি করতে পারবেন।

অনুশীলনী—৩

ক) ৭৯.৫.১ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

খ) পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলাকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার দাবি পুরানো হলেও

স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি কিন্তু মাত্র গত দশকের। ১৯৮৩ সাল থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে বন্‌দ্‌, রেল রোকো ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে এই আন্দোলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ডের জন্য যে দাবিপত্র দেওয়া হয় তাতে উত্তরবঙ্গের ২,২৫৬ বর্গ মাইল অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে পার্বত্য দার্জিলিং ছাড়াও জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারের দুই-তৃতীয়াংশও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া প্রস্তাবিত গোর্খাল্যান্ডের বাকী অঞ্চল কিন্তু নেপালি-অধ্যুষিত নয়। এই সমস্ত অঞ্চলে নেপালিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও কম। সেই কারণে এই অঞ্চলগুলি গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়।

ভারতে বহু ভাষা-ভাষী মানুষের বাস। একথা ঠিক যে প্রত্যেকটি ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য সমান মর্যাদায় বাঁচিয়ে রাখতে পারে না এবং এজন্য রাষ্ট্র যেমন অনেকাংশে দায়ী তেমন প্রাধান্যকারী ভাষা-ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টাও অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু ক্রমাগত ছোটো ছোটো রাজ্য গঠনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সেই কারণে আমার মনে হয় স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড গঠন না করে, দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসনের যে ব্যবস্থা পার্বত্য পরিষদের মাধ্যমে করা হয়েছে, সেটাই সঠিক পথ।

গ) ৩.৫.৩ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

অনুশীলনী—৪

১। ৭৯.৩ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

২। প্রথম অংশটির উত্তর ৭৯.৪ এর সাহায্যে দিতে পারবেন। দ্বিতীয় অংশটির উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে—

আঞ্চলিকতাবাদের দুটি প্রচলিত ব্যাখ্যার একটি হল কোর-পেরিফেরি ব্যাখ্যা, অপরটি হল নেটিভিস্টিক ব্যাখ্যা। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি ব্যাখ্যা ভিন্ন হলেও একটু গভীরে গেলে হয়তো কিছু মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দুটি তত্ত্বেই একটি জনগোষ্ঠীর দ্বারা অপর জনগোষ্ঠীকে শোষণের বিষয়টিকেই আঞ্চলিকতাবাদের মূল কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে।

কোর-পেরিফেরি অ্যাপ্রোচে প্রাধান্যকারী বা মূল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শোষণমূলক সম্পর্ককেই আঞ্চলিকতাবাদের মূল কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অপরদিকে নেটিভিস্টিক্‌, অ্যাপ্রোচে ভূমিপুত্রদের সঙ্গে বহিরাগতদের বৈরী সম্পর্কটিকেই আঞ্চলিকতাবাদের মূল কারণ হিসাবে ধরা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাধান্যকারী

ও অবদমিত গোষ্ঠী কারা—এটি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কটিই যে আঞ্চলিকতাবাদের মূল কারণ—তা দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবক্তারাই মনে করেন।

৭৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। Johari, J. C. — *Indian Govt. & Politics, Vishal Publications, Delhi – Jalandhar.*

২। অনাদিকুমার মহাপাত্র — *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কোলকাতা।*

একক ৮০ ☐ জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (পশ্চিমবঙ্গের ওপর বিশেষ গুরুত্বসহ)

গঠন

৮০.০ উদ্দেশ্য

৮০.১ প্রস্তাবনা

৮০.২ জেলা প্রশাসনের কাঠামো

৮০.২.১ জেলা-স্তরের বিভাগ ও ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী

৮০.২.২ কালেক্টর বা জেলা অফিসারের ভূমিকা

৮০.২.৩ বর্তমানে জেলা প্রশাসনের পরিবর্তিত রূপ

৮০.৩ স্থানীয় শাসন

৮০.৩.১ স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

৮০.৩.২ ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

৮০.৩.৩ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা

৮০.৩.৪ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও গঠন

৮০.৩.৫ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৮০.৩.৬ পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক

৮০.৩.৭ শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

(ক) পৌরসভা

(খ) পৌর প্রতিষ্ঠান

৮০.৩.৮ শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান ও সাংবিধানিক সম্মান

৮০.৩.৯ উপসংহার

৮০.৪ সারাংশ

৮০.৫ অনুশীলনী

৮০.৬ উত্তরমালা

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৭৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি জানতে পারবেন

- জেলা প্রশাসনের কাঠামো
- জেলা কালেক্টরের ভূমিকা
- স্থানীয় শাসন
- বর্তমানে জেলা প্রশাসনের পরিবর্তিত রূপ
- পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ও
- শহরাঞ্চলে সায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

৮০.১ প্রস্তাবনা

ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোয় জেলা প্রশাসনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ শাসিত ভারতে জেলা সর্বনিম্নস্তরের রাজনৈতিক একক হিসাবে পরিচিত ছিল। স্বাধীন ভারতে জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে পূর্বের বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। জেলা অফিসারদের পরিবর্তিত বজায় থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। জেলা অফিসারদের পরিবর্তিত ভূমিকা, জেলা পর্যায়ে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, কার্যকলাপের প্রসার, জনপ্রতিনিধিদের প্রভাব, জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ, পঞ্চায়েতী-রাজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জেলা প্রশাসনের কাঠামোগত এবং লক্ষ্যগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পূর্বের কর্তৃত্বমূলক জেলা প্রশাসন বর্তমানে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে।

৮০.২ জেলা প্রশাসনের কাঠামো

জেলা প্রশাসন দেশের সাধারণ প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রত্যেক জেলায় একটি প্রশাসনিক ক্ষেত্র বিদ্যমান। এই প্রশাসনিক ক্ষেত্রই জেলা প্রশাসন নামে পরিচিত। একটি নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের মাধ্যমে জেলাস্তরের সকল দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং পদাধিকারীর ভূমিকা সমন্বয় সাধন করা হয়। এই কারণে জেলা প্রশাসনকে কার্যক্ষেত্রিক প্রশাসনের একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ বলা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জেলার সংখ্যা ১৯। প্রতিটি জেলা আবার এক বা একাধিক মহকুমা বিভক্ত। প্রতিটি মহকুমা আবার ব্লকে বিভক্ত। জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন জেলা অফিসার বা জেলাশাসক বা কালেক্টর (District Officer or District Magistrate or Collector)। মহকুমার প্রধান হলেন মহকুমা শাসক (Sub divisional Officer) এবং ব্লকের প্রধান হলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (Block Development Officer).

অনুশীলনী—১

ক) পশ্চিমবঙ্গে জেলা সংখ্যা কটি? একটি জেলাকে কীভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে ভাগ করা হয়?

৮০.২.১ জেলা স্তরের বিভাগ ও ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী

জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরের ভূমিকাই মুখ্য। কালেক্টরের কার্যাবলী কালেক্টরেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। জেলা প্রশাসন পরিচালনার সাথে যুক্ত বিভিন্ন শাখা নিয়ে কালেক্টরেট গঠিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সাধারণ বিভাগ, কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বেতনাদি সম্পর্কিত বিভাগ, ট্রেজারী, ঋণ, রেকর্ড, রাজস্ব, সার্টিফিকেট, ক্ষতিপূরণ, নির্বাচন, ভূমি অধিগ্রহণ, উৎপাদন-শুল্ক, লাইসেন্স, যানবাহন, ভূমিসংস্কার, নাগরিকতা, পাসপোর্ট, উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, জলাশয়, ত্রাণ, পুনর্বাসন, অসামরিক প্রতিরক্ষা, উপজাতি কল্যাণ, রাজনৈতিক ভাতা, রেজিস্ট্রেশন, তথ্য ও জনসংযোগ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। জেলা কালেক্টরেট সম্পূর্ণভাবেই কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক বিভাগের কার্যাবলী জেলাস্তরের দ্বারা পরিচালিত হয়। কালেক্টর বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব বহন করেন। সুতরাং জেলা স্তরে একদিকে যেমন কার্যাবলীর বিকেন্দ্রীকরণ লক্ষ্য করা হয়, ঠিক তেমনই সাধারণ নির্দেশ এবং নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীভবনের নীতি গৃহীত হয়।

জেলা-স্তরের অফিসারগণ যে যে বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন সেগুলি হল ঃ পুলিশ—সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ; জনস্বাস্থ্য— জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, চিকিৎসা—মুখ্য মেডিক্যাল অফিসার অফ্ হেলথ; শিক্ষা— জেলা স্কুল পরিদর্শক, বন— জেলা বন আধিকারিক, সমাজ শিক্ষা — সমাজশিক্ষা আধিকারিক; দৈহিক শিক্ষা এবং যুব কল্যাণ — দৈহিক শিক্ষা এবং যুব কল্যাণ আধিকারিক; খাদ্য ও সরবরাহ — জেলা খাদ্য — জেলা খাদ্য নিয়ামক; কৃষি — জেলা কৃষি আধিকারিক; মৎস্য — জেলা মৎস্য
শিল্প — জেলা শিল্প আধিকারিক, পশু চিকিৎসা— জেলা পশু আধিকারিক, জলসেচ — কার্যনির্বাহী বাস্তুকার; তথ্য— জেলা তথ্য আধিকারিক; অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ—অনুন্নত সম্প্রদায় কল্যাণ আধিকারিক; পরিকল্পনা— জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক প্রভৃতি।

জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে জেলা অফিসার বা কালেক্টরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে কালেক্টরের কার্যাবলী আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করব।

অনুশীলনী—২

ক) কালেক্টরেট কোন্ কোন্ শাখা নিয়ে গঠিত?

খ) নিম্নলিখিত বিভাগগুলির দায়িত্বে যে জেলা অফিসাররা থাকেন, তাঁদের পদের নাম লিখুন।

(i) জনস্বাস্থ্য (ii) বন (iii) খাদ্য ও সরবরাহ (iv) মৎস্য (v) তথ্য

৮০.২.২ কালেক্টর বা জেলা অফিসারের ভূমিকা

৮০.২ অংশ থেকে আপনারা জেনেছেন যে জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ প্রশাসক জেলা অফিসার বা কালেক্টর বা জেলা শাসক নামে পরিচিত। তিনি একাধারে প্রশাসনের সকল স্তরের সমন্বয় সাধনকারী ও নেতা আবার অন্যদিকে জেলা স্তরে রাজ্য সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি। তিনি কেবল তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্তই প্রয়োগ করেন না; ঐ নীতি ও সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নও তাঁর দায়িত্বের সাথে বিশেষ ভাবে জড়িত।

কালেক্টর ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যক (Indian Administrative Service) থেকে নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-কৃত্যক (UPSC) তাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁর চাকরির শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। রাজ্য প্রশাসন কৃত্যক কর্মরত কোনো পদাধিকারীও পদোন্নতির মাধ্যমে এই পদে উন্নীত হতে পারেন। অবেক্ষণাধীন থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ পর্যায় শেষ হবার পর প্রথমে তাঁদের মহকুমা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্রমে তাঁরা জেলা-শাসকের পদে উন্নীত হন। জেলা শাসক বা কালেক্টর জেলার সদর দপ্তরে বাস করেন কিন্তু প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে তাঁকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করতে হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা ও জনসাধারণের মতামত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত থাকতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা শাসক বা কালেক্টরের হাতে বহুবিধ দায়িত্ব দেওয়া আছে। একই সাথে তিনি কালেক্টর, জেলার আধিকারিক, জেলা শাসক, জেলার রিটার্নিং অফিসার, জেলার উন্নয়ন ও আদমসুমারীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।

কালেক্টর হিসাবে তিনি ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ, খালের জল ব্যবহারের জন্য বকেয়া কর আদায়, সরকারের প্রাপ্য বিভিন্ন বকেয়া অর্থ আদায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শস্য ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ, দুর্গতদের সাহায্যদান, ভূমি-সংক্রান্ত সকল দলিলপত্র সংরক্ষণ, বৃষ্টিপাত ও ফসল সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ, ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পদাধিকার বলে ডেপুটি ডিরেক্টর অফ্ কনসলিডেশন অফ্ হোল্ডিংসরূপ নিম্নপর্যায়ের কর্তৃত্বের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিষয় বিবেচনা করেন। কালেক্টর জেলার অন্তর্গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার হিসাবে

দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি জেলার আদমসুমারী আধিকারিক। প্রতি দশ বছর অন্তর জেলার আদমসুমারীর দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। তাছাড়া সংসদে জেলা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, প্রয়োজনীয় তথ্য তিনিই সরবরাহ করেন।

জেলা শাসক হিসাবে তিনি জেলার সাধারণ প্রশাসনের ওপর চূড়ান্ত তদারকি ক্ষমতা ভোগ করেন। অস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান, পাসপোর্ট, ভিসা, বিদেশী নাগরিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত। শান্তি ও নিরাপত্তাভঙ্গজনিত বিপদের ক্ষেত্রে আদেশ জারি, তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের সার্টিফিকেট প্রদান, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দায়িত্ব জেলা শাসক পালন করেন। এছাড়া জেল পরিদর্শন, বিচারাধীন বন্দীদের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, হাজতবাসের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে মুক্তিদান, প্যারোলে বন্দীদের মুক্তিদান, রাজ্যসরকারের নিকট জেলার অনুষ্ঠিত অপরাধজনিত কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ, প্রতি বছর থানা পরিদর্শন, শ্রমিক সমস্যা ও ধর্মঘট, শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দান প্রভৃতি বিষয়ে জেলা শাসকের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

জেলার মুখ্য আধিকারিক হিসাবে তিনি হলেন জেলায় রাজ্য সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি। তিনি রাজ্য সরকারের নির্দেশ ও আদেশসমূহ জেলায় প্রয়োগ করেন। জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগের প্রতিকার, জেলায় গেজেটেড অফিসারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ, বদলী ও তাঁদের ছুটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জুনিয়র অফিসারদের প্রশিক্ষণ দান প্রভৃতি দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। এছাড়া জেলার বার্ষিক বাজেট পেশ, মন্ত্রী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সফর-সূচী ঘোষণা, জেলার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং পেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদানের বিলে স্বাক্ষরদান, জেলা পরিকল্পনা প্রয়োগ বিষয়ক কমিটির সভায় সভাপতিত্বের দায়িত্ব প্রভৃতি তিনি পালন করেন।

৮০.২.৩ বর্তমানে জেলা প্রশাসনের পরিবর্তিত রূপ

স্বাধীনতার পরে জেলার প্রশাসনের ক্ষেত্রে দু'টি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রথমত, জেলা প্রশাসনকে বিচার-বিভাগীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনকে স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে জেলা এবং মহকুমা স্তরের অফিসারদের হাতে ফৌজদারি মামলার বিচারের যে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তা বাতিল করা হয়। সংবিধানে সংযোজিত নির্দেশমূলক নীতির (৫০ নং ধারা) মাধ্যমেই শাসন-বিভাগ থেকে বিচার-বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ঐ নীতি অনুসরণ করে জেলা-স্তরে স্বতন্ত্র বিচার-কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। জেলা-স্তরে বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের

ব্যবস্থা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রাদর্শ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পরিবর্তন রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে প্রসারিত করেছে। সাম্প্রতিককালে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসরণ করে জেলা পরিষদের হাতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। জেলা-শাসক একদিকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের তত্ত্বাবধান এবং কার্যকর করার দায়িত্ব বহন করেন; অপরদিকে গণতন্ত্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে জেলা-শাসকের কাজের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছে।

জেলা প্রশাসন পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা এবং ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য থেকে বহুলাংশে মুক্তি পেয়েছে। জেলা-শাসক বর্তমানে কেবলমাত্র একজন আমলা নন, জনসাধারণের সেবকও বটে। জেলা-শাসক জেলার প্রধান ব্যক্তিত্ব; তিনি প্রশাসন এবং উন্নয়নের মূল উৎস। তাঁর দায়িত্ব ক্রমবর্ধমান।

অনুশীলনী—৩

ক) স্বাধীনোত্তর ভারতে জেলা প্রশাসনে কীধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে তা আলোচনা করুন।

৮০.৩ স্থানীয় শাসন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় শাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনগত, কাঠামোগত এবং কার্যগত দিক দিয়ে অনেক বেশি জটিল। একটি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সকল দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর নয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতেও রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে সব ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে স্থানীয় সমস্যা সমাধান করা দূরবর্তী সরকারের পক্ষে অনেক সময়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণের দ্বারা সরকারের পক্ষে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকলেও গঠন এবং আদর্শের দিক থেকে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। তাই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কোনো পরিপূর্ণ এবং সুসংহত তত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এখনো গড়ে ওঠে নি। তবে লোকাল গভর্নমেন্ট ইন ইংল্যান্ড নামক একটি রচনায় ই. এরিক জ্যাকসন স্থানীয় সরকার বলতে গণনির্বাচিত পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় সেবামূলক এবং অন্যান্য বিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করাকে বুঝিয়েছেন। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ্ সোস্যাল সাইন্সেস্ গ্রন্থে উইলিয়াম এ. রব্সন্ স্থানীয় সরকার বলতে একটি স্বাধীন, নিয়ন্ত্রণহীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়েছেন যেখানে স্থানীয়

জনসম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল উপাদান হচ্ছে এর আইনগত মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা, সাধারণ স্থানীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ, প্রশাসন পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং প্রশাসনিক ব্যয় মেটাবার জন্য নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের ক্ষমতা।

গ্রাম-ভিত্তিক ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে গান্ধীজির বক্তব্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজির মতে "অসংখ্য গ্রাম লইয়া গঠিত এই সমাজদেহ চক্রাকারে বৃদ্ধি পাইয়া সর্বত্র ব্যপ্ত হইত থাকিবে। এই দেহের কোনো অংশ অপর অংশের উপর চাপিয়া বসিবে না, ইহা পিরামিডের মতো হইবে না। শীর্ষদেশকে ঊর্ধ্বে আলোকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য তলদেশ নীচের অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে না। ইহা হইবে মহাসমুদ্রের মতো মন্ডলাকার—এই মন্ডলের কেন্দ্র হইবে ব্যক্তি।"

৮০.৩.১ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে ৮০.১ থেকে জানা গেল যে আধুনিক রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করতে পারে না।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ আঞ্চলিক সমস্যা সরকারের নিকট পেশ এবং প্রতিকারের সুপারিশ করতে পারে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনসাধারণের মধ্যে প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। প্রশাসনের সাথে জনগণকে একাত্ম করে তোলে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনসাধারণকে আঞ্চলিক কার্যপরিচালনায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ব্যয়-সংকোচে সাহায্য করে।

স্থানীয় শাসন ছাড়া স্থানীয় প্রতিভাকে খুঁজে বের করা শক্ত। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ফলে স্থানীয় প্রতিভার সন্ধান ও বিকাশের সুযোগ পাওয়া যায়।

৮০.৩.২. ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

স্বাধীন ভারতে বর্তমানে স্বায়ত্তশাসনের যে রূপ আমরা দেখছি সেটি নতুন কোনো ধারণা নয়। প্রাচীন যুগেও ভারতে এই ধরনের প্রশাসনিক সন্ধান পাওয়া যায়, যা সম্ভবত বিশ্বের যে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়েও প্রাচীন। বস্তুত, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান এককালে আমাদের সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ছিল।

প্রাচীনকালে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানকে বলা হোত পঞ্চায়েত। পাঁচ বা পঞ্চ শব্দ থেকেই পঞ্চায়েত শব্দটি উদ্ভূত। পঞ্চায়েত বলতে সম্ভবত বোঝানো হত এমন এক গ্রাম্য পরিষদ যার সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচ।

সামাজিক প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল। কালক্রমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন যুগে সাবেকী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল সমগ্র গ্রামজীবনকেন্দ্রিক। প্রশাসনিক এবং বিচার-সংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা পঞ্চায়েতের ওপর ন্যস্ত ছিল। মুঘল যুগ পর্যন্ত স্বাশিত এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবেই কাজ করেছে। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনকালে এই পঞ্চায়েতগুলি তাদের আগেকার ক্ষমতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

ব্রিটিশ যুগে পরাধীন ভারতের জনগনের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হোত ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্দেশ। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো ক্ষমতাই ছিল না। বর্তমান শতাব্দীতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন প্রথম ঘটাতে চান গান্ধীজী। স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর সংগ্রামের ভিত্তি ছিল শহর নয়, গ্রাম। তিনি স্বরাজের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত। ২৬শে জুলাই, ১৯৪২ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি বলেন "গ্রাম-স্বরাজ সম্পর্কে আমার ধারণা এই, যে এটি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সাধারণতন্ত্র যে তার নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে প্রতিবেশী গ্রামের ওপর নির্ভর করবে না, অথচ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবেশী গ্রামের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতায় সংযুক্ত হবে।' স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার সময়ে গণ-পরিষদে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা হয়। খসড়া-সংবিধানে প্রথমে পঞ্চায়েতের কোনো উল্লেখ ছিল না। গান্ধীজি সেই কারণে মর্মাহত হন এবং এটিকে একটি বিচ্যুতি হিসাবে গণ্য করেন। অপরদিকে আম্বেদকর গ্রামকে আঞ্চলিকতা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসাবে দেখেন এবং গ্রামের বদলে ব্যক্তিকে একক হিসাবে গণ্য করেন।

অনেক বিতর্ক ও আলোচনার পর সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি) ৪০ নম্বর ধারায় পঞ্চায়েতের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সংবিধানের সপ্তম তফশিলে ২ নম্বর তালিকায় (রাজ্য তালিকা) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আর একবার উল্লেখ আছে।

স্বাধীনতার পর গ্রামজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তর সাধনের ব্রত নিয়ে ১৯৫২ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ছিল সরকার অনুমোদিত এক প্রকল্প যা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের এবং তাদের উদ্যোগে সমগ্র জনসমষ্টির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়াসী। ফলে প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে ব্লক উপদেষ্টা কমিটি এবং পরবর্তীকালে ব্লক উন্নয়ন কমিটি স্থাপন করা হয়।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। সেই কারণে যোজনা কমিশনের পরিকল্পনা প্রকল্প সম্পর্কিত কমিটি শ্রীবলবন্ত রায় মেহতার নেতৃত্বে একটি সমীক্ষক দল গঠন করে যার কাজ ছিল সমষ্টি উন্নয়নের কর্মসূচীর কাজকর্ম পর্যালোচনা করা এবং আরও দ্রুত কাজকর্ম রূপায়ণের জন্য কর্মপ্রণালী সুপারিশ করা। সমীক্ষক দল ১৯৫৭ সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের

জন্য গ্রামবাসীদের উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পঞ্চায়েতী রাজের বিবর্তনের ইতিহাসে মেহতা কমিটির প্রতিবেদন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সমীক্ষকদল গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের জন্য ত্রিস্তর কাঠামোর সুপারিশ করেন যেখানে গ্রাম পর্যায়ে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পর্যায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ১৯৫৮ সালে মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করে এবং ১৯৫৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন অর্থাৎ ২রা অক্টোবর রাজস্থানের নাগৌর জেলায় প্রথম স্বাধীনোত্তর পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এরপর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ক্রমে অন্যান্য রাজ্যেও পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, মূলত রাজ্য সরকারগুলির এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের কারণে।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রের জনতা সরকার অশোক মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কীভাবে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা যায় তা খুঁজে বার করা। ১৯৭৮ সালে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে তাতে কতগুলি বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। প্রথমত, দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বলা হয় যেখানে জেলাস্তরে থাকবে জেলা পরিষদ এবং তার নীচে কতকগুলি গ্রাম নিয়ে থাকবে একটি মণ্ডল পঞ্চায়েত। দ্বিতীয়ত, একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ন্যায়পঞ্চায়েত গঠন করার কথা বলা হয়; এবং তৃতীয়ত, জেলা পরিষদকেই জেলা স্তরে পরিকল্পনার মূল মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়।

জনতা সরকারের পতনের ফলে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। এরপর ১৯৮৫ সালে জি. ভি. কে. রাওয়ের নেতৃত্বে কমিটি অন্ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ অ্যারেঞ্জমেন্টস্ ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট গঠিত হয়। এই কমিটিও জেলাস্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণের জন্য পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক ক্ষমতা দেবার পক্ষে মত দেয়। ১৯৮৬ সালে এল. এম. সিংভীর নেতৃত্বাধীন কমিটি অফ্ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ্ রুরাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক সম্মান দেবার পক্ষে মত দেন।

স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান এবং গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হল ৬৪তম সংবিধান সংশোধনী বিল। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে সংসদে এই বিলটি উত্থাপিত হয় কিন্তু রাজ্যসভায় বিলটি পাস হয় নি। পরবর্তীকালে এই বিলটির ওপর ভিত্তি করেই ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী বিল ডিসেম্বর, ১৯৯২এ সংসদে পেশ করা হয়। বিলটি সংসদে অনুমোদন লাভ করে এবং ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনে পরিণত হয়।

এই নতুন আইনটির ফলে প্রত্যেক রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতীরাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক হয় এবং এই তিনটি স্তরেই জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলা হয়। এই

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মেয়াদ পাঁচ বছর করা হয়। এছাড়া তফশিলি জাতি উপজাতি ও মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্থাপন করার কথা আইনটিতে বলা হয়।

অনুশীলনী—৪

ক) 'পঞ্চায়েত' শব্দটি কীভাবে এসেছে? প্রাচীন ভারতে পঞ্চায়েত বলতে কী বোঝানো হত?

খ) স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বলবন্ত রায় মেহতা কমিটির ভূমিকা অনস্বীকার্য—আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য লিখুন।

৮০.৩.৩ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা

স্বাধীনতার পরই ১৯৫০ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। সাত আটশত লোক বাস করে এমন একটা গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিল। গ্রামবাসীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে হাত তুলে ভোট দিয়ে পঞ্চায়েতের নয়জন সদস্য ও একজন সভাপতি নির্বাচিত করতেন। অফিস খরচা ও গ্রামোন্নয়ন বাবদ ঐ পঞ্চায়েতকে দেওয়া হোত একশত টাকা। ঐ টাকার সঙ্গে যুক্ত হোত গ্রামবাসীদের চাঁদা ও কায়িক পরিশ্রম। কোনো আইনগত সংস্থা না হওয়ায় এই পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠানগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে কাজ করতো। পথঘাট সংস্কার ও পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ভালো কাজ করছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর ব্লক, বীরভূম জেলায় মহম্মদবাজার, সাঁইথিয়া ও লিহাটি ব্লক, বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় ও গুসকরা, ব্লক, মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম ব্লক এবং নদীয়া জেলায় ফুলিয়া ব্লকে পরীক্ষামূলক ভাবে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল। এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা থেকে সরকার যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তাকে ভিত্তি করে ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাস হয়।

দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন বোর্ড চালু থাকায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় ত্রিস্তর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বদলে চার স্তরের পঞ্চায়েতীরাজ গঠিত হয়েছিল। সর্বনিম্নে গ্রাম পর্যায়ে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক পর্যায়ে ছিল আঞ্চলিক পরিষদ। এই দুইয়ের মাঝখানে ছিল অঞ্চল পঞ্চায়েত এবং সর্বোচ্চ স্তরে জেলা পর্যায়ে ছিল জেলা পরিষদ।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার এই চার স্তর বিশিষ্ট কাঠামোটি দুটি আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতী আইন (১৯৫৭) অনুসারে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের আওতাভুক্ত এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ড পর্যায়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত এই দ্বি-স্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা চালু হয়। এরফর ১৯৬৩ সালের জেলা-পরিষদ আইন অনুযায়ী ব্লক পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ যুক্ত হয়।

পরবর্তীকালে এই আইন দুটির বদলে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ নামে একটি নতুন আইন

প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের দ্বারা গ্রাম প্রশাসনের চার-স্তরের কাঠামো ত্রিস্তর কাঠামোতে পরিণত করা হয়। এই তিনটি স্তর হল পুরোনো অঞ্চল স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা স্তরে জেলা পরিষদ।

বর্তমান ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ফলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মূল কাঠামোটি সব রাজ্যেই এক। তবে পশ্চিমবঙ্গে অনেক আগে থেকে ১৯৭৮ সাল থেকেই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুশীলনী—৫

ক) পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮০.৩.৪ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও গঠন

ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এখানে 'গ্রাম' বলতে বোঝান হয়েছে যে কোনো মৌজা বা মৌজার অংশ বা পাসাপাশি কয়েকটি মৌজাকে। সাধারণত, অনধিক ১৫,০০০ ব্যক্তি সমন্বিত বারোটি গ্রামকে নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যসংখ্যা অন্যূন ৭ থেকে অনধিক ২৫ এবং এই সদস্যরা গ্রামবাসীদের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে পঞ্চায়েতের সকল স্তরে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ কোনো ন্যায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ বা পৌর কর্তৃপক্ষের সদস্য থাকতে পারেন না। তাঁরা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অথবা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি অথবা জেলা-পরিষদের কোনো বেতনভুক্ কর্মচারী হতে পারেন না, আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত-মস্তিষ্ক, দেউলিয়া অথবা নীতিভ্রষ্টতার জন্য ছ-মাসের বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন না।

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেয়াদ পাঁচ বছর। কার্যকাল অতিক্রান্ত হবার আগে কোনো সদস্য ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পদত্যাগ পেশ করতে পারেন।

নির্বাচনের পর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম সভা আহ্বান করেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। ঐ সভায় গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে গোপন ভোটে একজনকে প্রধান এবং অন্য একজনকে উপ-প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করেন। তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। তাঁরা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন এবং কার্যকাল শেষ হবার আগে গ্রাম-পঞ্চায়েত তাঁদের অপসারণ করতে পারেন।

গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধানদের কার্য-পরিচালনায় সাহায্যের জন্য একজন কর্মসচিব আছেন। তিনি রাজ্য সরকার নির্ধারিত বিধি অনুসারে বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ করেন। গ্রাম-পঞ্চায়েতের ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এক কর্ম-সহায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধীনে চৌকিদার এবং দফতার আছে। উপরোক্ত কর্মচারিগণ নিজেদের দায়িত্বপালনের জন্য পঞ্চায়েতের নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। এই দায়বদ্ধতা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকৃতিকে শক্তিশালী করছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরটি হল পঞ্চায়েত সমিতি। প্রতিটি ব্লকে একটি পঞ্চায়েত সমিতি আছে। কোনো ব্লকের অধীন প্রতিটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রধান, প্রতিটি গ্রাম-পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে অনধিক তিনজন প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্য এবং ব্লক বা ব্লকের কোনো অংশ থেকে নির্বাচিত লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার সদস্য ও ব্লক এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্য নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি হয়। কোনো মন্ত্রী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন না। লোকসভা, রাজ্যসভা বা বিধানসভার সদস্যগণ পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

গ্রাম-প্রধান ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন সদস্য, জেলা পরিষদ বা ন্যায় পঞ্চায়েতের কোনো সদস্য পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হতে পারেন না। পঞ্চায়েতে আইন অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত কোনো ব্যক্তি পঞ্চায়েত সমিতিতেও নির্বাচিত হবার অযোগ্য বিবেচিত হবেন। পঞ্চায়েত সমিতিতেও তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মাইলাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা সুরক্ষিত আছে।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকাল পাঁচ বছর। সমিতির প্রথম সভায় সদস্যগণ গোপন ভোটে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি এবং অন্য একজনকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। লোকসভা, রাজ্যসভা বা রাজ্য বিধানসভার কোনো সদস্য সভাপতি বা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। সভাপতি প্রতি মাসে অন্তত একবার সমিতির সভা আহ্বান করেন। সমিতির এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভাপতি কার্য পরিচালনা করেন; অপরদিকে বি.ডি.ও. পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বশেষ এবং উচ্চতম স্তর হল জেলা-পরিষদ। এই পরিষদ তিন ধরনের সদস্যদের নিয়ে গঠিত—পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট জেলার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ, জেলা পরিষদের সদস্য, জেলার প্রতি ব্লক থেকে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দুজন সদস্য নির্বাচিত হন, জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা, বিধানসভা এবং জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য। কোনো মন্ত্রী অবশ্য পরিষদের সদস্য থাকতে পারেন না। তাঁদের জেলা-শাসক পদাধিকারবলে পরিষদের সহযোগী সদস্য। পদাধিকার বলে সদস্যপদ লাভ করেন এমন কেউ পরিষদের কোনো প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। পরিষদে তফশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য প্রতিনিধিত্বর ব্যবস্থা আছে।

জেলা পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম সভায় জেলা পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি এবং অন্য একজনকে সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত করেন। তাঁদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু তার আগে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারেন বা তাঁদের অপসারণ করা যায়। জেলা পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনায় সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার নিযুক্ত একজন কার্যনির্বাহী আধিকারিক আছেন। তাঁকে সাহায্য করেন একজন অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক। তাছাড়া জেলা পরিষদ নিযুক্ত একজন কর্মসচিবও আছেন।

অনুশীলনী—৬

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত কীভাবে গঠিত হয়? এর কার্যকালের মেয়াদ কতদিন?

খ) ব্লক পর্যায়ের পঞ্চায়েতী কাঠামোকে কী বলে? এটি কীভাবে গঠিত হয়?

গ) পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কাঠামোটির সদস্য কারা? কীভাবে তাঁরা নির্বাচিত হন?

৮০.৩.৫ পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলীকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং অন্যান্য কর্তব্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জলনিকাশ, মহামারী প্রতিরোধ ও নিবারণের ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্করিণীর রক্ষণাবেক্ষণ, শ্মশান ও কবরখানার তত্ত্বাবধান, কর ধার্য, সংগ্রহ ও নির্ধারণ ইত্যাদি। গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে আছে—প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সামাজিক বিষয়ক এবং কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা, পল্লী চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, সেচ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি ইচ্ছাধীন কার্য আছে, যেমন—কূপ, পুষ্করিণী ও দিঘী খনন, কুটির শিল্পের উন্নতি বিধান, গ্রন্থাগার, পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, বাজার স্থাপন, বৃক্ষাদি রোপণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

গ্রাম-পঞ্চায়েতর আয়ের প্রধান উৎস হল—কর থেকে সংগৃহীত আয়, ঋণ এবং আর্থিক অনুদান। করের উৎস হল জমি এবং ঘরবাড়ির ওপর ধার্য কর, পেশা, বৃত্তি, ব্যবস্থা থেকে আদায়ীকৃত এবং যানবাহনের উপর ধার্য কর। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতকে ঋণ দিতে পারে। রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতি, কর্তৃক আর্থিক অনুদান বা সাহায্য পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য ছ-টি স্থায়ী কমিটির ব্যবস্থা আছে। এই কমিটিগুলি হল : অর্থ ও সংগঠন; জনস্বাস্থ্য; পূর্তকার্য; কৃষি সেচ ও সমবায়; শিক্ষা; ক্ষুদ্র শিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ। পঞ্চায়েত

সমিতির দায়িত্ব হল ঃ কৃষি, কুটির শিল্প, গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্থিক সাহায্যদান। বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন, ত্রাণকার্য, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান, গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট অনুমোদন পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের উৎস হল—যানবাহনের ওপর ধার্য শুল্ক ও রেজিস্ট্রেশন ফি, হাট-বাজারের উপর ধার্য লাইসেন্স ফি, সরবরাহ ও রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য ধার্য অভিকর ইত্যাদি। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদও সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারে।

জেলা-পরিষদের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক। জেলা উন্নয়ন এবং তার সাথে জড়িত অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও জেলা পরিষদের এক্তিয়ার প্রসারিত। জেলা পরিষদের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল ঃ কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, কৃষি, পশুপালন, সেচ, জলসরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ, কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষায় সাহায্য দান, রাজ্য সরকার কর্তৃক ন্যস্ত কোনো প্রকল্প পরিচালনা, গ্রাম্য হাট ও বাজারের মালিকানা অধিগ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, আর্তদের ত্রাণের ব্যবস্থা, মহামারী প্রতিরোধ, সেতু, খাল, খেয়াঘাট, ঘরবাড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

জেলা-পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস হল ঃ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি-রাজস্বের অংশ; রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ, পথ কর এবং পূর্ত কর; দান ও সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ, জরিমানা থেকে সংগৃহীত আয় প্রভৃতি।

জেলা-পরিষদের দায়িত্বকে প্রশাসনিক দায়িত্বে এবং কর্তব্য পালনের মধ্যেই সীমিত রাখা হয় নি। জেলার সার্বিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়ণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত।

অনুশীলনী—৭

ক) গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস কি? গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ কী কী?

খ) পঞ্চায়েতের সমিতির দায়িত্ব কি? কোন্ কোন্ কমিটির মাধ্যমে এটি কার্য পরিচালনা করে?

গ) 'জেলা পরিষদকে সমগ্র জেলা উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে দেখা হয়'—এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৮০.৩.৬ পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের কী ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সাধারণত এই সম্পর্কটি সাময়িক ভিত্তিতেই (ad-hoc basis) নির্ধারিত হয়ে থাকে। পঞ্চায়েত

ব্যবস্থার ওপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতার বিরোধীগণ এই মত ব্যক্ত করেন যে, রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনকে প্রহসনে পরিণত করে। অপরদিকে পঞ্চায়েতের ওপর রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে রাজ্য সরকার গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রভূত এবং ঋণদান করেন। প্রাপ্ত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, তা পর্যালোচনার ক্ষমতা অবশ্যই রাজ্য সরকারের থাকা উচিত।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণকে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান, কর্মকর্তাদের অপসারণ, পঞ্চায়েত সংস্থা বাতিল ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা, পঞ্চায়েতের কর্মচারী সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন, হিসাব পরীক্ষা, সহায়ক, অনুদান প্রভৃতি অংশে ভাগ করা যায়।

প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা দরকার যে গ্রাম-পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে জেলা-পরিষদ পর্যন্ত সব স্তরেই রাজ্য সরকার তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পঞ্চায়েতে আইনে এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্য সরকারকে একজন অধিকর্তা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতসমূহ রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য পরিচালনায় বাধ্য। বিশেষ অবস্থায় রাজ্য সরকার প্রধান, উপ-প্রধান, সভাপতি, সহ-সভাপতি, সভাধিপতি এবং সরকারি সভাধিপতিকে অপসারণ করতে পারে। কর্তব্য পালনে অযোগ্যতা, ব্যর্থতা, ক্ষমতার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগের জন্য রাজ্য সরকার কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ ভেঙে দিতে পারে।

আর্থিক বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আয়ের উৎস খুবই সীমিত। সরকারি অনুদানের ওপরেই প্রধানত তাদের নির্ভরশীল থাকতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেষ্ট আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। আবার একথাও ঠিক যে নিজেদের অভাব অভিযোগ দূর করবার ব্যাপারে পঞ্চায়েতগুলি নিজ প্রতিষ্ঠানের উপর ভরসা না করে রাজ্যসরকারের নির্দেশের ওপর ভরসা করে থাকেন।

৮০.৩.৭ শহরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যেমন পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পৌরসভা এবং পৌর প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পৌর সভাসমূহ ১৯৩২ সালে প্রণীত বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। বহুবার সংশোধিত ঐ আইন শেষবার ১৯৮২ সালে সংশোধন করা হয়। ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাস থেকে সংশোধিত আইন কার্যকর হয়েছে।

(ক) পৌরসভা

ছোট ছোট শহরের জন্য পৌরসভা আছে। প্রত্যেক পৌরসভা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের মাধ্যমে অন্যূন ৯ এবং অনধিক ৩০ জন সদস্য নির্বাচিত করেন। পৌর কমিশনারগণ নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান ও একজনকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন পৌরসভার কার্যকাল সাধারণত চার বছর, তবে রাজ্য সরকার প্রয়োজনে এক বছর ঐ মেয়াদ বাড়াতে পারেন।

পৌরসভাকে ছোটো ছোটো শহর এলাকার সকল উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে আলোকিত থাকতে হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, রাস্তাঘাট আলোকিত করা, মহামারী প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি পৌরসভার বিভিন্ন দায়িত্ব।

পৌরসভার আয়ের প্রধান উৎস হল জমি ও বাড়ির ওপর কর, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট আলোকিত করা ও জঞ্জাল অপসারণ করার উপর ধার্য কর, খেয়া ও সেতুর ওপর কর প্রভৃতি। তবে পৌরসভার যা আয় হয় তার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক সমস্ত কার্যাদির ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব নয়। তাই পৌরসভাগুলিকে অনেকাংশেই রাজ্য সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

(খ) পৌর প্রতিষ্ঠান

ভারতের বড় বড় শহরের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি পৌর প্রতিষ্ঠান আছে ঃ কলকাতা, হাওড়া এবং চন্দননগর। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ভারতের সবচেয়ে পুরোনো পৌর প্রতিষ্ঠান।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ১৯৮৩ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী গঠিত। পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের কাঠামোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ কর্পোরেশন, স-পরিষদ মেয়র এবং মেয়র।

পৌর এলাকায় বসবাসকারী ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে কর্পোরেশনের ১৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। কাউন্সিলরগণ প্রথম সভায় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সাতজন অল্ডারম্যান নির্বাচিত করেন। এছাড়া কাউন্সিলরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন যাঁর হাতে সভা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। কর্পোরেশনের সদস্য এবং সভাপতির কার্যকলাপের মেয়াদ পাঁচ বছর।

রাজ্যের মন্ত্রী-পরিষদের অনুকরণে কর্পোরেশনে স-পরিষদ মেয়রের ব্যবস্থা আছে। মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে অনধিক দশজন কাউন্সিলরকে নিয়ে স-পরিষদ মেয়র গঠিত হয়। কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর নির্বাচিত কাউন্সিলরদের প্রথম সভায় মেয়র নির্বাচিত হন। ডেপুটি মেয়র এবং অন্যান্য সদস্যগণ মেয়র কর্তৃক মনোনীত হন। স-পরিষদ মেয়র কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ

প্রশাসনিক সংস্থা। এটি তার কার্যাবলীর জন্য কর্পোরেশনের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে।

বর্তমান কর্পোরেশন আইনে মেয়র হলেন প্রধান প্রশাসনিক অধিকর্তা। রাজ্যে যেমন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, মেয়রও তেমনি স-পরিষদ মেয়রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই পুর প্রশাসন পরিচালিত। বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। কলকাতা পৌর প্রশাসনে তিনিই হলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ও নেতা।

অনুশীলনী—৮

ক) কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানটির গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৮০.৩.৮ শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান ও সংবিধানিক সম্মান

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির মতো শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সাংবিধানিক সম্মান লাভ করেন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে এই বিলটি পাস হয় এবং সংবিধান IXA নামক একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই অধ্যায়টি শহরের পৌরসভাগুলির কাঠামো, গঠন, আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, আর্থিক সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে। ফলে পৌরসভাগুলি ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সংবিধানিক সম্মান লাভ করে।

৮০.৩.৯ উপসংহার

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতী রাজের মৌলিক দর্শন হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ'। পঞ্চায়েতী রাজের সূচনা পর্বে এ ব্যবস্থা অনিয়মের শিকার হলেও, ১৯৭৮ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া এই নির্বাচনের ফলে গ্রামাঞ্চলে নেতৃত্বের ধারাও পাল্টেছে। এককালে গ্রামাঞ্চলে জমিদাররাই ছিলেন সর্বময় কর্তা এবং নেতা। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে জমিদাররা তাঁদের ক্ষমতা হারান আর অপরদিকে গ্রামীণ কর্তৃত্ব কাঠামোয় একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন এক গ্রামীণ নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এছাড়া গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েতের অবদান অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গে হাতে গ্রামীণ পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগের ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের সাফল্য সত্ত্বেও তার কিছু কিছু দুর্বলতাও আছে। গ্রামীণ মানুষের সার্বিক উদ্যোগ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সফল হতে পারে না। কিন্তু চরম দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা তাদের অধিকাংশের মধ্যে এখনও নিষ্ক্রিয় মানসিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। সেই কারণে

প্রথমেই দরকার গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত মান উন্নয়ন। এছাড়া পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর সাথে যেসব বিষয় যুক্ত আছে তাদের সফল করে তোলার জন্য আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করেন। দুর্নীতি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠে আগামী শতকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে এই আশা করা যেতে পারে।

৮০.৪ সারাংশ

এই এককটি থেকে জেলা প্রশাসন এবং স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনারা জেনেছেন। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে জেলা প্রশাসন এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে আপনারা বিশেষভাবে জানতে পেরেছেন।

জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামো, বিভিন্ন পদাধিকারীদের কথা আপনারা জেনেছেন। কালেক্টর বা জেলা অফিসারের ভূমিকা এবং কার্যাবলী আপনারা ৮০.৪ অংশ থেকে জেনেছেন।

এরপর গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা বলা হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ প্রথমে চারস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং পরে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা—সম্পর্কে আপনারা ৮০.৩.৪ অংশ থেকে জেনেছেন। বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার পর শহরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। এই প্রসঙ্গে পৌরসভার কার্যাবলী এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশন সম্পর্কেও বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

৮০.৫ অনুশীলনী

১। জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে কালেক্টর বা জেলা শাসকের ভূমিকা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

২। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। ভারতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষেত্রে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনের গুরুত্ব কতটা আলোচনা করুন।

৪। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা ও রাজ্য সরকারের মধ্যে কী ধরনের সম্পর্ক দেখা যায় তা আলোচনা করুন।

৫। শহরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন। এ প্রসঙ্গে ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের কী গুরুত্ব তা আলোচনা করুন।

৮০.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

ক) ৮০.২ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

ক) ৮০.২.১ অংশে প্রথম দিকে উত্তর পেয়ে যাবেন।

খ) i) জনস্বাস্থ্য — ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার

ii) বন — জেলা বন আধিকারিক

iii) খাদ্য ও সরবরাহ — জেলা খাদ্য নিয়ামক

iv) মৎস্য — জেলা মৎস্য আধিকারিক

v) তথ্য — জেলা তথ্য আধিকারিক

অনুশীলনী—৩

ক) ৮০.২.৩ অংশের সাহায্যে উত্তর দিতে পারবেন।

অনুশীলনী—৪

ক) ৮০.৩.২ এর প্রথমাংশে উত্তর পাবেন।

খ) ৮০.৩.২ এর মধ্যভাগে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৫

ক) ৮০.৩.৩ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

অনুশীলনী—৬

ক) ৮০.৩.৪ অংশের প্রথম দিকে বিস্তারিতভাবে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এর সাহায্যে উত্তর দিন।

খ) ৮০.৩.৪ এর মধ্যভাগে উত্তর পাবেন।

গ) ৮০.৩.৪ এর শেষাংশে উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৭

ক) ৮০.৩.৫ অংশের প্রথম ভাগে এর উত্তর পাবেন।

খ) ৮০.৩.৫ অংশের মধ্যভাগে এর উত্তর পাবেন।

গ) ৮০.৩.৫ অংশের শেষার্ধে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৮

ক) ৮০.৩.৭ অংশে এর উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী

১) ৮০.২.২ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

২) ৮০.৩ এবং ৪.৩.১ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৩) ৮০.৩.২ অংশের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

৪) ৮০.৩.৬ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৫) ৮০.৩.৭ এর সম্পূর্ণ অংশটি এবং ৪.৩.৬ অংশের সাহায্যে উত্তর দিন।

৮০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Johari, J. C. *Indian Govt. & Politics. Vishal Publication; Delhi Jalandhar*
2. দুর্গাদাস বসু — *ভারতের সংবিধান পরিচয়, প্রেন্টিস হল অফ্ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লী*
3. নিমাইসাধন প্রামাণিক — *ভারতীয় শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির রূপরেখা, ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা*
4. অনাদিকুমার মহাপাত্র — *ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা*

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.